শ্রাবণ ১৩৮০

প্রথম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা
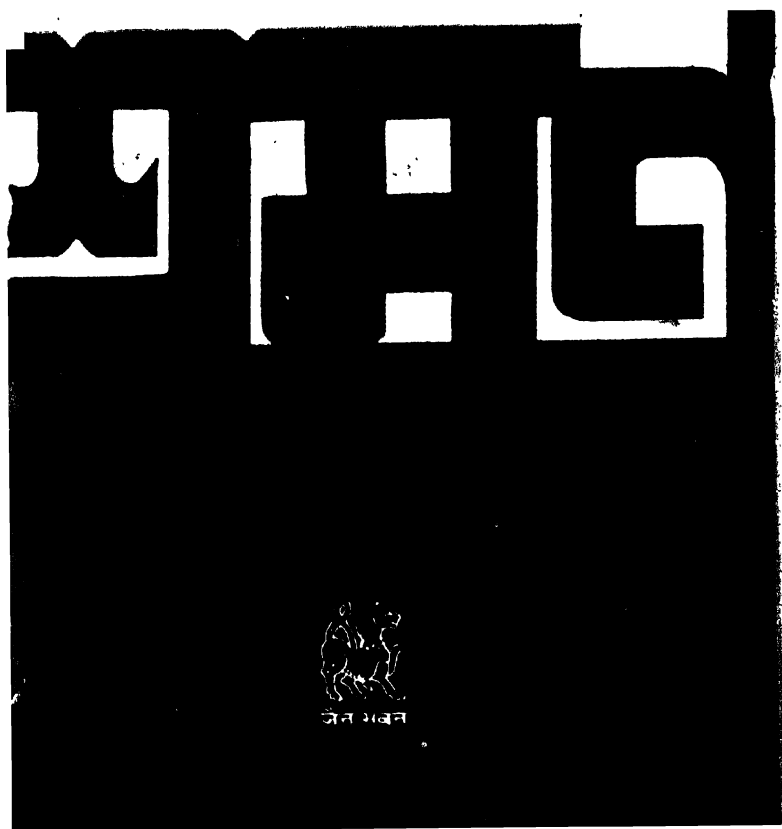
जैन भवन

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮০ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী
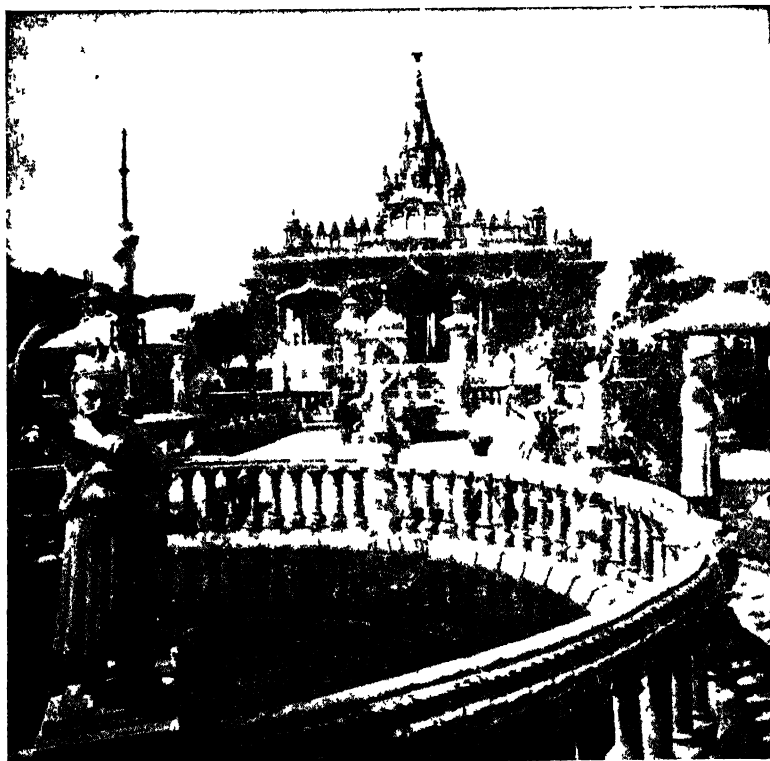
শীতলনাথ মন্দির, কলিকাতা

কলিকাতার প্রখ্যাত জৈন উদ্যান মন্দির

কলিকাতার বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীটে যে ক'টি জৈন মন্দির আছে তার মধ্যে যে মন্দিরটী সব চাইতে বেশী প্রসিদ্ধ সেই মন্দিরটী হ'ল দশম তীর্থংকর ভগবান শ্রীশীতলনাথের। কলিকাতার একটী সুপরিচিত উদ্যানে এই মন্দিরটী অবস্থিত। ১৮৬৭ সালে এটি নির্মিত হয়।

মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠাতা রায় শ্রীবদ্রীদাস বাহাদুর উত্তর ভারতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ শ্রীমাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালের কাছাকাছি কোনো সময়ে শ্রীবদ্রীদাস লক্ষ্ণৌ হতে কলিকাতায় আসেন। তিনি যে সে সময় খুব বিত্তশালী ছিলেন তা নয়। তাছাড়া কলিকাতায় তখন তিনি ছিলেন নবাগত। তবুও নিজের সততা, মেধা ও উদ্যমে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে এই নগরীর প্রমুখ জহুরী রূপে পরিচিত হন ও ১৮৭৩ সালে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুরের মুকীম নিযুক্ত হন।

এই মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটী ছোট্ট ইতিহাস আছে। সেকালে এ অঞ্চলে দাদাবাড়ী নামে প্রখ্যাত জৈনাচার্যদের একটি পুরুনো মন্দির ছিল। মন্দিরটী অবশ্য আজো আছে। সেই মন্দিরে শ্রীবদ্রীদাস প্রায়ই পূজো করতে আসতেন। একদিন আসবার পথে নিকটস্থ একটি পুকুরে তিনি মাছ ধরা হচ্ছে দেখতে পান। দাদাবাড়ীর এত কাছে জীব হিংসা হচ্ছে দেখে তাঁর মনে আঘাত লাগে ও তিনি নিকটস্থ জমি সহ সেই পুকুরটী তখনি ক্রয় করে নেন। তারপর মা'র আদেশে সেখানে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরে শীতলনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কারণ শীতল অর্থে যারা জলচর প্রাণী তাদের যিনি নাথ বা রক্ষক।

মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে যদি কিছু বলতে হয় তবে বলতে হয় তা অতুলনীয়। মন্দিরের গর্ভগৃহের শিখরটী দীর্ঘ ও ক্রমশঃই সরু হয়ে গেছে। এই শিখরটীকে কেন্দ্র করে চারদিকে ছোট ছোট শিখরের সমাবেশ। আশে-

পাশের নানা রঙের ফুলের সমারোহের মাঝখানে আকাশের দিকে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত দীর্ঘ মন্দির চূড়োটী এককালে সোনার পাত দিয়ে মোড়া ছিল। এই শিখরের ঠিক পেছনেই ধ্বজদণ্ড যেখান হতে মন্দিরের পতাকা পতপত করে বাতাসে ওড়ে। এই চূড়োর ঠিক সামনে এর গা দিয়ে উঠেছে মণ্ডপের স্তূপাকার ছাদ। ছাদের আলিসার চারদিকে ছোট ছোট থামের সংবদ্ধ মিছিল। সামনের-দিকে মাঝখানে তিন খিলানের মন্দিরের ছোট্ট অনুকৃতি যার দু'দিকে রত্নপেটিকার মতো দু'টী কাঠামো। মন্দিরের সম্পূর্ণটাই নানা রঙের উজ্জ্বল কাঁচ পাথর দিয়ে মোড়া, সৌন্দর্যে ও শালীনতায় যার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র পাওয়া ভার।

ভেতরেও সৌন্দর্যের যে উচ্ছলতা চোখে পড়ে তাও বলে বোঝানো প্রায় যায় না। কেবল আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। দেয়াল, ছাদ, খিলান, থাম সর্বত্রই কাঁচ ও পাথরের কাজ। সে কাজ পরিকল্পনা, বর্ণ-বৈচিত্র ও সুষম সমাবেশের জন্য মনে অতিন্দ্রিয় রাজ্যের আভাষ আনে। দুই থামের মাঝের খিলানে হাতে আঁকা জৈন পুরাণ ও ইতিহাসের সুন্দর সুন্দর ছবি। এরি সাথে মানান সই করে ছাদ হতে ঝোলানো নানা রঙের হাতেকাটা কাঁচের আলোর ঝাড়।

মন্দিরের বিগ্রহ পাওয়া নিয়েও এক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হলে শ্রীবদ্রীদাস তাঁর গুরু শ্রীকল্যাণ সূরীকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই মন্দিরে কোন তীর্থংকরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে? শ্রীকল্যাণ সূরী বলেন, শ্রীশীতল নাথের। এরপর সুরু হয় মূর্তির সন্ধান। কিন্তু মনোমত মূর্তি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। মূর্তির খোঁজে খোঁজে সেবার শ্রীবদ্রীদাস এসেছেন আগ্রায়। সেখানে এক ধর্মীয় মিছিলে তাঁর আলাপ হয় এক অপরিচিত বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে তিনি তাঁকে তাঁর অনুসন্ধানের কথা জানান। সাধুটী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাঁকে একখানে নিয়ে যান ও বলেন, তুমি যে মূর্তির অনুসন্ধান করছ সেই মূর্তি রয়েছে এইখানে মাটির তলায়। পরদিন শ্রীবদ্রীদাস লোকজন ও সেই সাধুটিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান ও মাটি খোঁড়াতে সুরু করেন। খানিক খুড়বার পরই নীচে নামবার একটি জীর্ণ সিঁড়ি পাওয়া যায়। সিঁড়িটি একটি গুহার

মুখের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছিল। শ্রীবদ্রীদাস সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। তারপর সেই গুহা মুখের কাছে গিয়ে তার ভেতরে একটি ছোট্ট মন্দিরের মতো দেখতে পেলেন। সেখানে সেই মন্দিরের মাঝখানে এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আরো দেখলেন সেই মূর্তির সামনে একটি ঘীয়ের প্রদীপ জ্বলছে। আর তাঁর মনে হল কে যেন এইমাত্র এখানকার পূজা শেষ করে উঠে গেছে। শ্রীবদ্রীদাস বিগ্রহের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তখুনি ওপরে উঠে এলেন ও সেই বিগ্রহকে সেখান হতে ওপরে তুলে আনালেন। তারপর যখন তিনি সেই সাধুর সন্ধান নিতে গেলেন তখন আর তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। শ্রীবদ্রীদাস সেই মূর্তিকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন ও তাঁর গুরু শ্রীকল্যাণ সূরীকে দিয়ে সেই মূর্তি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে যে 'অখণ্ড জ্যোতি' প্রদীপ মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন হতে আজ অবধি সমানভাবে জ্বলছে এই মূর্তির মতো তাও কিছু কম আশ্চর্যের নয়? এই প্রদীপের মাথার ওপর যে শ্বেত পাথর ঝোলানো রয়েছে তা প্রদীপের ধোঁয়ায় কোনো সময়ই কালো হয় না। ভক্তদের অনবধানতায় কোনো সময়ে যদি মন্দির অপবিত্র হয় তখন মাত্র সেই পাথরটা কালো হয়।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হতে আজ অবধি এই মন্দির ও উদ্যান কেবল যে ভক্তদেরই আনন্দ দিয়েছে তা নয়, অগণিত সাধারণ মানুষ, দেশী বিদেশী দর্শক বা পর্যটক সকলেই এই মন্দিরে এসে সমানভাবে আনন্দ পেয়েছেন, তাই আজো অগণিত মানুষ এই মন্দির দেখতে আসেন।

জৈন সাধু

ব্রাহ্মী জৈন

জিন প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈন ধর্ম। ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি যিনি জয় করিতে পারেন এমন মহাপুরুষকে 'জিন' বলা হয়।

জৈন ধর্মে অহিংসা তত্ত্বকেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইহাতেই সকল তত্ত্বের সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছে। জৈন ধর্মে 'সাধু', 'সাধ্বী', 'শ্রাবক' ও 'শ্রাবিকা' এই চার প্রকার তীর্থ মান্য করা হইয়াছে। এই চতুর্বিধ তীর্থকেই 'সঙ্ঘ' বলা হয়। বর্তমান সঙ্ঘ বা শ্রীসঙ্ঘ তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের স্থাপিত।

জৈন সাধু অত্যধিক কষ্টসহিষ্ণু, তপস্বী, সত্যবক্তা ও ধর্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আচার ব্যবহারও উচ্চ শ্রেণীর। তাঁহাদের মধ্যে নিন্দনীয় অভ্যাস—ক্রোধ, ইন্দ্রিয়-ললুপতা, ইত্যাদি থাকে না। যাহাতে সকলেই জৈন সাধুদের দেখিলেই চিনিতে পারেন তাহার জন্য জৈন সাধুদের আচার ব্যবহার ও বেশভূষা ইত্যাদির সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা করিতেছি।

জৈন সাধু একেন্দ্রিয় প্রাণী হইতে পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণী পর্যন্ত কোনো প্রাণীকেই হিংসা করাকে মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য তাঁহারা মুখের ওপর একখণ্ড বস্ত্র বাঁধিয়া রাখেন বা যাঁহারা সর্বদা তাহা রাখেন না তাঁহারাও উপদেশ ও শাস্ত্র পঠন-পাঠন বা কথা বলিবার সময় একখণ্ড বস্ত্র মুখের সামনে রাখেন। এই বস্ত্রকে 'মুহপত্তী' বা মুখ বস্ত্রিকা বলা হয়। মুখ নিঃসৃত উষ্ণ বায়ুতে বায়ুস্থিত সূক্ষ্ম জীবের প্রাণনাশ না হয় সেইজন্য এই সাবধানতা। মুহপত্তী বা মুখবস্ত্রিকা ব্যবহারের ফলে পঠন-পাঠনের সময় শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে থুতু পড়িতে পারে না।

চলিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে যাহাতে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কোন অবস্থাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গাদির প্রাণ নাশ না হয় তজ্জন্য জৈন সাধুগণ দণ্ডসমন্বিত একটি শ্বেতবর্ণ পশমের গুচ্ছ রাখেন।

উহাকে 'রজোহরণ' বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ অত্যন্ত কোমল হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ভূমিসংলগ্ন ভ্রাম্যমান জীবদিগকে ধীরে ধীরে সরাইয়া জৈন সাধুগণ গমনাগমন এবং উপবেশনাদি করিয়া থাকেন।

জৈন সাধুগণ শরীর আচ্ছাদনার্থ পরিমিত শ্বেত বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। কোন প্রকার রঙ-বেরঙের বস্ত্র বা সেলাই করা জামা ইত্যাদি ব্যবহার করেন না।

জৈন সাধুদের আদর্শ গুণ সত্যভাষণ। প্রাণপণে তাঁহারা এই ব্রত পালন করিযা থাকেন। এই কারণে জৈন সাধু মিতভাষী হইয়া থাকেন। কারণ অত্যধিক কথা বলিলে মুখ হইতে অসত্য বাক্য নিঃসৃত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

জৈন সাধুগণ ধাতু দ্বারা প্রস্তুত কোনো দ্রব্যই কোনো কাজে ব্যবহার করেন না। তাই কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র ব্যবহার করেন। সেই পাত্রে দেহরক্ষার জন্য তাঁহারা সৎগৃহস্থের নিকট হইতে শুদ্ধ আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করেন ও গুরুর সেবায় নিবেদন করিয়া পরস্পর তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া পানাহার করিয়া থাকেন।

জৈন সাধুদের যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু হইতে হয়। ইঁহারা সর্বদা খোলা মাথায় থাকেন। বিচরণ করিবার সময় গ্রীষ্ম, শীত কোনো ঋতুতেই মস্তকে ছাতা ধারণ বা কম্বল দ্বারা মস্তক আবৃত করেন না। এইরূপ চামড়া, কাষ্ঠ, সুতিবস্ত্রে তৈয়ারী কোনো রকম জুতো ব্যবহার করেন না। নগ্নপদে ভ্রমণ করেন।

জৈন সাধু সূর্যাস্তের পর কখনও আহার গ্রহণ করেন না। সূর্যাস্তের পর অন্যত্র গমনাগমন হতেও বিরত থাকেন।

জৈন সাধুরা পাঁচটী মহাব্রত পালন করেন। সেই মহাব্রতের প্রথম মহাব্রত অহিংসা। এই ব্রত যিনি সম্পূর্ণরূপে পালন করেন তিনিই সাধু।

মাটীতে অসংখ্য জীব আছে। এইজন্য জৈন সাধু কখনো পৃথিবী খনন করেন না। যে জায়গা সবুজ ঘাসে বা অন্য কোনো প্রকার লতাগুল্মে আচ্ছাদিত থাকে তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করেন না। শুকনো মাটির উপর দিয়া তাঁহারা যাতায়াত করেন ও বসিবার সময় রজোহরণের দ্বারা স্থান পরিষ্কার করিয়া উপবেশন করেন।

জলের মধ্যেও দৃশ্য অথবা অদৃশ্য অসংখ্য জীব থাকে। তাই জৈন সাধু নদী, পুষ্করিণী, কূপ বা টিউব-ওয়েলের কাঁচা জল কখনো ব্যবহার করেন না। এমন কি স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। গৃহস্থরা স্নানাদি জন্য যে জল গরম করিয়া রাখেন সেই নির্জীব জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রকারের জলকেও তাঁহারা ছাঁকিয়া ব্যবহার করেন।

অগ্নিতেও অনেক জীব থাকে। অগ্নি প্রজ্বালন করিলে বহু জীব নষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা রন্ধন করেন না বা রাত্রিতেও প্রদীপাদি প্রজ্বালন করেন না। শীতে কষ্ট হইলেও অগ্নি প্রজ্বালন করেন না বা আগুনে হাত পা গরম করেন না।

এই একই কারণে অত্যধিক গরমেও তাঁহারা পাখা, কাগজ বা বস্ত্রাদি দ্বারা হাওয়া করেন না। মুখ নিঃসৃত বাতাসে যাহাতে জীবহানি না হয় সেজন্য তাঁহারা মুখবস্ত্রিকা ধারণ করেন সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বনস্পতি কায়ের জীবদিগকে কষ্ট হইতে বাঁচাইবার জন্য জৈন সাধুগণ কখনও বৃক্ষাদি স্পর্শ করেন না এবং উহাদের ডাল পালা ভাঙেন না বা পুষ্প চয়ন করেন না বা কাহাকেও উক্ত কার্য করিতে অনুজ্ঞা করেন না।

এভাবে অহিংসাব্রতধারী জৈন সাধু কিভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করেন কিভাবে আহার গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। তাই এখন জৈন সাধুদের আহার পানীয় সম্বন্ধীয় নিয়ম বিবৃত করিতেছি। এই সম্পর্কে ১০৬টী নিয়ম আছে। এখানে প্রধান প্রধান কয়টির উল্লেখ করিলাম।

জৈন সাধুগণ নিজেরা রন্ধন করেন না বা অন্য কাহাকেও রন্ধন করিতে বলেন না। সদ্‌গৃহস্থের ঘরে প্রস্তুত খাবার হইতে সামান্য সামান্য খাবার ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা একত্রিত করিয়া কেবলমাত্র শরীর রক্ষার্থ পরিমিত আহার গ্রহণ করেন। ভিক্ষাবৃত্তির নিয়মও অত্যন্ত কঠিন।

জৈন সাধুগণ অনিমন্ত্রিত অবস্থায় গৃহস্থদের ঘরে যাইয়া কেবলমাত্র সেইটুকু আহার গ্রহণ করেন যাহার দ্বারা পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য তৈয়ারী করা খাবারে কম পড়িবার সম্ভাবনা না হয়। যদি কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিয়া বলেন, "মহারাজ, আজ আমার ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন" তবে জৈন সাধু আহারার্থে সেদিন সেখানে যান না। অর্থাৎ তাঁহাদের নিমিত্ত

তৈরী করা খাবার তাঁহারা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা স্বয়ং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা খাবার সংগ্রহ করেন অপর কাহারো দ্বারা সংগৃহীত খাবার গ্রহণ করেন না।

কোন গৃহস্থের দ্বারে যদি কোনো সাধু বা অন্য যাচক ভিক্ষা পাইবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে জৈন সাধু সে গৃহে ভিক্ষা নিমিত্ত গমন করেন না। কেননা তাহার ফলে উক্ত যাচকের ভিক্ষা প্রাপ্তিতে অন্তরায় হইতে পারে।

কোন জায়গায় যদি পশু-পক্ষীরা খাবার গ্রহণে প্রবৃত্ত থাকে তাহা হইলে জৈন সাধু উক্ত পথে গমন করেন না। কারণ তাহার ফলে উক্ত প্রাণী সকলের খাবার গ্রহণে বিঘ্ন হইতে পারে। জৈন সাধুগণ অর্গলবদ্ধ গৃহের দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

জৈন সাধুগণ ভুট্টা, যব, প্রভৃতি বিভিন্ন ফসল মাড়াইয়া চলেন না। ভিক্ষা দেওয়ার সময় যদি কেহ জলস্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে তাঁহারা ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। কেহ যদি বাটনা, মসলা, কাঁচা সব্জী, জল অথবা অগ্নি স্পর্শ করিয়া ভিক্ষা দেন তাহা হইলে তাঁহারা সেই ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

গর্ভবতী কোন স্ত্রীলোক যদি তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা তাহার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। কারণ গর্ভবতী স্ত্রীর চলাফেরার ফলে গর্ভস্থ শিশুর কষ্ট হইতে পারে।

জৈন সাধুগণ ভিক্ষা গ্রহণের জন্য যদি কোন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হন এবং সেই গৃহের কোন স্ত্রী যদি শিশুকে দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে উঠিয়া তাঁহাকে ভিক্ষাদান করেন তাহা হইলে শিশুর দুগ্ধ পানে বাধা পড়ায় জৈন সাধুগণ সে গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।

প্রবাসে বিচরণ কালে যদি কোন গ্রামে নিয়ম পুর্বক ভিক্ষা না পান তাহা হইলে জৈন সাধুগণ নির্জলা উপবাস করিয়া পথ কাটাইয়া দেন। জৈন সাধুগণ কেবল মাত্র গরম জলের ওপর নির্ভর করিয়া দুই মাস পর্যন্ত উপবাস করিয়া থাকেন।

সম্পূর্ণরূপে অসত্য ভাষণ পরিত্যাগ করা দ্বিতীয় মহাব্রত। সাধুগণ সর্বদা সত্য বচন বলেন। যাহাতে প্রাণী হিংসা হইতে পারে এরূপ সত্য ভাষণ করাও

তাঁহাদের পক্ষে উচিত নহে। সে স্থলে মৌনাবলম্বন করা উচিত। ক্রোধ, লোভ, ভয় বা হাস্যের বশীভূত হইলে মিথ্যা ভাষণ হইতে পারে, অতএব সাধুগণকে ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধুগণ মন, বচন ও কায়ার দ্বারা স্বয়ং অসত্য আচরণ করেন না, অন্য ব্যক্তির দ্বারা করান না, কেহ অসত্য আচরণ করিলে তাহা অনুমোদন করেন না।

তৃতীয় মহাব্রত অস্তেয় বা অদত্তাদান বিরমণ। জৈন সাধু মন. বচন ও কায়ার দ্বারা কখনও স্বয়ং চুরি করেন না, আর কেহ চুরি করিলে ভালো মনে করেন না এবং কাহাকেও চুরি করিতে বলেন না। তাঁহারা দাঁতখোটানো কাঠি পর্যন্ত মালিকের আজ্ঞা ব্যতিরেকে তোলেন না। এবং কোনো স্থানে যদি তাঁহাকে থাকিতে হয় তাহা হইলে মালিকের আজ্ঞা ব্যতিরেকে সেখানে থাকেন না। জৈন সাধু কোন বস্তুকে চুপি চুপি পাইবার কল্পনা পর্যন্ত করেন না।

চতুর্থ মহাব্রত ব্রহ্মচর্য। এই মহাব্রত জৈন সধুগণ নয় প্রকারে পালন করেন।

যে ঘরে স্ত্রীজাতি ও নপুংসক থাকে সেই ঘরে জৈন সাধু থাকেন না।

জৈন সাধু স্ত্রী সম্বন্ধে কখনও আলাপ আলোচনা করেন না।

স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত আসন জৈন সাধু ব্যবহার করেন না। যদি বা ভুলক্রমে ব্যবহার করেন তাহা হইলে উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

জৈন সাধু স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকেন না বা তাহাদের রূপ-লাবণ্য, বসন ভূষণ, হাব-ভাবাদির প্রশংসা করেন না।

জৈন সাধু একান্তে কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেন না।

গৃহস্থাশ্রমে থাকা কালীন যেসব ভোগ-বিলাসাদি উপভোগ করিয়াছেন জৈন সাধু তাহা স্মরণ করেন না।

জৈন সাধু মিষ্টান্নাদি ঘৃতপক্ক পদার্থ ভোজন করেন না। কারণ তাহা কামবাসনা জাগ্রত করে।

জৈন সাধু অতি সরস বা অতি নিরস আহার গ্রহণ করেন না। অত্যধিক ভোজনও করেন না।

শারীরিক সাজ-গোজ জৈন সাধুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এইজন্য তাঁহারা স্নান

করেন না বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করেন না অলঙ্কার, ফুলের মালা ইত্যাদি ধারণও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।

জৈন সাধুরা দাড়ি, গোঁফ ও মাথার চুল স্বহস্তে উৎপাটিত করেন। ইহাকে কেশ লুঞ্চন বা 'লোচ' বলা হয়। জৈন সাধুদের এবম্বিধ আচরণ তাঁহাদের কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচায়ক।

পঞ্চম মহাব্রত অপরিগ্রহ বা পরিগ্রহ নিবর্তন। জৈন সাধু সোনা-রূপা, মণি-মাণিক্য, তামা-পিতল কাঁসা কোনো প্রকার ধাতু দ্রব্য নিজেদের সঙ্গে রাখেন না। টাকা-পয়সা এমন কী ঘর-বাড়ী, মন্দির, কূপ-বাগান প্রভৃতিতেও নিজেদের সত্ব রাখেন না।

জৈন সাধু গরু, বলদ, মহিষ, উঁট, ছাগল প্রভৃতি বিভিন্ন পশু ও টিয়া, ময়না, পায়রা প্রভৃতি বিভিন্ন পাখী পোষণ করেন না এবং স্ত্রী, দাস দাসী, খাট, টেবিল, চেয়ার, সাইকেল, মোটর প্রভৃতি কোন বস্তু নিজের নিকট রাখেন না।

জৈন সাধু সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একবার অথবা দুইবার শরীর রক্ষার জন্য পরিমিত আহার গ্রহণ করেন। পরের দিনের জন্য খাবার সঞ্চয় করিয়াও রাখেন না। শরীরাচ্ছাদনের জন্য পরিমিত বস্ত্র ব্যবহার করেন। পরিবার বস্ত্র, কাষ্ঠপাত্র, অধ্যয়নের নিমিত্ত শাস্ত্র গ্রন্থ প্রভৃতি জিনিষ তাঁহারা নিজেরাই বহন করিয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে যাত্রা করেন। তাঁহারা কোন প্রকার যান-বাহনের সাহায্য লন না। এবং গমনপথের পার্শ্বস্থ গ্রাম গুলিতে ধর্মোপদেশ দান করিতে করিতে যান।

সূঁচ, সুতা বা কাঁচির প্রয়োজন হইলে জৈন সাধু গৃহস্থের বাড়ী হইতে চাহিয়া আনেন ও প্রয়োজন শেষ হইলে ফিরাইয়া দিয়া আসেন। কিন্তু অনবধানতা বশতঃ যদি ফেরৎ দিতে ভুলিয়া যান তবে একদিন উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন। আর যদি হারাইয়া ফেলেন তবে উহার মালিককে সূচনা দিয়া আসেন এবং তাহার জন্য দুইদিন উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

এই পাঁচটি মহাব্রতের অতিরিক্ত জৈন সাধু আর একটি ব্রত গ্রহণ করেন। সেই ব্রত রাত্রিভোজন নিবৃত্তি বা সূর্যাস্তের পরে অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে আহার না করা। এজন্য এরূপ পরিমিত আহার তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া আনেন যাহাতে অন্যদিনের জন্য বা রাত্রির জন্য অন্ন জল অবশিষ্ট না থাকে।

সংক্ষেপে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য, দান, দয়া, ক্ষমা ও শান্তি এইগুলি ধর্মের সাধন। জৈন সাধু সংসারের ভোগ-বিলাসের সাধন সকল পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর নিকট জ্ঞানোপার্জনের জন্য কঠিনতম সাধুব্রত অঙ্গীকার করেন ও উপরোক্ত নিয়ম সকল পালন করিয়া নিজের ও পরের আত্মার উদ্ধার সাধন করেন।

পণিত ভূমিতে লেখা

[ভগবান মহাবীর পশ্চিম বঙ্গের পণিত ভূমিতে বিচরণ করেছিলেন বলে আচারাঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। সেই সূত্র অবলম্বন করে এই কবিতাটি রচিত।]

দেখেছি তোমাকে পথের ওপর,
দেখেছি তোমাকে দুপুর বেলা—
সে কতকাল ?

খুলেছি আকাশ, খুলেছি জানালা।
পথ হেঁটে যাও দু'চোখ উদাস,
দু' বাহু উদাস,
ঝুরু ঝুরু কাঁপে পাতা।

ধুলো উড়ে যায়,
বেলা বেড়ে চলে,
গ্রামের কুকুর
আসে দলে দলে,
ঘেউ ঘেউ চীৎকার।
সে কতকাল ?

আপনার মনে পথ হেঁটে যাও,
চাও নাতো কোন দিকে :
কেবা এল কাছে,
কেবা গেল দূরে,
কে মারিল ঢিল,
কেবা দিল ফেলে—
ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

খরের তপন আগুণ ছড়ায়
মাটী হয়ে ওঠে লাল।
সে কতকাল ?

বৃক্ষের নীচে দাঁড়ায়ে রয়েছ
দ্রুত বেলা ঝরে যায়—
দ্রুত ঝরে যায়,
দ্রুত গলে যায়,
সারাদিন অনাহার ;
কাঁপিছেনা তবু বুকের চাতাল,
নড়িছেনা তবু ঠোঁটের পাতাল,
দু'চোখ তোমার শান্তির পারাবার !
সে কতকাল ?

আমি হতে চাই তোমার মতন,
গাছের মতন,
মুক্ত জীবন, মুক্ত স্বাধীন,
হে প্রভু আমার !

তোমার মতন কর্ম গহন
করিব দহন করিব দহন—
তোমার মতন করিব বহন
সকল কলুষ ভার।

নড়িবে না মোর বুকের বিশাল,
কাঁপিবে না মোর ঠোঁটের পাতাল,
দু' চোখ আমার শান্তির পারাবার।

দেখেছি তোমাকে পথের ওপর,
দেখেছি তোমাকে দুপুর বেলা—
সে কতকাল?

জৈন দর্শন ও তার পৃষ্ঠভূমি

ডাঃ কৈলাশ চন্দ্র শাস্ত্রী

[পূর্বানুবৃত্তি]

জৈন ধর্মের আদি প্রবর্তক ছিলেন ভগবান ঋষভদেব ও শেষ প্রবক্তা ভগবান মহাবীর। ভগবান মহাবীর সংসারের দুঃখ পীড়িত জীবের উদ্ধারের জন্য সার্বজনিক ভাবে অহিংসা ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধও বিশ্ব দুঃখরূপ বলে, ক্ষণিক বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলকে বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যাতে অত্যাচার, অনাচার ও হিংসার অবসান হয়। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারিরা ক্ষণিকবাদের ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন শূন্যবাদের। অপরপক্ষে ভগবান মহাবীর পর্যায়ের দৃষ্টিতে বিশ্বকে ক্ষণিক বললেও দ্রব্যের দৃষ্টিতে নিত্য বলে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর বলবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে দৃশ্যমান জগতে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তন প্রতিনিয়ত হওয়ার জন্য তা ক্ষণিক কিন্তু মূলতত্ব নিজে ক্ষণিক নয়। অন্য দর্শনে কাউকে নিত্য কাউকে অনিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু জৈন দর্শনে—

আদীপমাব্যোম সমস্বভাবং
স্যাদ্বাদমুদ্রানতিভেদি বস্তু।
তন্নিত্যমেবৈকমনিত্যমন্যদ্
ইতি ত্বদাজ্ঞা দ্বিষতাং প্রলাপাঃ ॥

আকাশ নিত্য, প্রদীপ ক্ষণিক, তা নয়। আকাশ হতে প্রদীপ সকলেই সমস্বভাববিশিষ্ট। কোনো বস্তুই সেই স্বভাব অতিক্রম করতে পারে না। কারণ তার ওপর স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদের ছাপ রয়েছে। হে জিনেন্দ্র! যারা তোমায় দ্বেষ করে তারাই এই বস্তু নিত্য এই বস্তু অনিত্য এই প্রলাপ বকে।

জৈন দর্শনে এক দ্রব্য পদার্থকে স্বীকার করা হয়েছে এবং এভাবে স্বীকার করা হয়েছে যাতে অন্য কিছু স্বীকারের প্রয়োজনীয়তাই থাকে না।

আচার্য কুন্দকুন্দ তাঁর 'প্রবচন সারে' দ্রব্যের লক্ষণ এই প্রকার দিয়েছেন :

অপরিচ্চত্তসহাবেণুপ্পাদব্বয়ধুবত্তসংজুত্তং।
গুণবং সপজ্জায়ং জং তং দব্বংত্তি বুচ্চংতি ॥

যা নিজের অস্তিত্ব স্বভাবকে পরিত্যাগ না করে উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রৌব্য যুক্ত ও গুণ ও পর্যায়ের আধার তাই দ্রব্য।

এর তাৎপর্য হল যা গুণ ও পর্যায়ের আধার তাই দ্রব্য। এই গুণ ও পর্যায় দ্রব্যের আত্মস্বরূপ তাই তাকে কোনো সময়েই দ্রব্য হতে পৃথক করা যায় না। দ্রব্যের পরিণাম বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তিকে পর্যায় বলা হয়। পর্যায় সর্বদা একরূপ থাকে না, তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এক পর্যায় নষ্ট হয়ত সেই মুহূর্তেই অন্য পর্যায়ের উদ্ভব হয় এই জন্য পর্যায়ের আধার দ্রব্যকে উৎপাদ ও ব্যয় যুক্ত বলা হয়। আর যে জন্য দ্রব্য স্বজাতীয়ের সঙ্গে একরূপ ও বিজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নরূপ তাই তার গুণ। গুণ অনুবৃত্তি রূপ, পর্যায় ব্যাবৃত্তিরূপ। এজন্য জৈন দর্শনে সামান্য ও বিশেষ এই দুই পৃথক পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না।

দ্রব্য জীব, পুদ্গল, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশ ও কাল ভেদে ষড়বিধ। আচার্য কুন্দকুন্দ জীব বা আত্মাকে অরস, অরূপ, অগন্ধ, অশব্দ, অলিঙ্গ, নিরাকার ও চৈতন্য রূপ বলেছেন।

অরসমরূবমগন্ধং অব্বত্তং চেদণাগুণ মসদ্দং।
জাণ অলিংগগহণং দব্যমণিদিট্‌ঠসংঠাণং ॥

রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ যুক্ত অজীব পদার্থকে পুদ্গল বলা হয়। যার পূরণ ও গলন অর্থাৎ বৃদ্ধি ও হ্রাস, সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ হয় তাই পুদ্গল। পুদ্গল অণু ও স্কন্ধ ভেদে দ্বিবিধ। দুই বা ততোধিক পরমাণুর পরস্পরের সংযোগে উৎপন্ন জড় পদার্থকে স্কন্ধ বলে।

জীব ও পুদ্গলের গতিতে যা সহায়ক হয় তাকে ধর্ম ও স্থিতিতে যা সহায়ক হয় তাকে অধর্ম দ্রব্য বলে। যা অবকাশ দেয় তাকে আকাশ ও দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে যা সাহায্য করে তাকে কাল বলা হয়। সমস্ত জগৎ এই ছ'টি দ্রব্যময়।

যেহেতু এই দর্শনে দ্রব্যকে পরস্পরবিরোধী নিত্য অনিত্য সৎ অসৎ ধর্মময় বলা হয় সেই জন্য এই দর্শনকে অনেকান্তবাদ দর্শন বলেও অভিহিত করা হয়। যেমন—প্রত্যেক বস্তু দ্রব্য রূপে নিত্য, পর্যায় রূপে অনিত্য; স্বরূপে সৎ পররূপের অপেক্ষায় অসৎ' এইটিই অনেকান্তবাদ। অর্থাৎ একান্ত দৃষ্টিতে নিত্য অনিত্য বলে কিছুই নেই, অথচ অপেক্ষা ভেদে সব রয়েছে। সেই জন্য এই দর্শনকে আবার সাপেক্ষবাদ দর্শনও বলা হয়েছে। অনেক ধর্মাত্মক বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তাই এই দর্শনে স্যাদ্বাদের অবতারণা। স্যাদ্বাদের স্যাৎ শব্দ অনেকান্ত রূপ অর্থের বাচক বা দ্যোতক অব্যয়। তাই স্যাদ্বাদ ও অনেকান্তবাদকে একার্থকও বলা হয়। জৈন মনিষীরা স্যাদ্বাদের নিরূপনে ও সমর্থনে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখেছেন ও অনেকান্তরূপী শস্ত্রের দ্বারা অন্য দার্শনিক মতবাদের নিরসন করেছেন। সমন্তভদ্র ও সিদ্ধসেন, হরিভদ্র ও অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দী, প্রভাচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের মতো জৈন বিদ্বানেরা অনেকান্ত-বাদ সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছেন তা ভারতীয় দর্শনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাই আজ অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্বাদের কথা বললে তা জৈন দর্শনকেই লক্ষ্য করে সে কথা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না।

অনেকান্তবাদ জৈন আচার ও বিচারের মূল। তার ওপর ভিত্তি করে সমস্ত বাদ বিবৃত হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি মুখ্য বাদ হল নয়বাদ ও সপ্তভঙ্গীবাদ। নয়বাদে দর্শন গুলো স্থান পেয়েছে, সপ্তভঙ্গীবাদে স্থান পেয়েছে কোনো এক বস্তু সম্পর্কিত প্রচলিত বিরোধী মতবাদগুলি। প্রথমটীতে সমস্ত দর্শন সংগৃহীত, দ্বিতীয়টী দর্শনের অতিরিক্ত মন্তব্যের সংগ্রহ।

এর তাৎপর্য এই যে ভারতীয় দর্শনে জৈন দর্শনের অতিরিক্ত বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৌদ্ধদর্শন মুখ্য ছিল। এই সব দর্শনকে পূর্ণ সত্য বলে স্বীকার করায় আপত্তি ছিল অথচ সম্পূর্ণ অসত্য বলাতে সত্যের অপলাপ হত। তাই তাঁদের আংশিক সত্যতা স্বীকার করার জন্য নয়বাদের অবতারণা। এভাবে স্যাদ্বাদ, সপ্ত ভঙ্গীবাদ ও নয়বাদ এই তিন বাদ অনেকান্তবাদী জৈন দর্শনের অবদান যা অন্য দর্শনে দেখা যায় না।

জৈন দর্শন স্ব ও পর প্রকাশক সম্যকজ্ঞানকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করে এবং আত্মা জ্ঞান স্বরূপ বলে, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে আত্মায় যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়

তাকেই প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাকে পরোক্ষ বলে অভিহিত করে। পরোক্ষ জ্ঞান অপারমার্থিক, তাই হেয়। পারমার্থিক প্রত্যক্ষ কেবল জ্ঞানই উপাদেয়। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের মতো ইন্দ্রিয় জন্য সুখও অপারমার্থিক, তাই হেয়। জৈন ধর্ম একথা বলে যে, যে সমস্ত প্রাণীদের সাংসারিক সুখ ভোগে আসক্তি দেখা যায় তারা স্বভাবতঃই দুঃখী। দুঃখী কারণ তারা যদি দুঃখী না হত তবে সাংসারিক বিষয় প্রাপ্তির জন্য রাতদিন ব্যাকুল হয়ে ছুটে বেড়াত না। তারা বিষয় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সেই দুঃখের প্রতিকারের জন্য বিষয়াসক্ত হয় কিন্তু তাতে তৃষ্ণা শান্ত হয় না, আরো প্রজ্বলিত হয়। এইজন্যই সত্য সুখ লাভের জন্য ইন্দ্রিয়জ বৈষয়িক সুখ পরিত্যজ্য।

[ক্রমশঃ

জৈন ধর্ম ও ভারতীয় ইতিহাস

ডাঃ এস, বি, দেও

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিন্দুসার : চন্দ্রগুপ্তের পর বিন্দুসার পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন বা ছিলেন না সে সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না কারণ জৈনসাহিত্য তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।

অশোক : বিন্দুসারের পর অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক কালে ভারতের সর্বপ্রথম সার্বভৌম নরপতি। তাঁর অনুশাসনে যে উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে অনেকে মনে করেন যে তিনি জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। আবার তাঁকে অনেকে বৌদ্ধ বলেও অভিহিত করেন।

কার্ণ বলেন, তাঁর অনুশাসনগুলো পর্যালোচনা করলে দু'একটী জায়গা ছাড়া তাতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাতে বলা যায় যে এগুলি বৌদ্ধ।

ডাঃ হেরাস ঠিকই বলেছেন যে অশোক জৈনদের অহিংসা বা প্রাণাতিপাত বিরমণ ব্রতের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

তাই অশোকের সময়ে জৈনধর্মের অবস্থা কি রকম ছিল তার কোনো উল্লেখই যখন জৈন সাহিত্যে দেখিনা তখন আশ্চর্য হই।

কুণাল : অশোক পুত্র কুণাল সম্পর্কে জৈন সাহিত্যে একটী চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে পাটলীপুত্রে অশোকশ্রী নামে এক রাজা ছিলেন। কুণাল নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। কুণালের ভরণপোষণের জন্য তিনি তাকে উজ্জয়িনী প্রদেশ প্রদান করেন। কুণালের বয়স যখন আট তখন তিনি তার শিক্ষা তরান্বিত করবার জন্য এক বার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু কুণালের বিমাতা 'অধীয়তাম' এই শব্দটীর 'অ'-র ওপর অনুস্বর বসিয়ে দেন যার ফলে আদেশের অর্থ দাঁড়ায় কুমারকে এখুনি অন্ধ করে দেওয়া হোক্। সেই

আদেশ পেয়ে কুণাল নিজের হাতেই নিজের চোখ উপড়ে ফেলেন। কিছুকাল পরে অশোক কুণালের প্রতি সন্তুষ্ট হলে কুণাল তাঁর পুত্র সম্প্রতির জন্য সিংহাসন প্রার্থনা করেন। পূর্ব জন্মে সম্প্রতি নাকি আর্য সুহস্তীর শিষ্য ছিলেন। অশোক কুণালের সেই অনুরোধ রক্ষা করেন ও উজ্জয়িনীর শাসন ভার সম্প্রতির ওপর অর্পণ করেন। সম্প্রতি পরে সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করে নেন।

কুণাল যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তা এই বিবরণ ছাড়াও বৌদ্ধ ও পৌরাণিক বিবরণেও সমর্থিত হয়। সেখানেও তাঁকে সম্প্রতির পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। হেমচন্দ্র ও জিনপ্রভসূরীও কুণালের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

দুটো জিনিষ এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার: (১) কুণাল অশোকের পর' সিংহাসনে আরোহণ করেন নি; (২) রাজশক্তির কেন্দ্র রূপে পাটলীপুত্রের চাইতেও উজ্জয়িনী ক্রমশঃ গুরুত্ব অর্জন করতে আরম্ভ করেছে।

সম্প্রতি ও দশরথ: অশোকের দুই পৌত্র সম্প্রতি ও দশরথের নাম আমরা পাই। এঁদের কী সম্পর্ক ছিল তা সঠিক আমরা জানি না—কারণ জৈন ও বৌদ্ধ বিবরণ দশরথের নামোল্লেখ পর্যন্ত করে নি। তবে তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন সে কথা বলা যায়। কারণ নাগার্জুনী পাহাড়ে আজীবিক সম্প্রদায়ের সাধুদের বসবাসের জন্য তিনি কয়েকটি গুহা দান করেছিলেন।

তাই মনে হয় অশোকের পর তাঁর এই দুই পৌত্র একই সময়ে —সম্প্রতি উজ্জয়িনী হতে ও দশরথ পাটলীপুত্র হতে দেশ শাসন করেছিলেন।

এ দু'জনের মধ্যে সম্প্রতি ছিলেন জৈনধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজ্য লাভের পর তিনি যখন প্রখ্যাত জৈনাচার্য আর্য সুহস্তীর সম্পর্কে আসেন তখন হতেই তাঁর ভক্ত ও অনুযায়ী হন ও শ্রাবক ব্রত গ্রহণ করেন।

সম্প্রতি তাঁর অধীনস্থ সামন্তরাজদের উজ্জয়িনীতে আহ্বান করে জৈনধর্মের মূল তত্ত্ব তাঁদের বুঝিয়ে দেন ও উজ্জয়িনী ও উজ্জয়িনীর নিকটস্থ

স্থানগুলিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা, মূর্তি সংস্থাপন ও পূজা ও উৎসবাদির প্রচলন করেন। তিনি করদ রাজাদেরও তাঁদের অধিকারে জীবহত্যা বন্ধ করতে নির্দেশ দেন ও শ্রমণদের যাতায়াতের পথ সুগম ও বিঘ্নহীন হয় সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

তাই বলা যায় যে সম্প্রতি জৈনধর্মের প্রসারে প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যদিও সেই সময় মৌর্যদের কার্য কলাপ পূর্ব ভারতের চাইতে পশ্চিম ও মধ্যভারতে কেন্দ্রিত হতে আরম্ভ করেছিল। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতেও জৈনধর্ম প্রসারের পথ আরো বিস্তৃত করেছিলেন যার সূত্রপাত তাঁর প্র-প্রপিতামহ চন্দ্রগুপ্ত করে গিয়েছিলেন।

খারবেল: আমরা ইতিপূর্বেই নন্দরাজ কর্তৃক কলিঙ্গজিন মগধে নিয়ে যাবার উল্লেখ করেছি। এতে কলিঙ্গ দেশে জৈনধর্ম নন্দরাজাদের পূর্বেও যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেই কথাই প্রমাণিত হয়।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে শ্রমণ বাসোপযোগী অনেক গুহা রয়েছে যার কোনো কোনোটিতে ব্রাহ্মী লিপিতে শিলা লেখ উৎকীর্ণ। এই শিলা লেখগুলি মৌর্যকালীন। তাই খৃঃ পূঃ ২য় ৩য় শতকে কলিঙ্গ দেশে জৈনধর্ম যে খুব প্রভাবশালী ছিল সেকথা বলা যায়

খারবেলর শিলালেখ: খারবেলর শিলালেখে মাত্র সতেরটী লাইন আছে। কিন্তু কলিঙ্গ দেশে জৈনধর্মের ইতিহাসের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অনেকখানি। জৈন রীতি অনুসারে অর্হৎ ও সিদ্ধদের নমস্কার করে এর আরম্ভ। তারপর খারবেলর রাজত্বের ১৫ বছর হতে যে ইতিহাস সেই ইতিহাস এতে বিবৃত হয়েছে। জৈনদৃষ্টিতে যা মূল্যবান তা এই:

(১) তিনি মগধরাজ বহসতি মিত্রকে পদানত করেন। তারপর নন্দরাজ কর্তৃক অপহৃত কলিঙ্গজিনের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন।

(২) তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে কুমারী গিরিতে ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেন। সেখানে গুহা ও মন্দিরাদির সুরক্ষার জন্য অর্থ ও শ্রমণদের শ্বেত ও চীন বস্ত্র প্রদান করেন।

(৩) বিভিন্ন স্থান হতে জৈন শ্রমণদের আমন্ত্রণ করে একটী ধর্ম সঙ্গীতির আয়োজন করেন।

(৪) তিনি চৌষট্টি অক্ষর সম্বলিত সপ্তবিধ অঙ্গ পুনর্নিরূপিত করান। মৌর্যকালে এগুলি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

(৫) তিনি দেহ ও আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন।

এই অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে কলিঙ্গ এবং মগধে মৌর্য পূর্ববর্তী নন্দ রাজাদের সময় হতে মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল। জৈনধর্মগ্রন্থ দ্বাদশাঙ্গের অন্তর্গত ন্যা[illegible]কহাতেও দোবাই কর্তৃক জিনপ্রতিমা পূজার উল্লেখ দেখা যায়। এর তাৎপর্য এই যে প্রাক-মৌর্যকালে কলিঙ্গ দেশে জৈনধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং সম্ভবতঃ মহাবীরই সেখানে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কারণ জৈনগ্রন্থে তাঁর তোসালি গমনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খারবেল কর্তৃক বহসতি মিত্রের (পুষ্যমিত্র) পরাজয় হতে মনে হয় যে খারবেল মগধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন। এবং সম্ভবতঃ মগধ আক্রমণের সময় বাঙ্‌লা ও বিহারের পূর্বাঞ্চল জয় করেছিলেন। কারণ এই অঞ্চলে পাওয়া জৈন মূর্তি ও মন্দিরের ব্যাপক ধ্বংসাবশেষে এই কথাই প্রমাণিত করে যে এখানে এক সময় জৈনধর্ম প্রবল আকারে বর্তমান ছিল।

খারবেলর অগ্রমহিষী কতৃক জৈন শ্রমণদের জন্য গুহা ও মন্দির নির্মাণে আরো মনে হয় যে খারবেলর জৈনধর্মের প্রতি অনুরাগে তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

অথচ জৈনধর্মের এত বড় পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে জৈন সাহিত্য একেবারে নীরব। জৈন সাহিত্যে বিপক্ষ রাজাদের নামেরও উল্লেখ দেখা যায়। তাই কেন যে তাঁরা খারবেলর নাম একেবারে অবলুপ্ত করে দিলেন সে কথা একটুও বোঝা যায় না।

[ক্রমশঃ

পদ্মপুরাণ

[কথাসার]

ডাঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ইহা শুনিয়া ভরত কহিলেন—"মৃত্যু বালক, তরুণ বা বৃদ্ধ সকলকেই প্রতিমুহূর্তে গ্রাস করিতে পারে। অতএব, বৃদ্ধাবস্থার জন্য অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করি না।"

পিতা বলিলেন—"দেখ, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও ধর্মার্জন করা যায়। যাহারা কাপুরুষ তাহারাই গৃহস্থাশ্রমে ধর্মচ্যুত হইতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা করে।"

ভরত বলিলেন—"ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, কাম ক্রোধাদিতে অভিভূত গৃহস্থের মুক্তি কোথায়?"

দশরথ বলিলেন—"মুনিরাও ত মুক্তিলাভ করিবেনই এমন কোনো স্থিরতা নাই। অতএব, তুমি কিছুদিন গৃহস্থ ধর্ম পালন কর।"

ভরত বলিলেন—"পিতঃ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য। পরন্তু গৃহস্থের কদাপি মুক্তিলাভ হয় না। মুনিগণের মধ্যেই সকলের মুক্তিলাভ হয় না, কাহারও হয় আর কাহারও হয় না। গৃহস্থের মুক্তিলাভ পরম্পরাক্রমে হইতে পারে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই হয় না। এই জন্য, গৃহস্থাচার অল্পশক্তি বালকদিগের জন্যই অভিপ্রেত। ইহাতে আমার আদৌ রুচি নাই। এই জন্যই আমি মহাব্রত ধারণ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। অশেষ শক্তিশালী পক্ষিরাজ গরুড় কি কখনও পতঙ্গের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে?"

ভরত এইরূপ যুক্তিযুক্ত বহু কথা বলিলে, মহারাজ দশরথ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"পুত্র! তুমি ধন্য। জিনদেবের আদেশ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু এক কথা—আজ পর্যন্ত তুমি কখনও আমার আদেশ লঙ্ঘন কর নাই। তুমি মহাবিনয়ী অতএব, স্থিরচিত্তে আমার কথা শ্রবণ কর।

"তোমার মাতা কেকয়ী এক যুদ্ধের সময় আমার সারথির কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কার্যের নৈপুণ্যেই আমি সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি 'সময়ান্তরে বর প্রার্থনা করিব', এই বলিয়া তখন বর গ্রহণ করেন নাই। আজ তিনি 'আমার পুত্রকে রাজ্য দাও' এই বর প্রার্থনা করিয়াছেন এবং আমি তাঁহাকে সেই বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।

"সুতরাং তুমি ইন্দ্রের সাম্রাজ্যের তুল্য এই রাজ্য নিষ্কণ্টকে কিছুদিন পালন করিয়া যাহাতে পৃথিবীতে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপযশঃ ঘোষিত না হয় তাহা কর। তুমি আমার কথা না শুনিলে তোমার মাতা শোকে অধীর হইয়া হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। যে পিতামাতাকে শোকসাগরে নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করে সেই প্রকৃত পুত্র।"

দশরথ এইরূপ বুঝাইলে শ্রীরামচন্দ্রও বলিলেন—পিতৃদেব যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কথা। এ সময় তোমার তপস্যা করিবার উপযুক্ত কাল নহে। কিছুদিন রাজ্য পরিচালন কর। তাহাতে একদিকে পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইবে ও দেশ দেশান্তরে তাঁহার কীর্তি ঘোষিত হইবে। আর একদিকে পিতার আজ্ঞা পালন করিবার জন্যেই অনিচ্ছাস্বত্বেও রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায় তোমারও প্রশংসা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তোমার মত গুণবান পুত্রের কারণেই যদি মাতৃদেবী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন তাহা হইলে যে বড় লজ্জার কথা।

"আমি সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কোন পর্বত বা বনপ্রদেশে বাস করিব। আমার সন্ধানও কেহ জানিতে পারিবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য পালন করিতে থাক।"

এই প্রকারে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া পিতা ও রাণী কেকয়ীকে নমস্কার করিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাম ধনুক হাতে লইয়া মাতাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"মা, আমি দেশান্তরে চলিলাম। আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না।" ইহা শুনিয়া মাতা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি

অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"বৎস! আমাকে শোক সমুদ্রে ভাসাইয়া তুমি কোথায় চলিলে? পুত্রই মাতার অবলম্বন।"

মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া রামচন্দ্র বলিলেন—"দুঃখ করিবেন না। আমি দক্ষিণ দেশে কোথাও স্থান নির্দিষ্ট করিয়া অবশ্যই আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব। পিতা কেকয়ী মাতাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তাই কেকয়ী যে বর প্রার্থনা করিয়াছেন তাহারই অনুসারে ভরতকে তিনি রাজ্য দান করিয়াছেন। সেই জন্যই আমি আর এখানে রহিব না।" তখন মাতা পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি তোমার সঙ্গেই যাইব। তোমাকে না দেখিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। স্ত্রীলোক পিতা, পতি এবং পুত্রের অধীন হইয়া থাকে। আমার পিতা বহুদিন হইল কালগ্রস্ত হইয়াছেন। পতি জিনদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে আমার কি অবস্থা হইবে।"

তখন রামচন্দ্র বলিলেন—"মা, পথ কঙ্কর, প্রস্তর ও কণ্টকে দুর্গম হইয়াছে। আপনি এইরূপ পথে কোন মতেই পদব্রজে চলিতে পারিবেন না। এইজন্য আমি কোন সুখময় স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রথে করিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে আমি অবশ্যই আপনাকে লইয়া যাইব। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

এইরূপে মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় পিতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহাকে নমস্কার করিয়া কেকয়ী, সুমিত্রা, সুপ্রভা প্রভৃতি সকলকে নমস্কার করিলেন এবং সমবেত জনসমুদয়কে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন; যাহারা কাঁদিতেছিল তিনি সযত্নে তাহাদের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। সকলেই তাঁহাকে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

সীতা পতিকে বিদেশ গমনে উদ্যত দেখিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে নমস্কার করিয়া তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ রামের এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন—পিতা স্ত্রীর বাক্যে এ কী গুরুতর

অন্যায় কার্য করিলেন ? রামকে ছাড়িয়া অপরকে রাজ্য দেওয়া ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত কার্য আর কি হইতে পারে ? আমি এখনই সমস্ত দুরাচার ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়া শ্রীরামকে রাজ্যলক্ষ্মীর অধিপতি করিতে পারি। কিন্তু তাহা আমার নিকট উচিত বলিয়া মনে হয় না। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু এবং পরিণামে অশেষ দুঃখের কারণ। পিতৃদেব এখন দীক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এ সময় ক্রোধ করা উচিত নহে, ভালমন্দ বিচার করিবার কর্তা পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা যাহা করিবেন সে বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ধনুর্বাণ হাতে লইলেন এবং সমস্ত গুরুজনকে নমস্কার করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তখন জানকীর সহিত দুই ভাই রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে মাতা, পিতা, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য সকল লোক অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাই তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া অতিশয় কষ্টের সহিত গৃহে ফিরাইয়া দিলেন।

সামন্তগণ তাঁহাদের জন্য বহু হাতী, ঘোড়া ও রথ লইয়া আসিয়াছিল। সেই সকল গ্রহণ করিতে বলায় তাঁহারা বলিলেন—"আমরা পদব্রজেই যাইব। অতএব তোমরা ইহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

রাত্রি হওয়ায় রাম লক্ষ্মণ চৈত্যালয়ের সমীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে পুনরায় কৌশল্যা প্রভৃতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে দুই ভাই তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিলেন।

[ক্রমশঃ

জৈন ভবন কর্তৃক প্রকাশিত
অতিমুক্ত সম্পর্কে কয়েকটী অভিমত :

জৈন সাহিত্য হইতে ষোড়শটি কাহিনী আহরণ করিয়া অতি সহজ ভাষায় সেগুলি এ গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন শ্রীগণেশ লালওয়ানী। ভাষা শুধু সহজই নয়, সাবলীল, লালিত্যপূর্ণ। পড়িতে এত ভালো লাগে যে বার বার পড়িতে ইচ্ছা হয়।

বাঙ্‌লা ভাষায় সাহিত্যধর্মী জৈন আধ্যাত্ম-সম্পদ পরিবেশনের দিক দিয়া গ্রন্থটিকে এ পথের দিশারী বলা চলে। এ বিষয়ে, লেখককে লিখিত গ্রন্থটির কভারে মুদ্রিত ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি : 'জৈন ধর্ম, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু বই বাঙ্‌লা ভাষায় আমরা পাইতেছি। কিন্তু জৈন শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে এইরূপ উপাখ্যান সংগ্রহ আমি আগে দেখি নাই। কি আর্ষ প্রাকৃতে, কি অন্য প্রাকৃতে, কি সংস্কৃতে, কি অপভ্রংশে, কি প্রাচীন গুজরাটী, রাজস্থানী ও হিন্দীতে জৈন উপাখ্যান-সম্পদ প্রসারে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তবে অধিকাংশ উপাখ্যান মুনি, যতি ও সাধুদের কথিত বলিয়া ধর্মমূলক এবং প্রায় সর্বত্রই প্রব্রজ্যার মহিমা-প্রকাশক। সাধারণ পাঠক ইহা হইতে যে সাহিত্য রস পাইয়া থাকে, তাহা মুখ্য নহে, গৌণ। কিন্তু এমন বহু জৈন উপাখ্যান আছে, যেগুলি রস-সর্জনায় অতি মনোহর এবং বৈরাগ্য ধর্মের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও রসধারা সাহিত্য-কলা-প্রেমিক সমস্ত সহৃদয়কে প্রীত করিবে। আপনার এই ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল চলিত বাঙ্‌লায় লিখিত 'অতিমুক্ত' বইখানি বোধ হয়, রসোত্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান সাহিত্যকে বিদগ্ধ জনসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস।'

গ্রন্থটীর বহুল প্রচলন একান্ত কাম্য।

—উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮০

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য যেমন সম্প্রতি কালের পাঠকদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত হয়েছে, প্রাচীন জৈন সাহিত্য ততটা নয়। শ্রীগণেশ লালওয়ানী এই জৈন সাহিত্যের কথানক শাখার সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যই বর্তমান গল্প সঙ্কলনটী প্রকাশ করেছেন।···উদ্দেশ্য যাই হোক, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের আবির্ভাব যে শুধু ধর্মীয় জীবনে নয়, শিল্প জীবনেও এক বড় রকমের আলোড়ন তুলেছিল, জৈন সাহিত্য তা প্রমাণ করে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক মোট ষোলটী ছোট ছোট গল্প কথার মাধ্যমে জৈন সাহিত্যের পরিচয়টী তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'অতিমুক্ত' নামেই গ্রন্থের প্রথম গল্প। রাজপুত্র অতিমুক্ত কি ভাবে বালক কালের একটি ঘটনা স্মরণে ক্রমশঃ দিব্য জীবনে অবগাহন করেন, সেই কথা সরস ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। 'সনৎকুমার' গল্পেও রাজা সনৎকুমারের রূপের অহঙ্কার, তা থেকে অরূপের সাধনায় আত্মার উদ্বোধনের কাহিনী বর্ণিত। 'চিলাতিপুত্র' গল্পে এক দাসীপুত্র ও শ্রেষ্ঠীকন্যা সুষমার প্রেম, শ্রেষ্ঠীর চিলাতীপুত্রের প্রতি ঘৃণা, তার সঙ্গে সংঘর্ষ, সুষমার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে চিলাতীপুত্রের পলায়ন এবং শেষে এক শ্রমণের সাক্ষাতে আত্মবিচার ও আত্মশুদ্ধির কাহিনী চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'নন্দীসেন' গল্পেও কুৎসীৎ দর্শন, সংসারে অবহেলিত নায়ক শেষে শ্রমণ সাহচর্যে ও সেবায় সিদ্ধিলাভ করে। বস্তুতঃ 'মেতার্য', 'নাগিলা', 'মল্লী', 'কপিল' ইত্যাদি অন্যান্য গল্পেও সেই আধ্যাত্মিক উত্তরণের কথা বর্ণিত হয়েছে।···লেখকের ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী গল্পগুলিকে সত্যিকারের প্রাণবন্ত করেছে।

—অমৃত, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

"জৈন কথানক সাহিত্যের সুনির্বাচিত ষোলটী গল্প অতি প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে বর্ণিত। গ্রন্থটী সহজেই সমাদৃত হ'বে আশা করা যায়।"

—দেশ, ২৬ ফাল্গুন, ১৩৭৯

"যাঁকে নিয়ে এই বইয়ের প্রথম গল্প, তাঁর নাম অতিমুক্ত। প্রথম জীবনে ছিলেন পোলাসপুরের রাজপুত্র পরে তিনি হন জৈন শ্রমণ। তাঁর নামেই এই বইয়ের নাম। কেননা নামটার একটা গভীর অর্থও আছে। এ-বইয়ের সবগুলো গল্পই কোন-না-কোন ভাবে মানুষের মুক্তি পাওয়ার কাহিনী।

বৌদ্ধ জাতক গল্পগুলোর সঙ্গে, আবার নাভা রচিত 'ভক্তমাল' সাহিত্যের সঙ্গেও জৈন কথা-সাহিত্যের সাদৃশ্য আছে। জৈন ধর্মে 'মুক্তি' বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে অনেক রচনা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, সেই মুক্তির তাৎপর্য 'অতিমুক্ত' বইটীতে অনেক বেশী স্পষ্ট করে বোঝা যাবে। যেমন ভক্তমাল-এর গল্পগুলি পড়লে 'ভক্তি' বলতে কী বোঝায় তা বেশী স্পষ্ট হয়।

…বাঙ্‌লা ভাষার এমন মর্মস্পর্শী ও সাবলীল ব্যবহার খুব কম চোখে পড়ে।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৬ আষাঢ়, ১৩৮০

জৈন শাস্ত্র ও জীবন যাত্রা নিয়ে লেখা কোন গল্পের বই কখনও পড়িনি। …আমি শুধু আপনার মত সাধারণ পাঠকের কথাই বলতে পারি এবং তাই বলছিও। ষোলটী গল্প আছে এখানে, প্রথমটির নামে গ্রন্থের নাম অতিমুক্ত। গল্পগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রত্যেকটি যেন এক একটি রসনির্ঝর মুক্তা। এমন পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত ও লাবণ্যময় এর বর্ণনা যে পড়তে পড়তে মন চলে যায় এত অতীন্দ্রিয় লোকে। তাই কোন প্রশ্ন জাগে না ; জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় না, এভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব কিনা। অন্তরে কে বলে দেয়— যাঁরা এই অতিমুক্তদের দেখেছিলেন, তাঁরাই সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

সব ক'টি গল্পই ভালো কিংবা অসাধারণ বললেও কিছুই বলা হয় না। তাদের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। নিশ্চয় আমার চেয়ে যোগ্যতর বহুলোক এগিয়ে আসবেন জৈন সাহিত্য ভাণ্ডারের এই প্রথমতম উপচারকে অভ্যর্থনা করতে। আমার সব চেয়ে প্রিয় চিত্রটী হোল যেখানে অতিমুক্ত কাঠের ভিক্ষাপাত্র নালার জলে ভাসিয়ে চম্পার কথা ভেবেছিল। চম্পাকে লেখক বলেন নি। এমন কবিত্বময় স্বপ্নাঢ্য দৃশ্য জ্ঞানতঃ আমি কম দেখেছি। ভাষা বহু জায়গায় অবনীন্দ্রনাথকে স্মরণ করায়। গল্পগুলি পড়ে ধন্য হয়েছি। আজকের এই বিমর্ষ পৃথিবীতে লেখক তাঁর বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে আরও রত্ন দান করে বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন এই আমার গৃহকোণ থেকে বিনীত প্রার্থনা।

—দুর্গা দত্ত, দর্শক, ১৩ বর্ষ ২০ সংখ্যা

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি ২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩ ২৬৫৫
অথবা
জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

Sraman : Vol. I. No. 4 : July 1973 : D. N. 31/1973

জৈন ভবন কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা

জৈন আগমে বর্ণিত শ্রমণ জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কিত গাথার মর্মস্পর্শী, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল অনুবাদ। অলঙ্কার উপমাদি ছাড়াও বিষয়ের উপস্থাপন, বাস্তবানুগ বর্ণন ও কথোপকথনের রীতির প্রয়োগ এই রচনায় এমন এক অভিনবত্ব এনে দিয়েছে যা সহজেই মনকে অভিভূত করে।

দাম : তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

আশ্বিন ১৩৮০

প্রথম বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৮০ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

গর্ভাপহরণ, কাঁকালীটীলা, মথুরা

বৰ্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন-চরিত]

সেকালে সে সময়ে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর বলে এক জনপদ ছিল। সেই জনপদের নায়কের নাম ছিল সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় জ্ঞাত-ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে বিশেষ করে এই জ্ঞাত-ক্ষত্রিয়দেরই বাস। সেজন্য নিজের অধিকারে সিদ্ধার্থ ছিলেন সর্বাধিকারী। তাঁর এই সর্বাধিকারত্বের জন্য সকলে তাঁকে রাজা বলে ডাকে।

সিদ্ধার্থের রাণীর নাম ছিল ত্রিশলা। ত্রিশলা ছিলেন বৈশালীর রাজাধিরাজ শ্রীমন্ মহারাজ চেটকের বোন, বাশিষ্ঠগোত্রীয়া ক্ষত্রিয়ানী।

তখন বৈশালী ছিল বিদেহের রাজধানী। মর্ত্যের অমরাবতী। হৈহয় বংশীয় জৈন রাজাদের শাসনে তার সমৃদ্ধির শেষ ছিলনা।

আর সিদ্ধার্থ? তিনিও ছিলেন শ্রীপার্শ্বনাথ শ্রমণ পরম্পরার একজন শ্রমণোপাসক জৈন।

এই ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের পূবদিকে ছিল ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুর। ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরের নায়ক ছিলেন কোডালগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত। ঋষভদত্তের স্ত্রীর নাম ছিল দেবানন্দা।

দেবানন্দা ছিলেন জালন্ধরগোত্রীয়া ব্রাহ্মণী।

এঁরাও ছিলেন শ্রীপার্শ্বনাথ শাসনানুযায়ী শ্রমণোপাসক।

•

সেদিন আষাঢ় শুক্লা ষষ্ঠী। মধ্যরাতে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছেন দেবানন্দা। দেখছেন: হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজ, সরোবর, সমুদ্র, দেব-বিমান, রত্ন ও নির্ধূম অগ্নি। একটার পর একটা। স্বপ্ন নয়, যেন প্রত্যক্ষ দেখছেন।

স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন দেবানন্দা। ঘরের ভিতর তখন অন্ধকার। বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত বনবীথি। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু এতক্ষণ কি দেখলেন তিনি? দেখলেন একটা দিব্য আলো যেন প্রবেশ করল তাঁর কুক্ষীতে। সে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল সব কিছু—সে আলো এমনি উজ্জ্বল। ঠিক যেন মধ্যাহ্ন সূর্য অথচ দাহহীন।

স্বামীকে তুলে সব কথা খুলে বললেন দেবানন্দা। বললেন, ধারাপাতে নীপের বনে যেমন শিহরণ জাগে, সেই শিহরণ সর্বাঙ্গে। সেই এক আনন্দের পরিপ্লাবন।

শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন ঋষভদত্ত। তারপর দেবানন্দার আনন্দিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন, দেবানন্দা তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, সে স্বপ্ন ভাগ্যবতী রমণীরাই দেখে থাকে। এতে আমাদের বেদ-বেদাঙ্গ-পারঙ্গত পুত্র হবে বলেই আমার মনে হয়। শুধু তাই নয়, আজ হতে আমাদের সর্ববিধ উন্নতি।

অঞ্জলিবদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে দেবানন্দা মনে মনে প্রণাম করলেন ভগবান পার্শ্বকে। তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, দেবানুপ্রিয়, তোমার কথাই যেন সত্য হয়।

দেবানন্দার স্বপ্ন দেখবার পর ছয় পক্ষকালও অতীত হয়নি।

রাত তখন নিশুতি। শুয়ে শুয়ে আবার স্বপ্ন দেখছেন দেবানন্দা। এবারে হস্তী, বৃষ নয়। দেখছেন, যে আলো তাঁর কুক্ষীতে প্রবেশ করেছিল, সেই আলো বেরিয়ে এসে ঘূর্ণী হাওয়ার মতো পাক খেতে লাগল। তারপর তীরের বেগে ছুটে গেল ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর জনপদের দিকে। দেবানন্দা আরো দেখলেন. সে আলো ঘুরতে ঘুরতে ছেয়ে ফেলল ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলাকে।

ত্রিশলা চুরি করে নিয়ে গেল আমার স্বপ্ন বলে স্বপ্নের মধ্যেই চিৎকার দিয়ে উঠলেন দেবানন্দা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে গেল ঋষভদত্তেরও। কি হল---বলে সাড়া দিয়ে তিনি উঠে বসলেন।

কি বিশ্রী স্বপ্ন বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবানন্দা।

প্রদীপের আলোয় দেবানন্দার মুখখানা তুলে ধরলেন ঋষভদত্ত। দেখলেন দেবানন্দার মুখে সেদিন হতে যে দিব্যকান্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেই

কান্তি আজ সহসাই যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। এ দেবানন্দা সেই দেবানন্দা নয়, পূর্বের দেবানন্দা।

ঋষভদত্তের বুক থেকে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠে এসেছিল। কিন্তু দেবানন্দার মুখের দিকে চেয়ে সেই দীর্ঘনিঃশ্বাস তিনি নিজের মধ্যেই চেপে গেলেন। তারপর নিজের হাতে কাপড়ের খুঁট দিয়ে দেবানন্দার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, দেবানন্দা, এমন আমাদের কি ভাগ্য যে সর্বজ্ঞ আমাদের ঘরে আসবেন। তবু তিনি যে আসছেন আমাদের সময়ে আমাদের এই পৃথিবীতে সেজন্য আনন্দ কর। তিনি যে অমৃত দেবেন জনে জনে সে অমৃত হতে আমরাও বঞ্চিত হব না।

তারপর অনেককাল পরের কথা। জ্ঞাতপুত্র সেদিন এসেছেন ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরে। সর্বজ্ঞ হবার পর সেই তাঁর প্রথম সেখানে আসা। তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য দলে দলে মানুষ এসেছে। কিন্তু বর্দ্ধমানকে দেখা মাত্র দেবানন্দার বুকের কাপড় স্তনদুগ্ধে ভিজে উঠেছে। চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু উদ্গত হয়ে কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে। দেবানন্দার সেই স্থিতি, সেই ভাবান্তর চোখে পড়েছে আর্য ইন্দ্রভূতি গৌতমের। সে নিয়ে তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, ভদন্ত, আর্যা দেবানন্দার এই ভাবান্তরের কারণ কি?

সেই প্রশ্ন শুনে দেবানন্দার দিকে সুস্মিত দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন বর্দ্ধমান, দেবানন্দা আমার মা। দেবানন্দার গর্ভেই আমি প্রথম এসেছিলাম। তারপর -

তারপর সেই যেদিন প্রণত নামক স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে সে দেবানন্দার গর্ভে প্রথম প্রবেশ করল, যেদিন আকাশে মাটিতে সর্বত্র একটা আনন্দের কলরোল ছড়িয়ে পড়ল সেদিন সৌধর্ম দেবলোকেও ইন্দ্রের আসন একটুখানি নড়ে উঠল। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন পৃথিবীতে তীর্থংকরের অবতরণ হয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কোনো ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভে না হয়ে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভে। কিন্তু ক্ষত্রিয় গৃহের রাজশ্রী, সম্পদ ও বিপুল বৈভব ছাড়াত কখনো তীর্থংকরের জন্ম হয় না। তবে বর্দ্ধমানের বেলায় কেন তার ব্যতিক্রম হল?

সেকথা ভাবতে গিয়ে ইন্দ্রের চোখের সামনে বর্দ্ধমানের এক পূর্ব জন্মের ঘটনা ফুটে উঠল। সে জন্মে সে প্রথম চক্রবর্তী ভরতের পুত্র ও প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেবের পৌত্ররূপে ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিল। সে জন্মে তার নাম ছিল মরীচি।

মরীচি তখন শ্রমণ ধর্ম পালনে অসমর্থ হয়ে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেসব দিনের একটী দিন। ভরত একদিন তাকে এসে প্রণাম করলেন। বললেন, মরীচি, আমি তোমার এই পরিব্রাজকত্বকে প্রণাম করছি না, প্রণাম করছি অন্তিম তীর্থংকরকে। কারণ, ভগবান এই মাত্র তোমার সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তুমি এই ভরত ক্ষেত্রে ত্রিপৃষ্ঠ নামে প্রথম বাসুদেব, মহাবিদেহে প্রিয়মিত্র নামে চক্রবর্তী ও পরিশেষে এই ভারতবর্ষে বর্দ্ধমান মহাবীর নামে এই অবসর্পিণীর শেষ তীর্থংকর হবে।

সেকথা শুনে মরীচি আনন্দে নৃত্য করে উঠল। বলল, আমি বাসুদেব হব। চক্রবর্তী হব। তীর্থংকর হব। আর আমার কী চাই! বাসুদেবে আমি প্রথম, চক্রবর্তীতে আমার পিতা, তীর্থংকরে আমার পিতামহ। উত্তম আমার কুল।

মরীচির সেই কুলগর্বের জন্যই বর্দ্ধমান আজ হীনকুলে জন্ম গ্রহণ করতে চলেছে।

কিন্তু তাই বা কেন? যখন তীর্থংকর ক্ষত্রিয়কুল ছাড়া অন্যকুলে জন্মগ্রহণ করেনি তখন বর্দ্ধমানও করবেনা।

ইন্দ্র তখন ডাক দিলেন তাঁর অনুচর হরিণৈগমেষীকে। বললেন, তীর্থংকরের গর্ভ দেবানন্দার কুক্ষী হতে অপসারিত করে ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে রেখে এসো ও ত্রিশলার গর্ভ দেবানন্দার কুক্ষীতে।

হরিণৈগমেষী ইন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করে দেবানন্দার গর্ভ ত্রিশলার কুক্ষীতে রেখে এলো ও ত্রিশলার গর্ভ দেবানন্দার কুক্ষীতে।

তাই যখন দেবানন্দা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন, তখন স্বপ্ন দেখছিলেন রাণী ত্রিশলাও। সেই স্বপ্ন যা দেবানন্দা প্রথম দেখেছিলন। হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজ, কলস, সরোবর, সমুদ্র, দেববিমান, রত্ন ও নির্ধূম অগ্নি।

আশ্বিনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর রাত, তারাগুলো জল জল করছে নিকষ কালো অন্ধকারে। বাতাসে পাতার মর্মর। এছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখে সহসাই ঘুম ভেঙে গেল ত্রিশলারও। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! তারপর তিনি যেমন ছিলেন তেমনি চলে এলেন রাজা সিদ্ধার্থের কাছে।

শুনছ, ওগো, শোন—

ত্রিশলার ডাকে সাড়া দিয়ে শয্যার ওপর উঠে বসলেন সিদ্ধার্থ। চোখে তখনো তাঁর ঘুমের জড়তা। বললেন, কি হয়েছে ত্রিশলা? এমন অসময়ে, এভাবে?

প্রথমেই তাঁকে আশ্বস্ত করে নিয়ে পাশে বসে একটী একটী করে স্বপ্নের কথা খুলে বললেন ত্রিশলা। বললেন, কি আশ্চর্য স্বপ্ন! এমন স্বপ্ন কেউ কী কখনো দেখেছে?

নিশ্চয়ই দেখেছে। তীর্থংকর ও চক্রবর্তীর মা'রাই দেখে থাকেন। ঋষভদেবের মা দেখেছেন, ভরতের মা। কিন্তু সিদ্ধার্থের অতশত জানা নেই। তবু তাঁর মনে হ'ল স্বপ্নগুলো শুভ। শুভ, তা নইলে কী কেউ কখনো দেববিমান দেখে না রত্ন, না ধূমহীন অগ্নিশিক্ষা! তাই ত্রিশলার উদ্ভাসিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন সিদ্ধার্থ, আমার কি মনে হয় জানো ত্রিশলা, এই স্বপ্ন দর্শনের ফল আমাদের অর্থ লাভ, ভোগ লাভ, পুত্র লাভ, সুখ লাভ, রাজ্য লাভ। তোমার গর্ভে কুলদীপ পুত্র এসেছে।

সেকথা শুনে লজ্জায় ঈষৎ আনত করলেন ত্রিশলা মুখখানা।

তবুও, বললেন সিদ্ধার্থ, কাল সকালে নৈমিত্তিকদের ডেকে পাঠাব। তাদের মুখেই শোনা যাবে বিশদ ভাবে স্বপ্ন ফল। কি বল?

আমিও তাই বলি—বললেন ত্রিশলা।

ত্রিশলা কিন্তু তখন তখনি উঠে গেলেন না। সেইখানে বসে রইলেন সোনার দাঁড়ে যেখানে সুগন্ধি বর্তিকা জলছিল তার দিকে চেয়ে। ঘরে তারই মৃদু গন্ধ।

এমনি ভাবে কতক্ষণ কেটে যেত কে জানে। কিন্তু সহসা সিদ্ধার্থ ত্রিশলার পিঠে হাত রেখে বললেন, ত্রিশলা, তুমি না হয় আজ এখানেই শোও, রাত আর বেশী নেই। তোমার ঘরে নাই বা ফিরে গেলে।

সিদ্ধার্থ ভাবছিলেন, ত্রিশলা হয়ত স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছেন, তাই নিজের ঘরে ফিরে যেতে চান না।

না, তা নয় বলে একটুখানি সরে বসলেন ত্রিশলা। বললেন, একটা অপূর্ব অনুভূতির মতো মনে হচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে আমি যেন মধ্যাহ্ন সূর্যকে গর্ভে ধরেছি। আমার সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে তারি জ্যোতি চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মধ্যাহ্ন সূর্যের অথচ দাহ নেই। চাঁদের মতো শীতল, যেন চন্দন রসে ভেজানো।

সিদ্ধার্থ কিছু বুঝতে পারলেন না। তাই বিস্মিতের মতো ত্রিশলার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, আশ্চর্য!

ত্রিশলা তারপর নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। কিন্তু সে রাত্রে তিনি আর ঘুমুলেন না। স্বপ্ন রক্ষার জন্য জাগরিকা দিয়ে উষার আলোর প্রতীক্ষা করে সমস্ত রাত পালঙ্কে বসে কাটিয়ে দিলেন।

তারপর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পূবের আকাশ যখন ফরসা হয়ে এলো ত্রিশলা তখন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আস্থান-মণ্ডপে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে গেলেন।

[ক্রমশঃ

জৈনেতর ন্যায়শাস্ত্রের সংরক্ষণে জৈনাচার্যগণ

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

ভারতবর্ষে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার প্রসার তিন ধারায় হইয়াছিল। এই ধারাত্রয়ের মূল এক অথবা বহু ইহা বিবাদাস্পদ বিষয়। এই গভীর বিষয়ে প্রবেশের চেষ্টা বর্তমান নিবন্ধের ক্ষেত্র বহির্ভূত। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্য, বৌদ্ধ এবং জৈন এই তিন বিশিষ্ট ন্যায় সম্প্রদায়ের ঘাত প্রতিঘাত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইহাদের পারস্পরিক আনুকূল্য এবং প্রতিকূল্যের দ্বারা সামাজিক দৃষ্টিতে ভারতীয় যুক্তিবাদের যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল আমরা এখানে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বৈদিক আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে আধার স্বীকার করিয়া বৌদ্ধ যুক্তিবাদ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল এই কথা মহর্ষি গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের সহিত উপলব্ধ প্রাচীন বৌদ্ধবাদগ্রন্থগুলির তুলনা হইতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। প্রমাণ, হেত্বাভাস এবং নিগ্রহ স্থানাদি পদার্থের চর্চায় প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যেরা অক্ষরশঃ গৌতমের অনুসরণ করিয়াছেন। উভয়পক্ষের তাত্ত্বিক দৃষ্টির বিভিন্নতা বশতঃ সিদ্ধান্তগুলিতে ইতস্ততঃ ভেদ দৃষ্টি গোচর হইলেও ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থ বিবেচনার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মতৈক্য বিস্ময়াবহ। সম্ভবতঃ আচার্য বসুবন্ধুর কাল হইতে উভয়পক্ষের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। আচার্য দিগ্‌নাগ ন্যায় পদার্থ বিচার পরিত্যাগ পূর্বক বৈশেষিক পক্ষের অনুসরণ করেন। তৎকৃত প্রমাণসমুচ্চয়াদি গ্রন্থে প্রমাণ ও হেত্বাভাসের চর্চা পরীক্ষা করিলে বিষয়টী স্পষ্ট বোঝা যায়। দিগ্‌নাগ ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মত খণ্ডন করেন। বাৎস্যায়নের মত সমর্থন করিতে গিয়া ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোৎকর দিগ্‌নাগের মতে বহুস্থলে অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার দিগ্‌নাগের প্রশিষ্য ধর্মকীর্তি উদ্দ্যোতকরের সমালোচনা করিয়া বৌদ্ধপক্ষ স্থাপন করেন এবং ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকায় বাচস্পতি মিশ্র ধর্মকীর্তির সমালোচনার

উত্তর দিয়া ন্যায়মতের সৌষ্ঠব সম্পাদন করেন। এইরূপে বাচস্পতিও বৌদ্ধাচার্য প্রজ্ঞাকর ও জ্ঞানশ্রীমিত্রের কঠোর সমালোচনায় সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পরবর্তী ন্যায়াচার্য উদয়ন জ্ঞানশ্রীমিত্র প্রভৃতির মত বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া বাচস্পতি প্রস্থানের বিশুদ্ধি বিধান করেন। অতঃপর রাজনৈতিক কারণে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধবিদ্যা কেন্দ্রগুলি নষ্ট হওয়ায় হিন্দু নৈয়ায়িকদের শাস্ত্র বিবৃদ্ধির জন্য অন্যত্র প্রতিপক্ষ আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল, ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার সমর্থনের অভাব নাই।

ভারতীয় যুক্তিবাদের ইতিহাসে উপরি নির্দিষ্ট সারস্বত বিরোধের ফল বিশেষ শুভদায়ক হইয়াছিল। উভয়পক্ষই নিজ নিজ ত্রুটি বিচ্যুতির পরিমার্জন ও স্ব-স্ব শাস্ত্রের প্রগতির পথ প্রশস্ত করিবার সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ নৈয়ায়িকের সম্বন্ধ মল্ল এবং প্রতিমল্লের সম্বন্ধ। প্রয়োজন অনুসারে স্বপক্ষ রক্ষার আগ্রহে ইঁহারা অসঙ্কোচে আপাততুষ্ট ছল, জাতি এবং নিগ্রহ স্থানের প্রয়োগ করিয়াছেন। ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাধন যুক্তিশাস্ত্র স্থান বিশেষে তত্ত্ববিঘাতকও হইয়া পড়িয়াছে।

জৈন ন্যায়ের স্থান বৈদিক ও বৌদ্ধ ন্যায় হইতে স্বতন্ত্র। উভয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ প্রায় সমান ছিল। এই ধারা নিজ উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয় বিবদমান ধারার সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। ইতস্ততঃ গ্রহণ বর্জন অবশ্যই হইয়াছে। তবে জৈন অনেকান্ত ভাবনা সর্বত্র তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উপরই মহত্ব দিয়াছে। বধ্যঘাতক বিরোধের পরিবর্তে তাত্ত্বিক সহাবস্থান সর্বক্ষেত্রেই জৈনাচার্যদের অভিষ্ট ছিল।

জৈনদৃষ্টির এই উদারতা কোন মতবাদের নাশক অথবা প্রচ্ছাদক হয় নাই, বরং ইহার সাহায্যে অজৈন মতবাদেরও যথাযোগ্য অভ্যুদয় হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঞ্চয় এবং সংরক্ষণ জৈন সংস্কৃতির এক বিশেষ গুণ। যুক্তিবাদের ক্ষেত্রেও ইহার অনেক উদাহরণ মিলিবে। অনেক বৈদিক এবং বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ নিজ নিজ সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জৈন সম্প্রদায়ে উহার আদর অক্ষুণ্ণ ছিল। জৈনরা অপক্ষপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলির অনুশীলন করিয়াছেন, নিজ নিজ গ্রন্থে পর গ্রন্থের

সন্দর্ভ উদ্ধার করিয়াছেন, টীকা গ্রন্থ রচনা করিয়া তীর্থিকগ্রন্থের স্থায়িত্ববিধান করিয়াছেন এবং সর্বোপরি, অসংখ্য জৈন গ্রন্থ ভাণ্ডারে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে অমূল্য ন্যায় গ্রন্থ সমূহের সংগ্রহ এবং রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের তপোলব্ধ অবদানমাত্রই মহান এবং সকলের সামান্য সম্পত্তি, উহা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের যোগ্য এই জৈনী ভাবনা বিভিন্ন একান্ত দর্শনকে এক নয় চক্রের বিভিন্ন 'অর' রূপে সুবিন্যস্ত করিয়াছে।

শুভানুধ্যায়ী মিত্রদের অনুগ্রহে আমরা কয়েকখানি অতিদুর্লভ ন্যায় গ্রন্থের ছায়ালিপি পর্যালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রধানতঃ উহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এখানে বিষয়টীর স্পষ্টীকরণের চেষ্টা করিব।

মহর্ষি কণাদকৃত বৈশেষিক সূত্রের পরবর্তী তথা প্রশস্তপাদের পদার্থ ধর্ম সংগ্রহের পূর্ববর্তী বৈশেষিক গ্রন্থ সমূহের প্রাপ্তিত দূরের কথা, উহাদের নামও আধুনিক বৈশেষিক সম্প্রদায়ে অপরিচিত। এই অবস্থায় দ্বাদশারনয়চক্রের ন্যায়াগমানুসারিণী টীকায় সিংহসূরী বৈশেষিকবাক্য নামক বার্তিক গ্রন্থ, বৈশেষিক কটন্দী নাম্নী টীকা তথা প্রশস্তমতি কৃত ভাষ্যটীকার সামান্য পরিচয় দিয়া এবং ইতস্ততঃ সেই গ্রন্থের সন্দর্ভ উদ্ধার করিয়া এক অন্ধকার ক্ষেত্রে প্রভূত আলোকপাত করিয়াছেন। বৈশেষিক সূত্রপাঠও কালক্রমে নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা বিশেষজ্ঞেরা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। জৈন দার্শনিক গ্রন্থ তথা জৈন ভাণ্ডারস্থ অন্যান্য গ্রন্থ এই সূত্র গ্রন্থের পাঠ নির্ণয়েও প্রচুর সাহায্য করে। নব্য বৈশেষিক প্রস্থানে জৈনাচার্যদের অবদান সম্পর্কে বিশিষ্ট আলোচনা বন্ধুবর ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র জৈতলী মহাশয় ইংরাজী ভাষায় করিয়াছেন।

বৈদিক ন্যায় পরম্পরায় মহর্ষি গৌতমের সূত্রের উপর বাৎস্যায়নের ভাষ্য, উদ্দ্যোতকর কৃত ন্যায়বার্তিক, বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ন্যায়বার্তিক, ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা তথা উদয়নাচার্য নির্মিত তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি সম্মিলিতরূপে ন্যায় চতুর্গ্রন্থিকা নামে মিথিলা এবং বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। জৈন পরম্পরায় সূত্র সহিত ন্যায় চতুর্গ্রন্থিকা পঞ্চপ্রস্থানন্যায়তর্ক নামে পরিচিত। অতি সমাদরে জৈনাচার্যেরা পঞ্চপ্রস্থান অধ্যয়ন করিতেন। ইহার প্রামাণিক এবং প্রাচীন মাতৃকা জৈন ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। জৈনাচার্য

অভয়তিলক পঞ্চপ্রস্থানের উপর ন্যায়ালঙ্কার অথবা পঞ্চপ্রস্থানন্যায়টীকা নামে প্রসিদ্ধ অতিবিস্তৃত এবং মার্মিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি নিপুণভাবে পাঠ বিচার করিয়া ন্যায় সিদ্ধান্তের যথাযথ প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য অভয়তিলক খরতর গচ্ছের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য জিনেশ্বর সূরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রকৃত দ্ব্যাশ্রয় কাব্যের বাক্যবৃত্তি মহাবীররাস, বাদস্থল, যুগাদিদেবস্তোত্র, শুম্ভনস্তোত্র তথা আদিনাথ স্তব শীর্ষক অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকণ্ঠাচার্যকৃত ন্যায়টিপ্পণকের অনুসরণে অভয়তিলক অলঙ্কার রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই ন্যায়টিপ্পণকের একমাত্র মাতৃকা জয়সলমীরের জৈন ভাণ্ডারে সুরক্ষিত আছে। অনিরুদ্ধাচার্যের ন্যায় বিবরণ পঞ্জিকা অতিপ্রাচীন এবং প্রামাণ্যগ্রন্থ। আচার্য উদয়ন অনিরুদ্ধের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থের মাতৃকাও জৈন ভাণ্ডারে পাওয়া গিয়াছে।

ভাসর্বজ্ঞকৃত ন্যায়সারের স্বোপজ্ঞ ব্যাখ্যার নাম ন্যায়ভূষণ। ইহা দীর্ঘকাল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। দুঃখের বিষয় উহা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। স্যাদবাদ রত্নাকরাদি গ্রন্থে উপলব্ধ ন্যায়ভূষণের সন্দর্ভগুলি ভূষণমতের বৈশিষ্টের প্রতিপাদক।

আচার্য হরিভদ্রের ষড়দর্শন সমুচ্চয় তথা বাদদ্বাত্রিংশশতিকাগুলিতে ন্যায়, বৈশেষিক তথা বৌদ্ধ দার্শনিক মতের মার্মিক প্রতিপাদন দেখা যায়। ষডদর্শন সমুচ্চয়ের টীকায় গুণরত্নসূরী অনেক লুপ্ত ন্যায় গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছেন। এই গ্রন্থে অধ্যয়ন নামক অল্প পরিচিত ন্যায় ভাষ্যটীকাকারের সন্দর্ভ বিশেষও উদ্ধৃত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ববিবেক উদয়নাচার্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এককালে ইহার মহত্ত্ব সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। ইহার উপরে অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থও লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বিষয়গত কাঠিন্য, পূর্বপক্ষের অপরিচয় তথা সম্প্রদায় প্রচ্যুতির জন্য ইহার পাঠ এবং অর্থনির্ণয় প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে আচার্য যশোবিজয়কৃত ন্যায় খণ্ডখাদ্য হইতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য মিলে। সম্ভবতঃ জৈনসম্প্রদায়ে আচার্য যশোবিজয়ই সর্বপ্রথম নব্যন্যায়ের শৈলীতে

জৈন সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে ন্যায়শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার এক নূতন সরণি খুলিয়া যাইবে।

বৌদ্ধ দার্শনিক মত তথা গ্রন্থসংরক্ষণের ক্ষেত্রেও জৈন আচার্যদের অনুরাগ সুবিদিত। দিগ্‌নাগকৃত বলিয়া পরিচিত ন্যায়প্রবেশের উপর হরিভদ্র তথা পার্শ্বদেব গণি ব্যাখ্যা তথা উপব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। মল্লবাদীর ন্যায়বিন্দু টীকা প্রসিদ্ধ। প্রভাচন্দ্র ন্যায়নবনিশ্চয় বিবরণে প্রজ্ঞাকরকৃত প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কারের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় ন্যায় পরম্পরায় জৈনাচার্যদের এই অবদান অতীব মহত্বপূর্ণ। অন্যত্র পরমত রক্ষণের জন্য এইরূপ একনিষ্ঠ চেষ্টা দেখা যায় না।

চণ্ডকৌশিক

দক্ষিণ বাচালা হতে উত্তর বাচালা পথে
চলেছেন জ্ঞাতপুত্র নির্গ্রন্থ শ্রমণ—
গোপগণ ডাকি কয়, "শুন শুন মহাশয়,
ওপথে রয়েছে সর্প ভীষণ দর্শন।
দংশনে অপেক্ষা নয়, চাহিতেই ভস্ম হয়,
তোমার মঙ্গল লাগি তাই মোরা বলি—
হলেও একটু ঘুর, কতবা হইবে দূর,
ওই পথে নিরাপদে যাও তুমি চলি।"

সে কথা শুনিয়া হাসি কহিলেন কাছে আসি
গোপগণে জ্ঞাতপুত্র, "কিছু নাহি ভয়,
অহিংসা সাধক আমি, অহিংসা সর্বত্রগামী,
অহিংসায় সব কিছু হয় আত্মময়।
প্রয়োজন আছে তাই, ওই পথে আমি যাই,
দৃষ্টিবিষ হোক সাপ ভয় নাহি করি।"
গোপগণে এই বলি জ্ঞাতপুত্র যান চলি
যে পথে রয়েছে সর্প সেই পথ ধরি।

কিছুদূর না যাইতে হেরিলেন চারিভিতে
সৃষ্টি করিয়াছে সর্প যে বিভীষিকার,
জনহীন শূন্য বাট, তৃণহীন শুষ্ক মাঠ,
জীবনের স্পর্শ নাই, রিক্ত চারিধার।
আকাশে ওড়ে না পাখী আনন্দ আবেশে ডাকি,
পরিব্যাপ্ত সর্বস্থানে কী যে মহাভয়

পত্রহীন বৃক্ষ যত চেয়ে আছে থতমত
আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ, কী জানি কী হয় ?

আশ্রম কনকখল ছায়াঘন সুশীতল
ছিল সেথা যেথা আজ সর্পের বিবর।
যেথায় পথের শেষ পড়ে আছে অবশেষ
আশ্রমের চালহীন ভাঙা ক'টি ঘর
দগ্ধপত্র ভস্মরাশি, জ্ঞাতপুত্র সেথা আসি
হইলেন ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত হৃদয়।
মনুষের গন্ধ পেয়ে সর্প দ্রুত এলো ধেয়ে
মানুষ এসেছে হেথা ভাবিতে বিস্ময়।

বিস্ময়ের সীমা নাই, এখনো হোল না ছাই,
আশ্চর্য চকিত সর্প ভাবে মনে মনে—
তার দৃষ্টি পথে পড়ি রয়েছে জীবন ধরি
এমন কখনো হতে দেখেনি জীবনে।
ছুটে গিয়ে পায়ে তাঁর দংশিল সে বারম্বার
সরে গেল দ্রুতগতি পাছে পড়ে গায় ;
তবুও দাঁড়ায়ে স্থির ধ্যানমগ্ন সুগম্ভীর
জ্ঞাতপুত্র, সর্প কিছু ভাবিয়া না পায়।

স্থির নয়নের তারা, রক্ত নয় দুগ্ধধারা
প্রবাহিত ক্ষত হতে, চাহি অনিমিখ
ভাবে সর্প মনে মনে, এমন সময় শোনে,
শান্ত হও, শান্ত হও, হে চণ্ডকৌশিক !
সে নাম পশিতে কানে চেতনা জাগিল প্রাণে,
অকস্মাৎ খুলে গেল বিস্মৃতির দ্বার,
তখন পড়িল মনে এ বিজন তপোবনে
পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল কভু তার।

এ আশ্রম কুলপতি ছিল সে সেদিন অতি
দুরাচার ক্রূরমতি কোপন স্বভাব ;
সহজে হইত ক্ষিপ্ত, পাপ কর্মে সদা লিপ্ত,
অন্তরে ছিল না এতটুকু দয়া ভাব।
এ আশ্রম তরুলতা কন্দমূল ফুল পাতা
ছিঁড়িতে দিত না কারে, হুঙ্কার ছাড়িত।
হেন সাধ্য ছিল কার, আশ্রমে প্রবেশে তার,
কুঠার লইয়া করে হইত ধাবিত।

সেইভাবে একবার স্খলিত চরণ তার,
গহ্বরে পড়িল গিয়ে, আপন কুঠার
দ্বিখণ্ডিত করে শির, অজস্র বহে রুধির,
রৌদ্রধ্যানে সেইখানে মৃত্যু হয় তার।
রৌদ্রধ্যানে মৃত্যু বলি, নরকে সে গেল চলি,
সেথা হতে জন্ম লভি সর্পযোনি লয়।
কর্মের আশ্চর্য গতি, আজো সেই ক্রূরমতি,
আজো সেই রৌদ্রধ্যান, আজো ক্ষতি ক্ষয়।

বিবেক জাগিল মনে, বিবেকের জাগরণে
অনুতাপে বহে তার নয়নাশ্রু নীর,
এখনো গেলনা বাধা, এখনো হল না সাধা,
প্রেমের সহজ সুর শুদ্ধ রাগিনীর ;
এখনো হয়নি জ্ঞান, এখনো সে রৌদ্রধ্যান,
জন্ম জন্ম কৃত পাপ কবে হবে শেষ,
শেষ করি সব ভ্রান্তি, কবে সে পাইবে শান্তি,
অথবা আকণ্ঠ পাপে ডুবিবে নিঃশেষ !

সর্প ভাবে মনে মনে, অগ্নি বর্ষে যে নয়নে,
সেই পাপ দৃষ্টি নিয়ে কাজ কিবা তার ;
খুলিবে না সে নয়ন, করিবে সে অনশন,
জীবঘাত এ জীবনে করিবে না আর।
সঙ্কল্প হইতে স্থির চরণে নোয়ায়ে শির
জ্ঞাতপুত্রে প্রণমিয়া প্রবেশে বিবরে।
ধর্মধ্যানে কর্ম দলি, সর্প যায় স্বর্গে চলি,
জ্ঞাতপুত্র যান চলে বনপথ ধরে।

জৈন মন্দির ও গুহা

জৈন মন্দির ও গুহা ভারতের প্রায় সবখানে দেখা যায়। নির্মাণ কাল খৃঃ পূঃ ৩য়-৪র্থ শতক হতে বর্তমান কাল। তাই সমস্ত জৈন মন্দির ও গুহাদির বিবরণ এই ছোট্ট প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যেগুলি বিশেষ মূল্যবান তার সামান্য পরিচয় এখানে আমরা উপস্থিত করছি।

দক্ষিণ ভারত : সব চাইতে পুরুনো জৈন মন্দির দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের বাদামীর নিকটস্থ এহোলে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সময় ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটী নির্মিত হয়। শৈলী দ্রাবিড়ী এই ধরণের দ্বিতীয় মন্দির দেখা যায় পট্টদকলের ১ মাইল পশ্চিমে। নির্মাণকাল ৭ম-৮ম শতাব্দী। মন্দির ধ্বস্ত অবস্থায় বিদ্যমান।

দ্রাবিড়ী শৈলীর ধ্বস্ত মন্দির দক্ষিণ ভারতের অনেকখানেই দেখা যায়। তীর্থহল্লির নিকটস্থ হুংবচে বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে মনে হয় যে এককালে এখানে বিরাট জৈন বসতি ছিল। আদিনাথ মন্দির এখনো দর্শনীয়। আদিনাথ মন্দিরের নিকটেই বাহুবলীর মন্দির। মন্দিরটী ভগ্ন। হুংবচ গ্রামের উত্তরে পঞ্চকূটবস্তী। মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত অলংকৃত বিশাল স্তম্ভটী দেখবার মতো। এই মন্দিরের সামনেই চন্দ্রনাথ মন্দির যা পরবর্তীকালের।

তীর্থহল্লি হতে অগুম্বে যাবার পথে গুডফ্ নামক তিন হাজার ফুট উঁচু একটী পাহাড়ে অনেক জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। জলকুবেরের নিকটস্থ পার্শ্বনাথ মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সামনে বিরাট মানস্তম্ভ। ভেতরের থামগুলি চিত্রময়। গর্ভগৃহে খড়্গাসনে পার্শ্বনাথ প্রতিমা অবস্থিত।

ধারবাড় জেলার লোক্কিগুণ্ডিতে দুটো সুন্দর জৈন মন্দির আছে যার একটীতে ১১৭২ খৃষ্টাব্দের শিলালেখ পাওয়া গেছে। মন্দিরটী কালো পাথরের। শিখর স্তূপিকার আকারে রচিত। ভেতরের দেয়াল চিত্রময়।

জিননাথ বসতি, শ্রবণ বেলগোল, মহীশূর
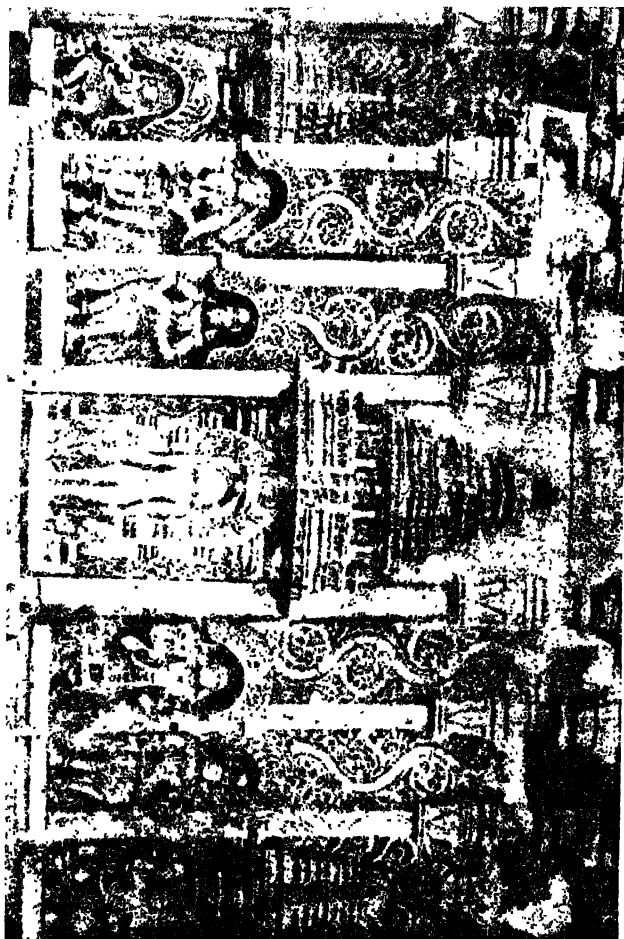
মন্দিরের বহির্ভাগ, খাজুরাহো, মধ্যপ্রদেশ

দেয়ালের গায়ে খোপ খোপ। সেখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট জিনমূর্তি। খোপের মাথায় মাথায় কীর্তিমুখ।

জিননাথপুর শ্রবণ বেলগোল হতে ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। শ্রবণ বেলগোলের ৫৭ ফুট দীর্ঘ একই পাথরে খোদিত বাহুবলীর প্রতিমা বিশ্ববিখ্যাত। জিননাথপুরের শান্তিনাথ মন্দিরও (১২০০ খৃষ্টাব্দ) নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের নবরঙ্গের গায়ে সূক্ষ্ম চিত্রকার্য। ছাদের খোদাই খুবই মনোরম। ভিত্তিগাত্রে রেখাচিত্রে লতাপাতার সমারোহ। গর্ভগৃহের দ্বারপাল মূর্তি দুটীও দেখবার মতো।

হালেবীডের হল্লিগ্রামে তিনটী জৈন মন্দির আছে। হল্লির পার্শ্বনাথের মন্দির দর্শনীয়। ছাদের চিত্রকারী এত সুন্দর যে হালেবীডের অন্যত্র এরূপ দেখা যায়না। মণ্ডপের ছাত ১২টী কালো পাথরের থামের ওপর ন্যস্ত। থামের রচনা ও মসৃণতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্য দুটী মন্দির আদিনাথ ও শান্তিনাথের। মন্দিরের নির্মাণকাল প্রথম শতক। গণীগিত্তি, তিরুমলনাড্, তিরুপরুত্তি কুণ্ডরম্, তিরুপ্পনমূর, মুড়বিদ্রী প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের রচনাকাল খৃষ্টীয় ১৪ শতক। এর মধ্যে মুডবিদ্রীর চন্দ্রনাথ মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বভারত : পূর্বভারতে প্রাচীনতম জৈন মন্দির ও বিহারের উল্লেখ-পাওয়া যায় পাহাড়পুরে (রাজসাহী) পাওয়া তাম্রানুশাসন (৪৭২ খৃষ্টাব্দ) হতে। মনে হয় এখানে এককালে মথুরার অনুরূপ জৈন মন্দির ও বিহার ছিল। বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে প্রচুর জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। জৈনদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র সম্মেত শিখর বা পরেশনাথ পাহাড়কে কেন্দ্র করে এখানে এককালে বহু জৈন মন্দিরাদি নির্মিত হয়েছিল।

বিহারে রাজগৃহ, পাবাপুরী আদি কয়েকটী জায়গায় জৈন মন্দির আছে। পাবাপুরীর জলমন্দির ভগবান মহাবীরের নির্বাণ ভূমিরূপে বহু সংখ্যক তীর্থ যাত্রীকে আকর্ষণ করে।

মধ্যভারত : মধ্যভারতে ঝাঁসী জেলার অন্তর্গত দেবগডে অনেক জৈন মন্দির রয়েছে। দেবগড় বেতয়া নদীতীরে অবস্থিত। মন্দিরগুলি প্রাকারের

মধ্যে পাহাড়ের মাথায় নির্মিত। কিছু হিন্দু মন্দিরও আছে তবে জৈন মন্দিরই সংখ্যায় বেশী। এখানে যে সব শিলালেখ পাওয়া গেছে তা হতে বলা যায় যে খৃষ্টীয় ৮ম শতক হতে ১২ শতক অবধি এখানে মন্দিরাদি নির্মিত হয়েছে। এখানকার সব চাইতে বড় মন্দির (১২নং) ভগবান শান্তিনাথের। মন্দিরের অভ্যন্তরে ১২ ফুট দীর্ঘ ভগবানের খড়্গাসনস্থিত প্রতিমা। এই মন্দিরটীই এখানকার মুখ্য মন্দির। কারণ অন্য মন্দিরগুলি এই মন্দিরের তুলনায় অনেক ছোট। মন্দিরের থাম ও দেয়ালের গায়ে সর্বত্র জিন প্রতিমাদি উৎকীর্ণ। তোরণদ্বারেও সুন্দর কলাকৃতি। কোন কোন মন্দিরের সামনে মানস্তম্ভ। ৫নং মন্দির সহস্রকূট চৈত্যালয় এখনো অভগ্ন। এই মন্দিরের শিখরেই ১০০৮টী জিন প্রতিমা উৎকীর্ণ।

মধ্যভারতের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য জৈন মন্দিরগুলি রয়েছে খাজুরাহে। এখানকার শৈব, বৈষ্ণব ও জৈন মন্দিরের সংখ্যা প্রায় ৩০এর ওপর। জৈন মন্দিরের মধ্যে পার্শ্বনাথ, আদিনাথ ও শান্তিনাথের মন্দির উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার পার্শ্বনাথের মন্দিরটীই সব চাইতে বড়। এই মন্দিরের মুখ্য মণ্ডপটী নষ্ট হলেও মহামঞ্চ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ বিনষ্ট হয়নি। গর্ভগৃহের গায়ে আর একটী দেবালয় দেখা যায় যা এখানকার বৈশিষ্ট্য। প্রদক্ষিণা পথের দেয়ালে আলোর জন্য জালিদার বাতায়ন। ছাতে সুন্দর অলঙ্করণ। প্রবেশদ্বারে দশভূজা সরস্বতীর মূর্তি। গর্ভগৃহের বাইরের দেয়ালে অপ্সরাদি সুন্দর মূর্তি খোদিত। সেই সঙ্গে খোদিত স্তনদানরতা, পত্রলেখনীধারিণী, পায়ের কাঁটা নিষ্কাশন ও প্রসাধনরতা বহু নায়িকার মূর্তিগুলি এতো সজীব ও সুন্দর যে সেরূপ অন্যত্র খুব কম দেখা যায়। মন্দিরের বাইরের নীচের অংশে সুন্দর অলঙ্করণ ও ওপরের দিকে তীর্থংকর ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত। এভাবে এই মন্দিরে নানা ধর্ম ও ধর্মীয় ও লৌকিক জীবনের অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়।

গোয়ালিয়র রাজ্যের বিদিশা হতে ১৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্যারসপুরে এক ভগ্ন জৈন মন্দিরের মণ্ডপ রয়েছে যার বিন্যাস ও স্তম্ভ রচনা খাজুরাহের অনুরূপ। নির্মাণকাল খৃষ্টীয় ১০ম শতকের পূর্ববর্তী সময়। এছাড়া এই অঞ্চলে আরো জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বুন্দেলখণ্ডের সুবর্ণগিরি বা সোণাগিরিতে ছোট বড় ১০০টী জৈন মন্দির রয়েছে। মন্দির নির্মাণ শৈলীতে মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট।

মুক্তগিরির অধিত্যকায় ২০ থেকে ২৫টী জৈন মন্দির রয়েছে। ৬০ ফুট উঁচু জলপ্রপাতের জন্য এখানকার বর্ষাকালীন দৃশ্য খুবই সুন্দর। মন্দির নির্মাণ শৈলীতে এখানেও মুসলমানী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৪ শতকের পুর্বেও যে এখানে জৈন মন্দিরাদি ছিল তা প্রতিমা লেখ হতে অনুমান করা চলে।

কুণ্ডলপুরের কুণ্ডলাকৃতি পাহাড়ের মাথায় ২৫ থেকে ৩০টী জৈন মন্দির রয়েছে। প্রাচীনতা, বিশালতা ও মান্যতার জন্য এখানকার সব ক'টি মন্দিরই প্রসিদ্ধ। তবে ছ'তল বিশিষ্ট ছ'ঘরিয়া মন্দিরটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ের নীচে সরোবরের ধারে নূতন জৈন মন্দিরও নির্মিত হয়েছে।

উন নামক জায়গায় ৩।৪টী জৈন মন্দির রয়েছে। থাম ও দেয়ালের অলঙ্করণ খাজুরাহের অনুরূপ।

পশ্চিম ভারত : রাজস্থানের ওসিয়া গ্রামের বাইরে অনেক প্রাচীন হিন্দু ও জৈন মন্দির রয়েছে। ওসিয়ার মহাবীর জৈন মন্দির বিশেষ বিখ্যাত। মন্দিরের মণ্ডপস্থ থামের কাজ অদ্ভুত সুন্দর। শিলালেখ হতে জানা যায় যে মন্দিরটী ৭৭০-৮০০ খৃষ্টাব্দেও বর্তমান ছিল।

ফালনার নিকটস্থ সাদড়ী গ্রামে ১২-১৩ শতকের অনেক হিন্দু ও জৈন মন্দির রয়েছে।

মারওয়াড় পল্লী স্টেশনের নিকটস্থ নৌলখা মন্দির দ্রষ্টব্য। মন্দিরটী অলহণদেব ১১৬১ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করান।

[আগামীবারে সমাপ্য

জৈন ধর্ম ও ভারতীয় ইতিহাস

ডাঃ এস. বি. দেও

[পূর্বানুবৃত্তি]

গুপ্তসাম্রাজ্য : কুশানকালের অবসান ও গুপ্তদের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী সময় সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না।

গুপ্তকালকে অনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয়ের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে গুপ্তবংশীয় রাজারা গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। বরং তাঁদের উদার ও পরমতসহিষ্ণুই বলতে হয় কারণ তাঁরা ভিন্ন ধর্ম বা মতকে কোনো সময়েই দমন করেন নি। তাঁদের এই পরমতসহিষ্ণুতা যেমন সাহিত্যে সমর্থিত তেমনি অনুশাসনের দ্বারাও। দৃষ্টান্তরূপে উদ্যোতন সূরী তাঁর কুবলয়মালা গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকে যে এক তোররায় ও তাঁর গুরু গুপ্তবংশীয় হরিগুপ্তের উল্লেখ করেছেন তার কথা বলা যায়। এই তোররায় হুনরাজ তোরমান বলেই মনে হয় যাঁর মৃত্যু খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম পাদে হয়েছিল। হরি গুপ্তকে Cunninghum তাম্রমুদ্রার হরি গুপ্ত বলে অভিহিত করেছেন। তাই একথা বলা যায় যে গুপ্তবংশীয় রাজারা অন্ততঃ জৈন ধর্ম বিরোধী ছিলেন না।

কুমার গুপ্ত ও স্কন্দ গুপ্তের সময়ের যে দুটা অনুশাসন পাওয়া গেছে তাতে আরো বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি জৈন ধর্মও অভিবৃদ্ধি লাভ করেছিল। ১০৬ গুপ্তাব্দের (৪২৬ খৃষ্টাব্দ) উদয়গিরির গুহালেখ কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৪-৫৫ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ হয়। এই গুহালেখ আর্যকুলের গোশর্মন শিষ্য সংঘল কর্তৃক পার্শ্ব মূর্তির অনুদানের উল্লেখ করে। দ্বিতীয় অনুশাসনটী মথুরার। এই অনুশাসনটী স্পষ্টতঃই 'পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমার গুপ্ত' বলে বিদ্যাধরা শাখার কোট্টিয়গণের আচার্যের অনুপ্রেরণায় সমধ্যা কর্তৃক জিন মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে। ১৪০ গুপ্তাব্দের

(৪৬০-৬১ খৃষ্টাব্দ) বিখ্যাত কাহোম স্তম্ভলেখ স্কন্দ গুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫-৬৭ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ হয়। এই স্তম্ভলেখে মদ্র কর্তৃক গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহশিলের অন্তর্গত ককুভ নামক জায়গায় পঞ্চ অধিকৃৎ বা জিন মূর্তি সম্বলিত স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করেছে।

এছাড়াও গুপ্তবংশীয় বিভিন্ন রাজাদের সময়ের এমন বহু অনুশাসন পাওয়া যায় যা তাঁদের পরমতসহিষ্ণুতার ওপর আলোকপাত করে। সে সময়ের সাধারণ মানুষও পরমতসহিষ্ণু ছিল। ১৫৯ গুপ্তাব্দের (৪৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দ) তাম্রানুশাসনের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই অনুশাসনটী বুধ গুপ্তের রাজত্বকালীন। এই অনুশাসনে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বটগোহালী গ্রামের আচার্য গুহনন্দী প্রতিষ্ঠিত জিন মূর্তির পূজার্চনা ও জৈন বিহারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণ দম্পতি কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। গুপ্ত বংশের পতনের একশ বছর পরেও যে উত্তর বাঙলার জৈন মন্দিরগুলিতে নির্গ্রন্থ শ্রমণেরা বাস করতেন সে কথা হিউ-এন্থ-সাং তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

তাই আমরা এ কথা বলতে পারি যে গুপ্ত যুগে জৈন ধর্মের সেই পূর্ব গৌরব না থাকলেও জৈনরা সফলভাবে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পাহাড়পুরের অনুশাসনে একথা আরো মনে হয় যে জৈন ধর্মে তখনো সেই প্রাণবত্তা বর্তমান ছিল যাতে তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের সহানুভূতি ও সহায়তা আকর্ষণে সমর্থ হত। তাই একথা বলা যায় যে রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা হারালেও জৈনধর্মের মূল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

গুপ্ত পরবর্তীকাল : গুপ্তদের পতন ও উত্তর ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য বিস্তারের মধ্যবর্তী ৫০ বা ১০০ বছরের ভারতীয়.ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না তাই সেই সময়ের জৈন ধর্মের অবস্থা সম্পর্কেও কিছু বলা শক্ত। হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তবে তিনিও যে জৈন ধর্মের বিরোধী ছিলেন সে কথা বলা যায় না কারণ তিনি জৈনদেরও অনুদান দিয়ে গেছেন।

গুপ্ত পরবর্তী যুগে জৈন ধর্ম রাজপুতানা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও

মধ্যভারতের গুর্জর প্রতিহার, গাড়বাল, বুন্দেলা ও কালাচুরিদের শাসনকালে বিশেষ অভিবৃদ্ধি লাভ করে। বিহার ও বাঙ্‌লা প্রদেশে পাল ও সেন রাজাদের শাসন সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ে জৈন ধর্মের অবনতি ঘটে এবং উড়িষ্যা যা এক সময় জৈন ধর্মের কেন্দ্র ছিল তা হিন্দু ধর্মের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এর তাৎপর্য এ নয় যে জৈন ধর্ম বিহার, বাঙ্‌লা ও উড়িষ্যা হতে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রতিহার রাজবংশ : ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুযায়ী হলেও কনৌজের প্রতিহারেরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের দমন করেন নি। আমরা প্রতিহারদের রাজত্বকালীন দুইটী শিলালেখ পাই যার একটী যুক্তপ্রদেশের ঝাঁসী জেলার ললিতপুরের অন্তর্গত দেবগড়ের জৈন মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ। এতে বলা হয়েছে ভোজদেবের রাজত্বকালে তাঁর অধীনস্থ মহাসামন্ত বিষ্ণুরামের প্রজা দেব নামক এক ব্যক্তির দ্বারা এই স্তম্ভটী সঃ ৭৮৪ অব্দে (৮৬২ খৃষ্টাব্দ) নির্মিত হয়। এখানে "বহু জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়"। বৎসরাজের রাজত্বকালীন ১০১৩ বিক্রমাব্দের আর একটী অনুশাসন ওসিয়ায় (যোধপুরের ৩২ মাইল উত্তরে অবস্থিত) পাওয়া গেছে যা জৈন মন্দিরের নির্মাণ বিষয়ক। এই সব শিলালেখ ও ব্যাপক জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হতে বলা যায় যে কনৌজের প্রতিহারদের রাজত্বকালে জৈন ধর্ম বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল।

চন্দেল রাজবংশ : চন্দেলদের রাজধানী ছিল জেজভুক্তি (বুন্দেল খণ্ড)। তাঁরা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হতে রাজত্ব করেন। তাঁদের সময়ে জৈন ধর্ম যে বিশেষ অভিবৃদ্ধি লাভ করেছিল তা সেই সময়ের শিলালেখ ও সুন্দর সুন্দর মন্দিরে প্রমাণিত হয়।

এই রাজবংশের বহু রাজা জিন মন্দির নির্মাণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। খাজুরাহো জৈন মন্দিরের একটী শিলালেখে বলা হয়েছে যে একজন জৈন শ্রাবক জিনালয়ের জন্য একটী বাটিকা অনুদান দিয়েছিলেন। এই শ্রাবককে ধঙ্গরাজ বিশেষ সম্মান করতেন।

মহেন্দ্র বর্মনের রাজত্বকালের পাঁচটী শিলালেখ পাই। যথা : (১) খাজুরাহো জৈন প্রতিমা লেখ (১১৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দ)—কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠী পাণিধরের উল্লেখ করে; (২) হর্নিম্যান জৈন প্রতিমা লেখ (১১৫০ খৃষ্টাব্দ)

—মন্দিলপুরের গ্রহপতি বংশের শ্রেষ্ঠী যৌল কতৃক জিন মূর্তির অনুদান বিষয়ক; (৩) মাহোবা জৈন প্রতিমা লেখ (১১৫৫ খৃষ্টাব্দ)—রূপকার লক্ষ্মণ কতৃক নেমিনাথ জিন মূর্তির অনুদান বিষয়ক; (৪) খাজুরাহো জৈন প্রতিমা লেখ (১১৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ)—সাধু সল্‌হে কর্তৃক সম্ভবনাথ মূর্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক; (৫) মাহোবা জৈন প্রতিমা লেখ (১১৬৩ খৃষ্টাব্দ)—জৈন প্রতিমার অনুদান বিষয়ক।

পরমার্দির রাজত্বকালের মাহোবা জৈন প্রতিমালেখ (১১৬৮ খৃষ্টাব্দ)—ভাঙা জিন মূর্তির গায়ে পাওয়া গেছে।

যে জায়গা হতে এই প্রতিমা লেখ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় চন্দেলদের সময় খাজুরাহো ও মাহোবা উল্লেখযোগ্য জৈন কেন্দ্র ছিল। ১৮৭৪-৭৭ খৃষ্টাব্দে Cunningham খাজুরাহে যে খনন কার্য চালান ও যার ফলে পদ্মাসন-স্থিত ও দাঁড়ানো যে বহু সংখ্যক জিন মূর্তি পাওয়া গেছে তার দ্বারা তা সমর্থিত হয়।

গাড়বাল রাজবংশ (আঃ ১০৭৫-১২০০ খৃষ্টাব্দ): বারাণসী ও কান্যকুব্জের এই রাজ বংশের যে সমস্ত অনুশাসন আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মূলক। তবু এ অঞ্চলে পাওয়া ভাঙা জিন মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে মনে হয় যে জৈন ধর্ম সাধারণে প্রচলিত ছিল এবং রাজারা জৈন ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

[ক্রমশঃ

জৈন পদ্ম পুরাণ

[কথাসার]

ডাঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

[পূর্বানুবৃত্তি]

রামচন্দ্র বজ্রকরণকে ডাকাইলেন। বজ্রকরণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র সিংহোদরকে ছাড়িয়া দিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া সিংহোদর বজ্রকরণের সহিত সন্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিলেন।

বজ্রকরণ নিজের আট কন্যা ও সিংহোদর তাঁহার তিনশত কন্যার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন—"আমি এখন বিবাহ করিতে পারি না। কোন স্থানে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইলে আমি বিবাহ করিব।"

তখন বজ্রকরণ ও সিংহোদর তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিকালেই দশাঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিলেন এবং নলকুবর নামক নগরের সমীপবর্ত্তী বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

॥ ৭ ॥

নলকুবর নগরে বালখিল্যের কন্যা কল্যাণমালা পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া রাজ্য পালন করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ একদিন কোনও সরোবরে জল আনিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেই সময় কল্যাণমালাও সেই স্থানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে সেই স্থানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

লক্ষ্মণ বলিলেন—"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার স্ত্রী বনের মধ্যে রহিয়াছেন। সুতরাং আমি এখানে থাকিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া

কল্যাণমালা লক্ষ্মণের সহিত যাইয়া তাঁহাদিগকে খুব আদর যত্ন করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন।

আহারান্তে কল্যাণমালা পুরুষের বেশ ত্যাগ করিয়া স্ত্রী বেশ ধারণ করিলেন এবং সকলকে নমস্কার করিলেন। পুরুষ বেশ ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় কল্যাণমালা বলিলেন—"এ রাজ্য সিংহোদরের অধীন। সিংহোদরের সহিত আমার পিতার এই মর্মে সন্ধি হইয়াছিল যে যদি আমার পিতার পুত্র জন্মে তাহা হইলে সে-ই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। আর তাহা না হইলে পিতার মৃত্যুর পর এ রাজ্য সিংহোদর গ্রহণ করিবে। সুতরাং আমার জন্ম হইলে আমার পিতা 'পুত্র হইয়াছে' এই রূপ রটাইয়া দিলেন। এই কারণেই আমি পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া থাকি। ম্লেচ্ছেরা আমার পিতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই জন্য এখন আমিই রাজকার্য পরিচালনা করিতেছি। পিতা বন্দী হওয়ায় মাতাও অতিশয় দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। এখন যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।

এইরূপ বলিতে বলিতে দুঃখের আবেগে কল্যাণমালা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সীতা তাহাকে বিছানায় শুয়াইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইলে রাম লক্ষ্মণ তাহাকে নানা কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন এবং বলিলেন—"তোমার পিতা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন। তোমার কোনোও চিন্তা নাই।" এই বলিয়া তাঁহারা তিন দিন সেখানে রহিলেন। তিন দিন পরে কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা পথে মেকলা নদী পার হইয়া বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বালখিল্যকে মুক্ত করিলেন এবং ম্লেচ্ছরাজ রৌদ্রভূতকে তাঁহার মন্ত্রী নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রৌদ্রভূত বালখিল্যের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার ক্ষমতা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া সিংহোদরও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাহার পর সেখান হইতে যাত্রা করিয়া যে দেশে তাপ্তী নদী প্রবাহিত

তাঁহারা সেই দেশে যাইয়া পঁহুছিলেন। সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কোনও বন মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক যক্ষ এক নগর নির্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদরের সহিত সেখানে রাখিল। কিছুদিন সে স্থানে অবস্থান করিবার পর তাঁহারা বিজয়পুর নগরের সমীপবর্তী বাগোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিজয়পুরের রাজা পৃথিবীধরের কন্যা বনমালার পূর্ব হইতেই লক্ষ্মণের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করায় সে সেই বনের মধ্যে মনোদুঃখে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিতে যাইতেছিল। সেই সময় লক্ষ্মণ আসিয়া তাহাকে বাঁচাইলেন এবং তাহার নিকট নিজের পরিচয় দিলেন।

তখন সকলে মিলিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাজা পৃথিবীধর তাঁহাদিগের সকলের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে ক্রুটী করিলেন না। সেখানে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন—'নন্দ্যাবর্তের রাজা অতিবীর্য এবং ভরতের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে এবং তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।'

অতিবীর্য অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা। এই জন্য রামচন্দ্র যুদ্ধ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এক নর্তকীর বেশ ধারণ করিয়া অতিবীর্যের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া আসিলেন। পরে সীতা ছাড়িয়া দিতে বলিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মুক্তি পাইয়া তিনি সংসারের প্রতি বৈরাগ্য বশতঃ পুত্র বিজয়রথের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া জিন দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

বিজয়রথ নিজের পরমসুন্দরী ভগিনী রত্নমালাকে লক্ষ্মণের সহিত এবং বিজয়সুন্দরী নামে অপর এক ভগিনীকে ভরতের সহিত বিবাহ দিলেন এবং ভরতের আদেশ মানিয়া চলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভরত জানিতেও পারিলেন না যে রাম নর্তকীর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার কত উপকার করিলেন। তাহার পর তিনজনে সেখান হইতে গোপনে প্রস্থান করিলেন।

[ক্রমশঃ

আলোচনা

মহাশয়, আপনাদের পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত সাধ্বী শ্রীমঞ্জুলা লিখিত 'জৈনতীর্থংকর ঋষভ ও শিব' প্রবন্ধটির প্রতি আমি সমস্ত ভারত বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করি।

এই প্রবন্ধে এমন একটা নির্দেশ দেখা যায় যা মান্য করে অনুসন্ধান চালালে ভারতবর্ষের পৌরাণিক ও প্রাগৈতিহাসিক চিত্র এক অভিনব রূপ লাভ করবে এবং আমাদের জাতীয় সংহতি দৃঢ় হবার সম্ভাবনা ঘটবে।

জৈন তীর্থংকরদের মধ্যে ভগবান মহাবীর শেষ এবং চতুর্বিংশ তীর্থংকর। তিনি বুদ্ধদেবের প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময়কার ইতিহাসই আমরা এখন পর্যন্ত চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারণ করতে সক্ষম হইনি। ত্রয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ মহাবীরের নির্বাণের প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করেন। আর প্রথম তীর্থংকর হচ্ছেন ঋষভদেব। যদি মহাবীর ও পার্শ্বনাথের মধ্যে সময়ের ব্যবধানকে একটা মান হিসাবে ধরা হয় তাহলে এটা সহজেই অনুমেয় যে ঋষভদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন খৃষ্টপূর্ব ছয় হাজার বৎসরেরও পূর্বে। এর মধ্যেই ভারতবর্ষের বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ আরম্ভ হয়েছে।

সুতরাং ভারতবর্ষের বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করবার জন্য বেদপুরাণাদিতে তীর্থংকরগণ কি ভাবে ফুটে উঠেছিলেন তা জানা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। এবং এই দিক থেকে সাধ্বী শ্রীমঞ্জুলা তাঁর প্রবন্ধে যে নূতন দিক্‌দর্শন করেছেন তারই সুষ্ঠু প্রয়োগে বেদ পুরাণাদির বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান চালানো বিশেষ প্রয়োজন। ইতি—

শ্রীফণীন্দ্রকুমার সান্যাল, কলিকাতা

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

Vol. I. No. 6 : Sraman : September 1973
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১. সাতটী জৈন তীর্থ —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

২. অতিমুক্ত —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৪.০০

৩. শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

৪. শ্রাবকক্বত্য —শ্রীগণেশ লালওয়ানী নিঃশুল্ক

हिन्दी

१ श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला
—श्री कान्तिसागरजी महाराज ५.००

२ श्रीमद् देवचन्द्रकृत अध्यात्मगीता
—श्री केशरीचन्द धूपिया .७५

English

1. Bhagavati Sutra Vol. I (Satak 1-2)
(Text with English Translation)
—Sri K. C. Lalwani 40.00

2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha .75
tr. by Sri Ganesh Lalwani

3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani .50

কার্তিক ১৩৮০

প্রথম বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮০ ॥ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

তীর্থংকর জননী, দেবগড়, মধ্যপ্রদেশ

মাটির প্রদীপ/প্রাণের প্রদীপ

[ভগবান মহাবীরের নির্বাণোপলক্ষে]

জ্ঞানের আলো নিভল বলে
মাটির প্রদীপ জ্বালি
মহাশ্রমণ, তোমার পূজায়
সাজাই অর্ঘথালি।
আঁধার রাতের তিমির তলে,
লক্ষ তারার মাণিক জ্বলে,
আমার বুকের ছোট্ট আকাশ
রয় বা কেন খালি ?

ওই আলোকের স্পর্শ লেগে
আজকে গভীর রাতে
মাটীর প্রদীপ প্রাণের প্রদীপ
জ্বলুক এক সাথে।
তাইত হৃদয় শূন্য করে,
সকল আমার দিলেম ধরে,
নাও তুলে নাও পায়ে তোমার
ঘুঁচিয়ে আঁধার কালি।

[আজ হতে ২৫০০ বছর আগে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় তীর্থংকর ভগবান মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর দেহাবসানে জ্ঞানের আলো নির্বাপিত হল বলে কাশীর মল্ল ও কোশলের লিচ্ছবী বংশীয় বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় সামন্তেরা মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই অন্ধকারকে আলোকিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেইদিন হতে প্রবর্তিত হয় দীপাবলীর উৎসব। ভগবান মহাবীরের মোক্ষ লাভের স্মৃতিতে শ্রমণ ধর্মের অনুযায়ীরা আজো তাই তাঁদের গৃহ দীপাবলীতে আলোক মালায় সজ্জিত করেন।]

বৰ্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

ওদিকে ততক্ষণ যামঘোষী দুন্দুভীর শব্দে সিদ্ধার্থেরো ঘুম ভেঙে গেছে। তিনিও শয্যা ত্যাগ করে নৈমিত্তিকদের ডাকবার আদেশ দিয়ে ব্যায়ামশালে প্রবেশ করেছেন। আজ একটু সকাল সকালই স্নান করে নিতে হবে। স্বপ্নফল জানবার আগ্রহ তাঁকেও ত্বরান্বিত করেছে।

তারপর দিনের প্রথম যাম উত্তীর্ণ হবার আগেই আস্থান-মণ্ডপে সভা বসল। সিদ্ধার্থ স্নানান্তে আমোদি মালতী কুসুমের মালা গলায় ঝুলিয়ে পরিজন পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে এসে বসলেন। তাঁকে ঘিরে বসল তন্ত্রপালক, তলবর ও মাণ্ডবিকেরা। ভদ্রাসনে যবনিকার অন্তরালে বসলেন ত্রিশলা সপরিকরে। রাজার ঠিক সামনে ঈষৎ উঁচু বেদীর ওপর নৈমিত্তিকদের আসন। তাঁরাও রাজার দ্বারা সম্মানিত হয়ে আসন গ্রহণ করেছেন। স্বপ্নের ফল জানবার আগ্রহ এখন কেবল ত্রিশলা ও সিদ্ধার্থেরই নয়, সকলের। সকলের দৃষ্টি তাই নৈমিত্তিকদের ওপর।

নৈমিত্তিকেরা ততক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কূট সেই বিচার। শাস্ত্রে যে বাহাত্তর রকম স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে তার লক্ষণ ও ফলাফল বিচার। বাহাত্তর রকম স্বপ্নের মধ্যে বিয়াল্লিশটী সামান্য ফলদায়ী। বাকী তিরিশটী উত্তম ফলদায়ী। এরকম স্বপ্ন ভাগ্যবতী রমণীরাই দেখে থাকেন। জাতক গর্ভে এলে ভাবী তীর্থংকর বা চক্রবর্তীর মা দেখে থাকেন চৌদ্দটী, বাসুদেবের মা সাতটী, বলদেবের মা চারটী, মাণ্ডলিক দেশাধিপতির মা একটী। মহারাণী যখন চৌদ্দটী স্বপ্ন দেখেছেন তখন অচিরেই যে তিনি সর্বজ্ঞ তীর্থংকর বা চক্রবর্তী রাজার জন্ম দেবেন তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু হস্তী দর্শনের কি ফল ?

জাতক পরচক্র দমন করবে, নয়ত ষড়রীপু।

বৃষ ?

বৃষের মতো সংসার ভার বহন করবে, নয়ত সংযম ভার

সিংহ ?

পরম শত্রুও তাকে দেখে ভীত হবে, ভাব বৈরী নির্জিত হবে।

লক্ষ্মী ?

জাতক লক্ষ্মীবান হবে।

পুষ্প মালা ?

জাতকের যশঃ সৌরভ বহুদূর বিস্তৃত হবে।

চন্দ্র ?

জাতক সকলের সন্তাপ হরণ করবে, বিশ্বকে আনন্দিত করবে।

ধ্বজ ?

বংশ জাতকের দ্বারা কীর্তিমান হবে।

কলস ?

জাতক পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করবে।

সরোবর ?

সুরাসুর নর সকলের সেব্য হবে, জাতকের ভাবধারায় সকলে অবগাহন করবে।

সমুদ্র ?

সমুদ্রের মতো জাতক রত্নাকর হবে, গম্ভীর হবে।

দেববিমান ?

জাতক বৈমানিক দেবতাদের দ্বারাও পূজিত হবে।

রত্ন ?

জাতক প্রভূত রত্নের অধিকারী হবে, বা জ্ঞান রত্নের।

নির্ধূম অগ্নি ?

দীপশিখার মতো দীপ্যমান হবে, অন্তর মালিন্যকে দগ্ধ করবে।

কিন্তু জাতক রাজ চক্রবর্তী হবে, না ধর্ম চক্রবর্তী ? সে সম্পর্কে এখুনি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে এতে করে আরো রাজ্যের সর্বাঙ্গীন শ্রী, সম্পদ ও সমৃদ্ধি সূচিত হচ্ছে।

এতক্ষণ একটা অধীর আগ্রহ নিয়ে রাজসভা নিস্তব্ধ হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নদর্শনের ফলাফল শুনবার পর চারদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সে কলরব ক্রমে এতো তীব্র হয়ে উঠল যে কঞ্চুকিরা বেত্রাস্ফালন করেও তা শান্ত করতে পারল না। সিদ্ধার্থ তাদের তুরবস্থা দেখে হাসতে হাসতে তাদের নিবৃত্ত করে প্রচুর দান-দক্ষিণা দিয়ে নৈমিত্তিকদের বিদায় দিলেন। তারপর সেদিনের মতো সভা বিসর্জিত হ'ল।

সভা বিসর্জনের পর সিদ্ধার্থ ত্রিশলার কক্ষে এলেন। ত্রিশলা তখন সেখানে মর্মর পীঠিকার ওপর বসে তাঁরই প্রতীক্ষা করছিলেন। সিদ্ধার্থকে আসতে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর রাজ আভরণ খুলতে খুলতে বললেন, আর্যপুত্র, আজ আমার কী আনন্দ।

সিদ্ধার্থ ত্রিশলার আনন্দিত মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর তাঁকে তু'হাতে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, ত্রিশলা, তোমাকে পেয়ে এতদিনে আমিও ধন্য হলাম।

সেকথা শুনে ত্রিশলার মুখে একটা সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। ত্রিশলা কোনো কথা না বলে স্বামীর বুকে মুখ রাখলেন।

ত্রিশলা এমনিতেই রূপসী। কিন্তু এত রূপ বোধ হয় তাঁর কোনো কালেই ছিল না। কারণ এতো পার্থিব রূপ নয়, অপার্থিব। ঠিক সূর্যোদয়ের আগের আরক্তিম আকাশের রূপ।

সেই রূপ অহরহ দেখেও তৃপ্তি হয় না। হয় না তাই সিদ্ধার্থ চেয়ে থাকেন ত্রিশলার মুখের দিকে। যতই দেখেন ততই দেখবার বাসনা জাগে। সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবেন জাতকের আসবার সম্ভাবনাতেই কি ওর দেহে বিশ্বের লাবণ্য বারিধি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

বোধ হয় সখীরাও সেই কথাই ভাবে। ভাবে বলেই তাদের কত সাবধান বাণী, কত অযাচিত উপদেশ: সখি, মন্দ মন্দ হাঁটবি। ধীরে ধীরে কথা বলবি। কোপ কখনো করবি না। মাটিতে কখনো শুবিনা।

ত্রিশলা তাদের কথা মেনে চলেন। তাদের উৎকণ্ঠায় আনন্দিত হন।

কিন্তু এত সাবধান-সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন অঘটন ঘটল।

ত্রিশলা সেদিন শুয়েছিলেন ইন্দুকান্ত-মণি পালঙ্কের ওপর অর্দ্ধশয়ান। গর্ভের সঞ্চালন জাত যন্ত্রণায় তিনি ছিলেন একটু অস্থির। পাশে দাঁড়িয়ে বীজন করছিল চামরগ্রাহিণী। হঠাৎ তাঁর মনে হল গর্ভের সঞ্চালন যেন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কি—তাঁর গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে? ত্রিশলা সে কথা মনে করতেই তাঁর মনে হল তাঁর পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেছে। তিনি দুঃখার্তা হয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, হায় আমার কী সর্বনাশ হল?

কি আর সর্বনাশ হবে? সখীরা ভাবল দেবী কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় দুঃখার্তা হয়েছেন, নয়ত যন্ত্রণায় অস্থির। তাই তারা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠল, স্বামিনি, অমঙ্গল চিন্তা শান্ত কর। গর্ভের কুশলতার কথা মনে করে নিজের কষ্টের কথা ভুলে যাও।

গর্ভের যদি কুশল তবে আর আমার দুঃখ কী? বলে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন ত্রিশলা।

তখন চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। সখীরা কেউ বা বাটিতে করে চন্দন-পঙ্ক নিয়ে এলো, কেউ বা ভৃঙ্গারে করে সুরভী শীতল জল। কেউ বা জলের ছিঁটা দিয়ে ত্রিশলার মুখ মুছিয়ে দিল কেউ বা শিথিল করে ধুইয়ে দিল তাঁর ঘন কালো চুল।

ত্রিশলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল।

ত্রিশলা যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে মাথার ওপর মন্দাকিনীর শুভ্র ফেনার মতো দুকুল-বিতান। সেই বিতানের দিকে অর্থহারা দৃষ্টি মেলে নিজের মনের মধ্যেই যেন বলে উঠলেন ত্রিশলা—দৈবকতৃক সর্বস্বাপহরণে আমি দুঃখিতা। জীবনে আর আমার কাজ কী?

বলতে বলতে ত্রিশলা আবার মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। গর্ভের অকুশল সংবাদ ততক্ষণে সবখানে প্রচারিত হয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে নগরীতে উৎসব ও নাটকাদি। মন্ত্রী ও অমাত্যরা হয়ে পড়েছেন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। দৈবের কী প্রতিকার করবেন তাঁরা। পায়ের চলবার শক্তি নেই তবু এসেছেন ভবনদ্বারে। পুরবাসীরাও সেখানে সমবেত হয়েছে বিশদ জানবার জন্য।

যে পুরী একটু আগেই আনন্দোচ্ছল ছিল সেই পুরী শোকের মতোই এখন ম্রিয়মান, শ্রীহীন, শূন্য।

গর্ভের সঞ্চালনে মায়ের অস্থির ভাব দেখেই না স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বর্দ্ধমান। ভেবেছিল ওতে যদি মায়ের কষ্টের খানিকটা লাঘব হয়। কিন্তু ত্রিশলা গর্ভের ওই স্থির হয়ে যাওয়াকেই ভাবলেন নষ্ট হয়ে যাওয়া। তাই তাঁর এই আর্তি। বর্দ্ধমান দেখল সেই আর্তি। হায়! যে সন্তান এখনো জন্ম গ্রহণ করেনি, যাকে চোখেও দেখেন নি তিনি এখনো, তার জন্য তাঁর একি ব্যাকুলতা! কিন্তু বর্দ্ধমান সেই ব্যাকুলতাকে ছোট করে দেখল না। বরং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল। আমার জন্য যখন মা'র এই কষ্ট তখন তাঁর বেঁচে থাকতে তাঁকে কষ্ট দিয়ে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব না।

তালবৃন্তের ব্যজন দিয়ে সখীরা আবার ত্রিশলার সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনেছে।

সিদ্ধার্থ তখন ত্রিশলার হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে বসেছেন। না, না ত্রিশলা, এ কখনো হতে পারে না। শোননি নৈমিত্তিকদের ভবিষ্যৎবাণী। তাই মন হতে অকারণ আশঙ্কাকে দূর করে দাও। এমনি যদি অঘটন ঘটবে তবে কেন হবে সবখানে উন্নতি? ওর আসবার সূচনাতেই না আমাদের বল, শ্রী ও সম্পদ।

দলিতাঞ্জন চোখ ছাপিয়ে ত্রিশলার জল ঝরে পড়ল। তিনি সিদ্ধার্থের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি, ত্রিশলা।

হাঁ সত্যি, এই যে গর্ভ সঞ্চালিত হয়েছে। ধন্য আমি, পুণ্য আমি, শ্লাঘ্য আমার জীবন। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসি ফুটে উঠল আবার ত্রিশলার মুখে। তিনি সিদ্ধার্থের হাত ছেড়ে দিলেন। বললেন, ব্যাধ ভয়ে ভীতা হরিণীর মতো আমার মন। কিন্তু না, আর ভয় রাখব না।

ভয় রাখবেনও বা তিনি কি করে? কারণ যে আসছে সে নির্ভয় করতেই আসছে এই পৃথিবীকে।

আশ্বিনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর পর এলো চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী, খৃষ্ট জন্মের ঠিক

৫৯৯ বছর আগে। ত্রিশলা বসেছিলেন অলিন্দে। এমন সময় প্রসব বেদনা উঠল। প্রসব বেদনা উঠতেই তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রসব ঘরে ঢুকলেন।

তারপর দেখতে দেখতে প্রসব হয়ে গেল। এতটুকু কষ্ট হল না।

ঘরে তখন গাঢ় চন্দনের গন্ধ উঠেছে। ঘরের মণিদীপের আলো অলৌকিক একটা জ্যোতিতে যেন আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আর বাইরে? বাইরে তখন ত্রয়োদশীর প্রায় পূর্ণাবয়ব চাঁদ মাথার ওপর উঠে এসেছে। মেঘহীন আকাশে কেবল তারি নির্মল শুভ্রতা। কোথাও এতটুকু আবরণ নেই। সেই শুভ্রতায় অদৃশ্য হয়ে গেছে তারার ঝাঁক। ধপ্ ধপ্ করছে মাঠ, ঘাট, বাট।

হস্তোত্তরা উত্তরা-ফাল্গুনীর যোগে এলো নব জাতক, এলো মহাজীবন।

সিদ্ধার্থ বিশ্রামাগারে ছিলেন। পরিচারিকা প্রিয়ভাষিতা সেই আনন্দ সংবাদ তাঁর কাছে বহন করে নিয়ে এলো।

সিদ্ধার্থ কণ্ঠ হতে সাত নলী হার খুলে পুরস্কৃত করলেন প্রিয়ভাষিতাকে। তারপর উঠে গেলেন নব জাতককে দেখবার জন্য।

শুধু সিদ্ধার্থ-ই নন, নব জাতককে দেখবার জন্য এসেছেন আরো অনেকে। মন্ত্রী এসেছেন, এসেছেন সামন্ত নৃপতিরা আর পুরজন। আরো আগে অলক্ষ্যে এসেছিলেন দেবনিকায় সহ দেবরাজ ইন্দ্র।

দেবরাজ অবস্বাপিনী নিদ্রায় সবাইকে নিদ্রিত করে নবজাতককে তুলে নিয়ে গেলেন মেরু শিখরে তার স্নানাভিষেকের জন্য।

কিন্তু যখন সপ্ত সিন্ধুর জলে দেবতারা তাকে অভিষিঞ্চিত করতে যাবেন তখন হঠাৎ দেবরাজ ইন্দ্রেরও মনে হল—পারবে কি এই শিশু সপ্ত সিন্ধুর জলধারা সহ্য করতে?

কিন্তু অমূলক তাঁর মনের আশঙ্কা, অকারণ সেই ভ্রান্তি। বর্দ্ধমানও জানতে পেরেছে দেবরাজের মনোভাব। তাই তাঁর ভ্রান্তি দূর করবার জন্য সে বাঁ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটু খানি চাপ দিতেই থর থর করে কেঁপে উঠল মেরু পর্বত, শিলা খসে পড়ল ঝুর ঝুর করে, উদ্বেলিত হয়ে উঠল উদধি। ইন্দ্র তখন বুঝতে পারলেন বর্দ্ধমান কি অপরিমিত বল, বীর্য ও শারীরিক শক্তির অধিকারী।

অভিষেকের পর আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলেন নবজাতককে দেবতারা।

সিদ্ধার্থ চেয়ে দেখছেন নবজাতককে। কি দেখছেন? দেখছেন রুচি সূর্যের রঙ নব জাতকের। যেন সূর্যোদয় হচ্ছে।

মন্ত্রীও দেখলেন। দেখলেন আকাশে যেমন সূর্যকিরণ প্রসৃত হয়, তেমনি সেই প্রভা সবখানে প্রসৃত হয়ে গেল।

মন্ত্রী সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে বললেন, দেব, কি নাম রাখা হবে জাতকের?

কি আবার নাম? হেসে বললেন সিদ্ধার্থ। ও যেদিন হতে এসেছে সেদিন হতে লক্ষ্মীর চঞ্চলা অপবাদ ঘুচেছে। যাদের জয় করা হয়নি এমন সব সামন্ত নৃপতিরা আনুগত্য জানিয়ে গেছে নিজে হতে। আমার মন বলছে অকারণ লব্ধ নয় এই ঋদ্ধি। তাই যখন ওর জন্য ধন, ধান্য, কোষ ও কোষ্ঠাগার, বল, পরিজন ও রাজ্যসীমার বিস্তৃতি তখন ও বর্দ্ধমান।

তাই ছয় দিনের দিন নব জাতকের নাম রাখা হল বর্দ্ধমান।

সির্দ্ধার্থের মনে আনন্দের সীমা নেই। রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, বন্দীদের করেছেন বন্ধনমুক্ত। ঘোষণা করেছেন যার যা প্রয়োজন বিপণি হতে সংগ্রহ করে নিয়ে যাক—রাজকোষ হতে অর্থ দেওয়া হবে, যেন আনন্দের দিনে কারু কোথাও কোনো চাওয়া না থাকে।

বর্দ্ধমান রাজকীয় বৈভবের মধ্যে বড হয়ে উঠছে।

কুমার নন্দীবর্দ্ধন অগ্রজত্বের অধিকারে যদিও পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তবু বর্দ্ধমান সকলের প্রিয় হয়েছে। সে চক্রবর্তী রাজা হবে না তীর্থংকর তার জন্য নয় কারণ সে কথা কেই বা সব সময় মনে করে রাখে, প্রিয় হয়েছে তার রূপ ও লাবণ্যের জন্য তার অনুপম স্বভাব ও চারিত্রের জন্য। বর্দ্ধমানের রূপ দলিত মনঃশীলার মতো। আর লাবণ্য আম্রমঞ্জরীর মকরন্দের মতো যা পায়ে পায়ে ঝরে পড়ে। তাই তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য তার চোখ। আকর্ণ বিস্তৃত, টানা-টানা। যেন

ধ্যানীর চোখ। তাই মুহূর্তের অদর্শন বিচ্ছেদ ব্যথার মতো। ত্রিশলা তাই সর্বদাই বর্দ্ধমানকে চোখে চোখে রেখেছেন। মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করেন না।

এমনি দিনের পর দিন যায় মাসের পর মাস। বর্দ্ধমান ক্রমশঃই বড় হয়ে ওঠে।

[ক্রমশঃ

স্বপ্ন, কল্পসূত্র

বাসুদেব কৃষ্ণ ও অর্হৎ অরিষ্টনেমি

শ্রী এস. সি. রামপুরিয়া

The Wonder that was India গ্রন্থে Dr. Basham লিখছেন : "বৌদ্ধ পিটকে বর্দ্ধমান মহাবীরকে গৌতম বুদ্ধের প্রতিস্পর্দ্ধী রূপে দেখানো হয়েছে। তাই তাঁর ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত। তাঁর দুশো বছর আগে পার্শ্ব যে শ্রমণ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যা নিগ্রর্ন্থ সংঘ নামে পরিচিত ছিল, প্রথম জীবনে তিনি তার অনুযায়ী ছিলেন। পরে এই নিগ্রর্ন্থ শব্দ মহাবীর স্থাপিত শ্রমণ সংঘের জন্য প্রযুক্ত হতে লাগল ও পার্শ্ব জৈনদের চব্বিশজন তীর্থংকরের ২৩ সংখ্যক তীর্থংকর রূপে গৃহীত হলেন।"

The Culture and Art of India গ্রন্থে ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী লিখলেন : "পার্শ্ব, যাঁকে বারাণসীর রাজপুত্র বলা হয় তিনি সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চাতুর্যাম ধর্মের প্রচার করেন। এই ধর্ম মহাবীর উপদিষ্ট ধর্মের প্রায় অনুরূপ ছিল।"

এসব উদ্ধরণ হতে একথা বলা যায় যে জৈনদের চব্বিশজন তীর্থংকরের মধ্যে বর্দ্ধমান-মহাবীর ও তাঁর পূর্ববর্তী পার্শ্বনাথের ঐতিহাসিকত্ব ঐতিহাসিকেরা আজ স্বীকার করতে সুরু করেছেন। কিন্তু এঁদের পূর্ববর্তী তীর্থংকরদের সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব ষাঠ বছর আগেও যেরূপ ছিল আজও ঠিক তাই রয়েছে। তাঁদের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করতে এঁরা এখনো প্রস্তুত নন।

কিন্তু ২২ সংখ্যক তীর্থংকর ভগবান অরিষ্টনেমির জন্মস্থান, বংশ পরিচয়, প্রব্রজ্যা, সাধনা ব্যক্তিত্ব ও ধর্ম প্রচার সম্পর্কে যে সমস্ত প্রামাণিক ও মানবীয় ঘটনার উল্লেখ জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায় তাতে তাঁর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর Indian Philosophy গ্রন্থেও লিখেছেন : "এতে কোন সন্দেহ নেই যে জৈনধর্ম বর্দ্ধমান-মহাবীর ও পার্শ্বনাথের পূর্বেও বর্তমান ছিল।"

ভগবান অরিষ্টনেমি মথুরার নিকটস্থ সোরিয় বা সৌর্যপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সমুদ্রবিজয়; মায়ের নাম শিবা। তিনি গৌতম গোত্রীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁকে বৃষ্ণি-পুঙ্গব বা অন্ধক-বৃষ্ণির পুত্র বলেও আবার অভিহিত করা হয়েছে।

কৃষ্ণ তাঁর কাকাতো ভাই ছিলেন এবং বয়সে কিছু বড় ছিলেন।

অরিষ্টনেমির বিবাহ ভোগরাজকন্যা রাজীমতীর সঙ্গে হওয়া স্থির হয়। বিবাহের শোভাযাত্রা বাদ্যভাণ্ড সহকারে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারপর যখন তা রাজপ্রাসাদের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে তখন খোয়াড়ে আবদ্ধ পশুদের আর্ত করুণ চীৎকার অরিষ্টনেমির কানে যায়। বিবাহে উপস্থিত রাজন্যদের আহারের জন্য তাদের হত্যা করা হবে শুনে অরিষ্টনেমির হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে ও তিনি চিন্তা করেন: "আমার জন্য যদি এতগুলো পশুকে হত্যা করা হয় তবে তা পরলোকে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়ের কারণ হবে না।" তখন তিনি বিবাহ করবার সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করেন ও দ্বারকা হতে বহির্গত হয়ে রৈবতক (গিরনার) পাহাড়ে যান। সেখানে অশোক গাছের তলায় মাথার চুল উৎপাটিত করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

এ ভাবে অরিষ্টনেমি অহিংসার একজন প্রমুখ প্রবক্তা রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন ও তৎকালীন নিষ্ঠুর পশু হত্যার বিরুদ্ধে তিনি যে সক্রিয় আন্দোলন উপস্থিত করেন তার প্রভাব বহুদূর প্রসারী হয়।

ভোগরাজকন্যা রাজীমতী অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। সেই রূপবতী রাজকন্যার আকর্ষণ উপেক্ষা করে তরুণ বয়সে অরিষ্টনেমি যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেন তার জন্য তাঁকে ব্রহ্মচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেও আবার অভিহিত করা হয়।

অরিষ্টনেমির জীবনের এই করুণ প্রসঙ্গ নিয়ে জৈন সাহিত্যে একাধিক কাব্য ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাই অরিষ্টনেমির জীবন ও জীবনাদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক গভীর প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয়েছে সেকথা বলা যায়।

ভগবান অরিষ্টনেমি বিনয় মূল ধর্মের প্রচার করেছিলেন। বিনয় মূল ধর্মের অর্থ যে ধর্ম আত্মার বিনয়ন বা শুদ্ধির সহায়ক হয়। দৈহিক শুচিতাকে তিনি মোক্ষ লাভের উপায় বলে মনে করেন নি বরং যাঁরা দৈহিক শুচিতাকে

একমাত্র পথ বলে অভিহিত করতেন তাঁদের তিনি তীব্র সমালোচনাই করেছেন।

ঋক্‌বেদের একটী সূক্তে অরিষ্টনেমির নাম পাওয়া যায় :

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতুঃ ॥

ঋক্‌বেদ ছাড়াও যজু ও সাম বেদেও অরিষ্টনেমির নামের উল্লেখ আছে। বেদোক্ত অরিষ্টনেমি ও অর্হৎ অরিষ্টনেমি একই ব্যক্তি কিনা তা গবেষণার বিষয়; তবে পণ্ডিতদের অনেকেই তাঁদের এক ব্যক্তি বলেই মনে করেন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর Indian Philosophy গ্রন্থে লিখছেন : "যজুর্বেদে ঋষভদেব, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমি এই তিন তীর্থংকরের নাম পাওয়া যায়।"

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে নিম্নলিখিত দুটী শ্লোক রয়েছে :

অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জনেশ্বরঃ।
অনুকূলঃ শতাবর্তঃ পদ্মীপদ্মনিভেক্ষণঃ ॥৫০
কালনেমিনিহমবীরঃ শৌরিঃ শূরজনেশ্বরঃ।
ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহাহরিঃ ॥৫১

এই শ্লোকে 'শূরঃ শৌরির্জনেশ্বরঃ' শব্দের স্থানে 'শূরঃ শৌরির্জিনেশ্বরঃ' করে এর অর্থ অরিষ্টনেমিও করা যেতে পারে।

* * *

ধর্মবীর অরিষ্টনেমির জীবন কথার সঙ্গে কর্মবীর কৃষ্ণের জীবন কথা আবার এক সঙ্গে জড়িত।

এর কারণ কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র ছিলেন আর অরিষ্টনেমি বসুদেবের অগ্রজ সমুদ্রবিজয়ের পুত্র। এভাবে এই দুইজন এক বংশ ও এক পরিবারভুক্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের জীবন একের সঙ্গে আর এক-এর এমন ভাবে সম্বন্ধান্বিত ছিল যে একজনের উল্লেখ করলে আর একজনের উল্লেখ না করে পারা যায় না।

জৈন আগমে অরিষ্টনেমি ও কৃষ্ণের জীবন একসঙ্গে গ্রথিত হলেও ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানে অরিষ্টনেমির নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

সে যা হোক, জৈন আগম অনুসারে কৃষ্ণ অরিষ্টনেমির পরমভক্ত ছিলেন ও তাঁর পরিবারের অনেকেই অরিষ্টনেমির নিকট শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেছেন।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে কৃষ্ণের যে জীবন পাওয়া যায় তার সঙ্গে জৈন আগমে উপলব্ধ কৃষ্ণের জীবনের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উপস্থিত করছি।

ব্রাহ্মণ্য মতে কৃষ্ণ বিষ্ণুর দশ অবতারের অষ্টম অবতার। জৈনরা অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না, তাই জৈন আগমে কৃষ্ণের অবতারত্বের কোনো উল্লেখ নেই। থাকা সম্ভবও নয়। জৈন আগমানুসারে কৃষ্ণের জন্ম সৌর্যপুরে হয়েছিল।

কৃষ্ণ যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বসুদেব, মায়ের নাম দেবকী। জৈন আগমানুসারেও তাঁর পিতার নাম বসুদেব ও মায়ের নাম দেবকী। তিনি অন্ধক-বৃষ্ণি বা বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত ছিলেন।

কংস সেই সময় মথুরার অধিপতি ছিলেন, দেবকী তাঁরই বোন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম পুত্রের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। সেজন্য দেবকীর পুত্র হওয়া মাত্রই তিনি তাকে হত্যা করতেন। কিন্তু কৃষ্ণ ও তাঁর অগ্রজ বলরাম কোনো রকমে রক্ষা পান। তাঁরা দুইজনে গোপ নন্দ ও যশোদার ঘরে পালিত হন। কংস যখন কৃষ্ণ ও বলরামের পলায়নের খবর পান তখন তত্রস্থ সমস্ত বালকদের হত্যার আদেশ দেন।

নন্দ দুই বালককে প্রথমে ব্রজে রাখেন পরে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। এভাবে তাঁদের জীবন রক্ষা পায়। কৃষ্ণের জীবনের এই ঘটনা জৈন আগমে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণের বাল্য জীবন চমৎকারিক ঘটনায় পূর্ণ। কংস প্রেরিত অঘাসুর সর্প হয়ে কৃষ্ণ সহ তাঁর সঙ্গী বালকদের গ্রাস করলে কৃষ্ণ বিশালদেহ ধারণ করেন যার ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। পুতনা রাক্ষসী তাঁকে বিষলিপ্ত স্তন পান করালে কৃষ্ণ স্তন এত জোরে আকর্ষণ করেন যে তার ফলে পুতনার মৃত্যু হয়। এভাবে তিনি কুবলয়পীড় নামক হস্তীরও মর্দন করেন।

একবার যমুনাতটে ব্রজে অগ্নি প্রজ্জলিত হলে কৃষ্ণ সেই অগ্নি পান করে তাকে শান্ত করেন। গোবর্দ্ধন পর্বত হাতে তুলে তিনি আর একবার সংবর্তক মেঘের বর্ষা হতে ব্রজকে রক্ষা করেন। কালীয় সর্পের ফণার ওপর

নৃত্য করে তার গর্ব খর্ব করেন। এই ধরণের বহু ঘটনা ভাগবতে পাওয়া যায়।

এই সব ঘটনার উল্লেখ জৈন আগমে পাওয়া যায় না। তবে গর্বখর্বকারী রূপে অন্য কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে অহঙ্কারী চানুর মল্লের বিনাশ করেন। চানুর কংসের এক অনুচর ছিল। মল্লযুদ্ধে তার বিনাশের কথা ভাগবতেও আছে। রিষ্ট নামক দুষ্ট বলীবর্দের তিনি বধ করেন। ভাগবতেও বৃষভাসুর অরিষ্ট বলিবর্দের বধের কথা আছে। দুষ্ট নাগের গর্ব খর্ব করার কথাও আছে। যমলার্জুন বৃক্ষের রূপ ধারণ করে তিনি বিদ্যাধরদের মান ভঙ্গ করেন। অপর পক্ষে যমলার্জুন বৃক্ষের উৎপাটন দ্বারা গুহ্যক উদ্ধারের কথা ভাগবতে পাওয়া যায়। দুষ্ট মহাশকুনি ও পুতনারও তিনি বিনাশ করেন।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য অনুসারে কৃষ্ণ যৌবনে রসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মধুর মধুর গান করতেন ও সেই গান শুনে গোপিনীরা যমুনাপুলিনে একত্রিত হত, রাস করত। রাসে কৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে তাদের সাহচর্য দিতেন। রাধা তাঁর প্রিয় সহচরী ছিল। জন আগমে এরূপ রসিক কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পরিশেষে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেন ও মথুরার সিংহাসন অধিকার করে নেন। জৈন আগমে শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ কংসের মুকুট মর্দন করেন।

ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে কৃষ্ণ মথুরা অধিকার করে নিলেও তা দীর্ঘ দিন নিজের অধিকারে রাখতে সমর্থ হন নি। কংসের শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধের আক্রমণে বিব্রত হয়ে কৃষ্ণকে মথুরা পরিত্যাগ করে দ্বারকায় চলে যেতে হয়।

জৈন আগমে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধের উল্লেখ আছে তবে যুদ্ধে কৃষ্ণ পরাজিত হন নি, জয়লাভই করেছিলেন। কৃষ্ণকে মথুরা পরিত্যাগ করে যেতে হয়েছিল তার উল্লেখও জৈন আগমে পাওয়া যায় না। জরাসন্ধ কৃষ্ণের সঙ্গে চক্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নিজের চক্রের আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করে কৃষ্ণ বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণীকে প্রধানা

মহিষী করেন। তাঁর রাণীর সংখ্যা ছিল ১৬,০০০ ও পুত্র সংখ্যা ১৮০,০০০। জৈন আগমে রুক্মিণীর পরিবর্তে রুপ্পিনীর নাম পাওয়া যায়। এই রুপ্পিনীকে পাবার জন্ম কৃষ্ণকে শিশুপালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। জৈন আগম অনুসারে কৃষ্ণের ৮টী মহিষী ছিল যাঁদের মধ্যে পদ্মাবতী প্রধানা মহিষী ছিলেন। সেখানেও অবশ্য কৃষ্ণের ১৬,০০০ রাণীর কথা আছে তবে নাম পাওয়া যায় মাত্র নয়টার। তাঁর পুত্র সংখ্যার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন নামে তাঁর দুই পুত্র ও অনিরুদ্ধ নামে এক পৌত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৌরব ও পাণ্ডবে যে মহাযুদ্ধ হয় কৃষ্ণ তাতে পাণ্ডবদের পরামর্শদাতা ও নির্দেশক ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দেন। জৈন আগমে এরূপ কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কুরুদেশে পাণ্ডবদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে আসেন। যাদব কুমারদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দ্বারকা রক্ষার জন্ম কৃষ্ণ নগরে মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু একদিন উৎসব উপলক্ষে যাদব কুমারেরা প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করে নিজেদের মধ্যে হানাহানি সুরু করে। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন নিহত হলেন। বলরামেরও মৃত্যু ঘটল। এভাবে সমস্ত পরিবার বিনষ্ট হয়ে গেলে কৃষ্ণ মনঃকষ্টে নিকটস্থ এক অরণ্যে প্রবেশ করলেন ও সেখানে এক গাছের তলায় পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় মৃগভ্রমে এক শিকারী তাঁর প্রতি শর নিক্ষেপ করে। সেই শর তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয় ও তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এরপর দ্বারকা সমুদ্র গর্ভে লুপ্ত হয়।

জৈন আগম অনুসারে দ্বারকা সুরা, অগ্নি ও দ্বীপায়ন ঋষির কোপের জন্ম বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণের মৃত্যুর বিষয়ে সেখানে সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। দ্বারকা দ্বীপায়নের কোপে অগ্নিদগ্ধ হলে কৃষ্ণ মাতা-পিতা ও স্বজন রহিত হলেন। কৃষ্ণ ছাড়া এক মাত্র বলরাম তখনো জীবিত। তাই বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণদেশস্থিত পাণ্ডু মথুরার দিকে অগ্রসর হলেন। পাণ্ডুপুত্রেরা তখন মথুরায় অবস্থান করছিল। পথে কৌশাম্বীর নিকটস্থ এক বনে ন্যগ্রোধ গাছের তলায় তিনি যখন পীত বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত করে শয়ন করেছিলেন তখন জরাকুমার হরিণভ্রমে তাঁর দিকে তীর নিক্ষেপ করেন। সেই তীর তাঁর বাঁ পায়ে বিদ্ধ হয় ও সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

এভাবে কৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে জৈন আগমে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যায় যা তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর নূতন আলোকপাত করে। মাখন-চোর কৃষ্ণ ও গোপী-বল্লভ কৃষ্ণের বর্ণনা জৈন আগমে নেই। বাস্তবে কৃষ্ণের জীবনের এই দিকটা নিতান্ত অর্বাচীন এবং ঐতিহাসিকেরাও সেই বিষয়ে প্রায় একমত। বাস্তবে তাঁর জীবন ছিল এক কুশল ও পরাক্রমী যোদ্ধার ও তিনি সংকট-মোচক ছিলেন। সেইরূপই তাঁর প্রাচীন রূপ এবং সেইরূপই জৈন আগমে পাওয়া যায়।*

জৈন আগমে কৃষ্ণকে মহারথী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি পরম পুরুষ ও নিজের সময়ের বাসুদেব ছিলেন। তিনি ওজস্বী, তেজস্বী, বর্চস্বী

---

* এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপক্রমণিকায় যা লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্মেরই উন্নতি সাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইহারা ভগবানকে কিরূপ ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননীমাখন চুরী করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পরদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি—অপুণ্য দূর হয় মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্র সঙ্গত?

"ভগবচ্চরিত্রের এই রূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে; সনাতন ধর্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জন সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি, ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।" —সম্পাদক

ও মহান যশস্বী ছিলেন। তিনি স্বাভিমানী ও অমিত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি শরণাগত-বৎসল ও শরেণ্য ছিলেন। অন্যের সংকট মোচন করা তাঁর স্বভাব ছিল। তিনি যে কথা দিতেন তা সর্বথা রক্ষা করতেন। তিনি অসূয়াহীন বিশাল হৃদয় ছিলেন।

মহাভারতে কৃষ্ণ গীতার প্রবক্তা। জৈন আগমে তিনি অরিষ্টনেমির পরম ভক্ত। ছান্দগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরসের কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। ঘোর আঙ্গিরস কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে তপ, দান, নম্রতা, অহিংসা ও সত্য—এগুলি পুরুষের পক্ষে যজ্ঞের দক্ষিণার মতো (৩।১৭)। স্বর্গীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ধর্মানন্দ কোসাম্বী তাঁর 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও অহিংসা' গ্রন্থে ঘোর আঙ্গিরস ও অরিষ্টনেমি একই ব্যক্তি ছিলেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (পৃঃ ২৭)।

কৃষ্ণ বহুবার সস্ত্রীক অরিষ্টনেমির নিকট গেছেন তার বিবরণ পাওয়া যায়। অরিষ্টনেমির কাছে কেউ দীক্ষিত হলে তিনি তার দীক্ষা উৎসবে প্রমুখ অংশ গ্রহণ করতেন এমন কি প্রব্রজিত ব্যক্তির পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিতেন। কৃষ্ণ এভাবে অরিষ্টনেমির পরম ভক্ত হওয়া স্বত্বেও সেই জীবনে মুক্তিলাভ করেন নি। তাঁর জীবন ছিল সংগ্রামময়। বহু যুদ্ধ তাঁকে করতে হয়েছে—বহু লোকক্ষয় ও জীবহত্যা। তবে তিনি সম্যক দর্শন সম্পন্ন ছিলেন। তাই এই জম্বুদ্বীপে ভারতক্ষেত্রে আগামী উৎসর্পিনীতে শতদ্বার নামক নগরে অমম নামে দ্বাদশ তীর্থংকর হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন ও সেই জীবনে মুক্ত হবেন।

জৈন মন্দির ও গুহা

[পূর্বানুবৃত্তি]

আবুর জৈন মন্দির বিশ্ববিখ্যাত। আবু রোড রেল স্টেশন হতে ১৮ মাইল দূরে দেলবাড়ায় ৫টী জৈন মন্দির আছে: বিমল বসই, লুন বসই, পিতলহর, চৌমুখ ও মহাবীর স্বামী মন্দির। এ পাঁচটী মন্দিরের মধ্যে প্রথম দু'টীরই খ্যাতি। মন্দির দু'টী শ্বেত পাথরের। বিমল বসই মন্দির বিমল শাহ নির্মাণ করান। ইনি পোরবাড় চালুক্য বংশীয় নৃপতি ১ম ভীমদেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ১০৩১ খৃষ্টাব্দে হয়। মন্দিরের রচনা এইরূপ: ১২৮×৭৫ ফুট দৈর্ঘ-প্রস্থ যুক্ত প্রাঙ্গণ দেবকুলিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। দেবকুলিকার সংখ্যা ৫৪টী। প্রত্যেক দেবকুলিকায় আশ্রিত মূর্তি সহ ১টী প্রধান মূর্তি। দেবকুলিকার সামনে চারদিকে দু'টী স্তম্ভের প্রদক্ষিণা পথ। প্রত্যেক দেবকুলিকার সামনে ৪টী থামের মণ্ডপ। এভাবে থামের সংখ্যা ২৩২টী। প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে মুখ্য মন্দির। পূবের দিক থেকে প্রবেশ করলে প্রথমেই হস্তীশাল। এখানে বিমল শাহ সহ তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের গজারূঢ় মূর্তি রয়েছে। তারপর মুখ্য মণ্ডপ। তার আগে দেবকুলিকা ও প্রদক্ষিণা। তারপর সভামণ্ডপ। সভামণ্ডপের গোল শিখর ২৪টী থামের ওপর ন্যস্ত। ছাদের মধ্যে পদ্মকলি যার শিল্পকলা অদ্বিতীয়। মণ্ডপের গায়ে ১৬টী বিদ্যাদেবীর মূর্তি। তার আগে নব চৌকী ও গুহামণ্ডপ। এখান হতে মুখ্য দেবমূর্তির দর্শন করতে হয়। এর সামনে গর্ভগৃহ। সেখানে ঋষভদেবের ধাতু মূর্তি।

লুন বসই মন্দিরের মূল নায়ক নেমিনাথ। মন্দিরটী বাঘেল বংশীয় নৃপতি ধবলের মন্ত্রী তেজপাল ও বাস্তুপাল দ্বারা ১২৩২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। বিন্যাস ও রচনা অনেকটা বিমল বসই মন্দিরের অনুরূপ। এর অলঙ্করণ আরো সূক্ষ্ম ও সুন্দর।

জৈন মন্দির, রণকপুর, রাজস্থান

জৈন মন্দির, গিরনার, গুজরাট
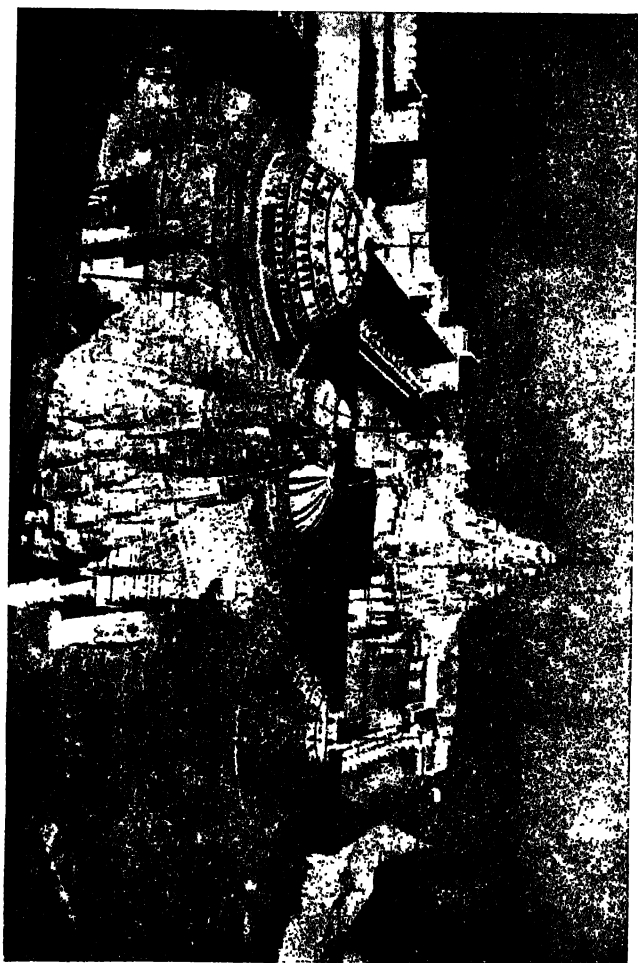
যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত গোড়বাড় জেলার রণকপুরের জৈন মন্দিরটীও সৌন্দর্যে অনন্য ও পৃথিবীখ্যাত। এই মন্দিরটী ৪০,০০০ বর্গ ফুটের ওপর অবস্থিত। এখানে ২৯টী মণ্ডপ ও ৪২০ থাম আছে। প্রত্যেকটী থামের আকার ও অলঙ্করণ ভিন্ন অথচ সুসমন্বিত। মন্দিরটী চতুর্মুখী। মধ্যের মুখ্য মন্দিরের চারদিকে চারটী শিখর এদের শিখর ছাড়াও মণ্ডপ ও আশে-পাশের ৮৬টী দেবকুলিকার পৃথক শিখর আছে। এজন্য দূর হতে মন্দিরটীকে ভারী সুন্দর দেখায়। মন্দিরেব সর্বত্র বৈচিত্র ও সামঞ্জস্য। গর্ভগৃহ স্বস্তিকাকার যার চারদিকে চারটী দরজা, মাঝখানে আদিনাথের চতুর্মুখ মর্মর মূর্তি। মন্দিরটী দ্বিতল। ওপরের তলা নীচের তলার মতো।

রাজস্থানের আর একটী দ্রষ্টব্য শিল্পকীর্তি চিত্তোড়ের কীর্তিস্তম্ভ। এর নির্মাতা ও নির্মাণকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে লেখ দৃষ্টে মনে হয় যে এটি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। স্তম্ভটী জৈন মন্দিরের সম্মুখের মানস্তম্ভ বিশেষ। উচ্চতা ৭৬ ফুট। নীচের ব্যাস ৩১ ও ওপরের ১৫ ফুট স্তম্ভটী সাততল বিশিষ্ট ও ওপরে গন্ধকুটীর মতো ছত্রী। স্তম্ভের চারদিকে আদিনাথ আদি তীর্থংকরের মূর্তি। এই কীর্তিস্তম্ভের অনুকরণে পরবর্তীকালে জয়স্তম্ভ রচিত হয়।

সৌরাষ্ট্রের শত্রুঞ্জয়ে (পালিতানা) একত্রে যত মন্দির আছে তত মন্দির একত্র বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এজন্য একে দেবনগরী বলা হয়। মন্দিরের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। তবে প্রাচীনতায় বিমল শাহ নির্মিত (১১ শতক) ও কুমার পাল নির্মিত (১২ শতক) মন্দিরই উল্লেখযোগ্য। তবে বিশালত্ব ও শিল্প দৃষ্টিতে বিমল বসই টুঁকের আদিনাথ মন্দিরের নাম করতে হয়। এই মন্দিরটী ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। চতুর্থ উল্লেখযোগ্য মন্দির চতুর্মুখ মন্দির। এটি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়।

সৌরাষ্ট্রের অন্য তীর্থক্ষেত্র গিরনার। গিরনারের প্রসিদ্ধ জৈন মন্দির ভগবান নেমিনাথের। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ৭০টী দেবকুলিকা আছে। মাঝখানে মূল মন্দির। মণ্ডপটী ভারী সুন্দর। মুখ্য মন্দিরের বিমানের শিখরের নিকট ছোট ছোট শিখর থাকায় মন্দিরটী দেখতে রমণীয়। এখানকার দ্বিতীয় বিখ্যাত মন্দির বাস্তুপাল নির্মিত মল্লিনাথ মন্দির।

উপরোক্ত জৈন মন্দির ছাড়া অনেক জৈন গুহা ও গুহামন্দির রয়েছে যা শিল্প দৃষ্টিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে তার সামান্য তালিকা উপস্থিত করছি। উড়িষ্যার উদয়গিরি-খণ্ডগিরি (খৃঃ পূঃ ২য় শতক), রাজগৃহের সোণভাণ্ডার, প্রয়াগ ও কৌশাম্বীর নিকটস্থ পভোসা, জুনাগড়ের বাবা প্যারামঠের নিকটস্থ গুহা, বেতোয়া নদীর ওপারের উদয়গিরি গুহা, শ্রবণ বেলগোলস্থিত ভদ্রবাহু গুহা, মহারাষ্ট্রের ওসমানাবাদের নিকটস্থ গুহা, পুডুকোট্টাই-এর নিকটস্থ সিত্তনবসল গুহা, বাদামীর জৈন গুহা, এলোরার গুহা (৮ম শতক), দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের নিকটস্থ গুহা, মনমাড়ের নিকটস্থ অঁকাই-তঁকাই গুহা ও গোয়ালিয়রের জৈন গুহা। এই সব গুহায় জৈন চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহুবিধ উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

পরেশনাথ শোভাযাত্রা

পরেশনাথ শোভাযাত্রার সঙ্গে কমবেশী সকলেই পরিচিত। এত বড় শোভাযাত্রা বছরের পর বছর এত জাঁকজমক সহ ও এত সুশৃঙ্খল ভাবে খুব কমই বার হয়। শুধু কলকাতায় নয়, এই শোভাযাত্রার খ্যাতি কলকাতার বাইরেও। তাই এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হতে অগণিত মানুষ কার্তিকী পূর্ণিমায় কলকাতায় সমবেত হয়। ভারতবর্ষে যে ক'টি শোভাযাত্রা বার হয় পরেশনাথ শোভাযাত্রা তার মধ্যে একটী।

এই শোভাযাত্রার ইতিহাস কম করেও দেড়শ বছরের। এর কারণ কটন স্ট্রীটের যে শান্তিনাথ মন্দির হতে এই শোভাযাত্রা বার হয় তার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেও সেখানে আদিনাথ ভগবানের বিগ্রহ গৃহ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই মনে হয় ১৮১৪ সাল বা তার কিছু আগে বা পরে হতে এই শোভাযাত্রা বার হওয়া সুরু হয়ে থাকবে। তবে ১৮২৬ সালে যে এই শোভাযাত্রা বার হয়েছিল তা নিশ্চিত। ১৮২৬ সালের মন্দিরের আয়-ব্যয়ের যে একটী খাতা খুঁজে পাওয়া গেছে তাতে এই শোভা-যাত্রার জন্য যা ব্যয় হয়েছিল তার হিসাব দেওয়া আছে। ব্যয়ের অঙ্ক আজ একেবারেই অবিশ্বাস্য—মাত্র ১৫৭৲ টাকা। কিন্তু সেকালের কলকাতা ও সেই সময়ের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

সেকালের সেই শোভাযাত্রার রূপ যদি কেউ দেখতে চান তবে তা দেখে আসতে পারেন রায় বদ্রীদাস বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত শীতলনাথ মন্দিরে। সেখানে এই শোভাযাত্রার একশ' বছর আগের একটী ছবি টাঙানো রয়েছে। চিত্রটা জয়পুরের প্রখ্যাত শিল্পী গণেশ মুসব্বর কর্তৃক অঙ্কিত। সেই চিত্রে সমসাময়িক ব্যক্তিদের সহজেই চিনে নেওয়া যায়।

যদিও এই শোভাযাত্রা সাধারণে পরেশনাথ শোভাযাত্রা নামেই পরিচিত তবু এই শোভাযাত্রার সঙ্গে পরেশনাথের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কি এই শোভাযাত্রায় তীর্থংকরের যে মূর্তি বহন করা হয় তা ভগবান

পার্শ্বনাথের নয়, ধর্মনাথের। অবশ্য ধর্মনাথের সঙ্গেও শোভাযাত্রার সাক্ষাৎ কোনো সম্পর্ক নেই। মুখ্যতঃ, এই শোভাযাত্রা চাতুর্মাস্যে এক স্থানে বাস করার পর তীর্থংকর যে বিহার করেন তারই প্রতীক এবং সেজন্য যে কোনো তীর্থংকরের প্রতিমা শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায়। এখানে ভগবান ধর্মনাথের প্রতিমা নেওয়া হয় এই মাত্র। ধর্মনাথ জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থংকরের ১৬ সংখ্যক তীর্থংকর।

দ্বিতীয়তঃ এই দিনটীতে প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেবের পৌত্র দ্রবিড় বালখিল্ল বহু সাধু সহ তীর্থরাজ সিদ্ধাচলে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই ঘটনার স্মৃতিতে আজো পালিতানায় ও অন্যত্র মেলা ও শোভাযাত্রা বার করা হয়। তবে কলকাতায় এই শোভাযাত্রা চাতুর্মাস্য শেষে তীর্থংকরের বিহারেরই প্রতীক। এই জন্যই এই শোভাযাত্রাকে জৈনরা 'রথযাত্রা' বা 'কার্তিক মহোৎসব' বলে অভিহিত করে থাকেন। চাতুর্মাস্য আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হতে আরম্ভ হয়ে কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় শেষ হয়। এই রথযাত্রা বা কার্তিক মহোৎসবকে যে পরেশনাথ শোভাযাত্রা বলে অভিহিত করা হয় তাতে মনে হয় পরেশনাথ বা ভগবান পার্শ্বনাথের নাম বাঙলা দেশে খুব জনপ্রিয়। তাই এখানে জৈনদের পাহাড় পরেশনাথ পাহাড় (জৈন নাম সম্মেত শিখর), জৈনদের প্রতিমা পরেশনাথ প্রতিমা, জৈনদের শোভাযাত্রা পরেশনাথ শোভাযাত্রা।

প্রসঙ্গতঃ হিন্দুধর্মে যে রথ যাত্রার উৎসব দেখা যায় তা পুরীর জগন্নাথ দেবের নামের সঙ্গে যুক্ত। উড়িষ্যা বিধান পরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসের অভিমত এই যে পুরীর জগন্নাথ মন্দির এক কালে জৈন মন্দির ছিল * ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থানের সময় এই মন্দিরটী হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই কারণ দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দির যা এক কালে জৈন মন্দির ছিল তা পরবর্তীকালে প্রখ্যাত হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। ঘরের কাছের কথাই ধরা যাক। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর, কি বাঁকুড়ার এগতেশ্বর শিব মন্দির এক কালে জৈন মন্দির ছিল। তাই প্রশ্ন জাগে পুরীতে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা কি জৈন রথযাত্রার স্মৃতিকেই বহন করে?

---

* অখিল ভারতীয় প্রবাসী উৎকল কনফারেন্স স্মারিকা, ১৯৫৯ দ্রষ্টব্য।

পরেশনাথ শোভাযাত্রা, গণেশ মুসব্বর কর্তৃক অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র
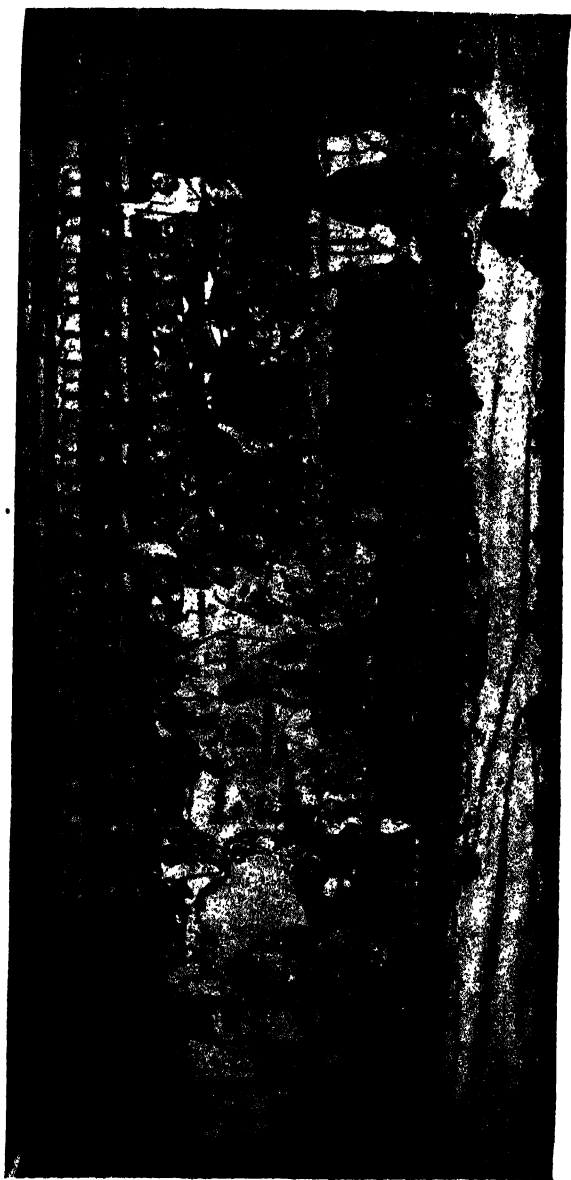
সে যা হোক, তীর্থংকরের চাতুর্মাস্য শেষের বিহার বলেই তীর্থংকরের আগে আগে যেমন ইন্দ্রধ্বজা গমন করে, এই শোভাযাত্রাতেও তাই প্রথমে ইন্দ্র ধ্বজা নিয়ে যাওয়া হয়। ইন্দ্রধ্বজা যেমন বড় তেমনি সুন্দর। মূলদণ্ডের গায়ে ছোট ছোট অসংখ্য পতাকা গোঁজা থাকে। দূর হতে দেখলে মনে হয় যেন দীর্ঘ এক চীড় গাছ। ইন্দ্রধ্বজা এত বড় যে ট্রামলাইন পেরুবার সময় ওপরের তার খুলে দিতে হয়। না খুলে উপায়ই বা কী? কারণ যখন ইন্দ্রধ্বজা তৈরী হয়েছিল তখন মাথার ওপর না ছিল তার না ট্রামের লাইন। আর এখন তার রয়েছে বলেত ইন্দ্রধ্বজাকে ছোট করা যায় না? তা হয় খুবই অশাস্ত্রীয়। ইন্দ্রধ্বজাকে আবার নোয়ানো যায় না।

ইন্দ্রধ্বজার পর শোভাযাত্রায় থাকে নহবৎখানা। দেবরাজ ইন্দ্র তীর্থংকরের শোভাযাত্রায় যে ধরণের নহবৎখানা নিয়ে যেতেন তারই অনুকরণে। নহবৎখানার চন্দ্রাতপের তলায় যন্ত্রবাদকেরা বসে। চারদিকে নৃত্যরতা অপ্সরা।

নহবৎখানার পর ঘীয়ের প্রদীপ।

তারপর পুষ্পগৃহ। পুষ্পগৃহ বা বিমান কুবেরের নিলয়। তাই নানাবর্ণের নানা গন্ধের ফুল দিয়ে সুশোভিত। এইটাই লক্ষ্মীর আবাস স্থান। কারণ দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ হলেন কুবের।

পুষ্পগৃহের পর ইন্দ্রবাহন ঐরাবত। ঐরাবতের চারটী দাঁত রয়েছে ও গায়ের রঙ্ সাদা। ঐরাবত নিয়ে যাবার কারণ তীর্থংকরের শোভাযাত্রায় ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে আগে আগে যান। তাই ঐরাবত ইন্দ্রের প্রতীক।

ঐরাবতের পর মেরুপর্বত। জৈনশাস্ত্রানুসারে তীর্থংকরের জন্মের পর ইন্দ্র নব জাতককে মেরু পর্বতে নিয়ে যান ও সাত সাগরের জল দিয়ে তাঁকে স্নান করান। মেরুপর্বত তাই এই শোভা যাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়। মেরুপর্বত দেখতে অনেকটা স্তম্ভাকৃতি।

তারপর স্বপ্ন। তীর্থংকরের মা ভাবী জাতক যখন গর্ভে প্রবেশ করে তখন যে চৌদ্দটী স্বপ্ন দেখেন সেই স্বপ্ন: হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য, ধ্বজ, কলস, পদ্মসরোবর, দেববিমান, রত্ন ও অগ্নিশিক্ষা। এই স্বপ্ন তাই জৈনদের কাছে শুভ ও মাঙ্গলিক।

স্বপ্নের পর লেশ্যা বৃক্ষ। লেশ্যার অর্থ রঙ বা বর্ণ। জীব যে ধরণের কর্ম করে তার সেই ধরণের রঙ বা বর্ণ হয়। এই রঙ বা বর্ণ চর্ম চোখে দেখা যায় না। তাই একে আত্মার বিভিন্ন অবস্থাও বলা যেতে পারে। জৈন মতে লেশ্যা ছ'টি। যেমন, কৃষ্ণ, নীল, কাপোত, তেজ, পদ্ম ও শুভ্র। লেশ্যা বৃক্ষের মাধ্যমে এই বিভিন্ন লেশ্যার তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। রূপকটী এই: একটী গাছে ফল ধরেছে। যে কৃষ্ণ লেশ্যার মানুষ সে ফলের জন্য গাছটীকে মূল হতে উৎপাটিত করবে। নীল লেশ্যার মানুষ গাছটীকে মূল হতে উৎপাটি না করে কেবল ডাল পালা ভেঙে নেবে। তেজ লেশ্যার মানুষ ডাল ভাঙবে না কেবলমাত্র ফল আহরণ করবে। পদ্ম লেশ্যার মানুষ সমস্ত ফল আহরণ করবে না, কেবলমাত্র যে ফল পাকা তাই আহরণ করবে। আর যে শুক্ল লেশ্যার মানুষ সে গাছ হতে ভেঙে ফল নেবেনা; যে ফলটী বোঁটা হতে আলগা হয়ে মাটীতে এসে পড়েছে মাত্র সেই ফলটী নেবে। এই রূপকে আত্মার নিম্নতম অবস্থা হতে উচ্চতম অবস্থার কথা বলা হয়েছে। যে মূল শুদ্ধ গাছটিকে উৎপাটিত করছে সে গাছের প্রতিই যে নিষ্ঠুর আচরণ করছে তা নয়। তীর্যক এমন কী তার স্বজাতি মানুষকেও সেই ফল হতে সে বঞ্চিত করছে। স্বার্থান্ধতার কী ভীষণ পরিণাম! মানুষ যদি গাছ যেটুকু স্বেচ্ছায় তাকে দান করছে তাই গ্রহণ করত তবে পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠত। সে হত স্বার্থহীন শোষণহীন সমাজ—যার স্বপ্ন যুগে যুগে ভাবুক মনকে আন্দোলিত করেছে। লেশ্যা বৃক্ষের দৃষ্টান্তে মানুষ যেন শুক্ল লেশ্যার মানুষ হবার চেষ্টা করে।

লেশ্যা বৃক্ষের পর কল্পবৃক্ষ। কল্পবৃক্ষের কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। আদি তীর্থংকর ভগবান ঋষভ দেবের পূর্বে এই কল্পবৃক্ষই মানুষে সবরকম চাহিদা মেটাত। ক্রমে যখন এই কল্পবৃক্ষ লোপ পায়, মানুষ যখন খাদ্যের জন্য আতুর হয়ে ওঠে তখন ঋষভদেব তাদের চাষবাস শিক্ষা দেন।

সব শেষে 'সমবসরণ'। তীর্থংকর যখন কেবল জ্ঞান লাভ করেন দেবরাজ ইন্দ্র তখন এক ধর্ম সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় দেব, নারক, মানুষ ও তীর্যক পশুপক্ষীর বসবার ব্যবস্থা থাকে। সেখানে উচ্চ মঞ্চ থেকে তীর্থংকর

উপদেশ দেন। তারই প্রতীক রূপে দোলায় তীর্থংকর মূর্তি বহন করা হয়।

শোভাযাত্রার এই প্রধান অঙ্গ। নিশানবাহী, আশসোটাবাহী, ভজন-মণ্ডলী এ সবত আছেই। তাছাড়া কয়েক বছর হতে ভগবান মহাবীরের উপসর্গের দুটো প্রতিকৃতি বহন করা হয়। উপসর্গ অর্থ উৎপাত। সাধন অবস্থায় তীর্থংকরকে যে দৈব, প্রাকৃতিক বা মানুষের কৃত উৎপাত সহ্য করতে হয় তাই। শোভাযাত্রায় মহাবীরের ওপর দৃষ্টি-বিষ সাপের আক্রমণ ও গোপের দ্বারা কানে শলাকা প্রবেশের দুটো প্রতিকৃতি দেখানো হয়েছে। আশ্চর্য মহাবীরের ধৈর্য, ক্ষমা ও তিতিক্ষা। কোনো কিছুতেই তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে সমর্থ হয় নি। এর কারণ সমদৃষ্টি। অহিংসায় মহাবীর রাগ ও দ্বেষকে নির্জিত করেছিলেন।

কার্তিক মহোৎসবে জৈনরা তাই যেমন যাঁরা রাগ ও দ্বেষ জয় করেছিলেন তাঁদের স্মরণ করেন, তেমনি রাগ ও দ্বেষকে জয় করবার সঙ্কল্পও মনে মনে গ্রহণ করেন। দেহ রথ, আত্মা রথী, সেই আত্মাকেই উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়াতেই রথযাত্রা বা কার্তিক মহোৎসবের সার্থকতা।

পুস্তক পরিচয়

১। *Catalogue of Manuscripts in Sri Hemacandracarya Jain Jnan Mandir, Vol. I.—Paper Manuscripts* : সংগ্রাহক মুনি পুণ্যবিজয়জী : প্রকাশক শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য জৈন জ্ঞান মন্দির, পাটন, ১৯৭২ : পৃষ্ঠা ১১+৬৩১ : মূল্য ৫০·০০ টাকা।

২। *New Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts —Jesalmer Collection* : সংগ্রাহক মুনি পুণ্যবিজয়জী : প্রকাশক এল. ডি. ইন্সটিট্যুট, আমেদাবাদ, ১৯৭২ : পৃষ্ঠা ৩৫+৪৭১ : মূল্য ৪০·০০ টাকা।

ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসের অনুশীলনে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির মূল্য অনেক। সুখের বিষয় নানা সময়ের এই ধরণের হস্তলিখিত পুঁথি জৈন মন্দির বা উপাশ্রয় সংলগ্ন 'জ্ঞান-ভাণ্ডারে' আজো সুরক্ষিত রয়েছে। এই সব জ্ঞান ভাণ্ডারে কেবলমাত্র ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত পুঁথিই যে সংগৃহীত রয়েছে তা নয়; ন্যায়, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি গ্রন্থও রয়েছে এবং কেবলমাত্র জৈন গ্রন্থই নয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থও সেখানে সংগৃহীত। উনবিংশ শতকে য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় ও এ সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বহু ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদেরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন ও প্রাচীন পুঁথির সন্ধান সংগ্রহ সূচীপ্রণয়ন ও প্রকাশে অগ্রসর হন। এইসব ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতদের মধ্যে স্বর্গত মুনি পুণ্যবিজয়জীর নাম সর্বাগ্রে মনে আসে। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির তালিকা প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দবোধ করছি। যাঁরা প্রাচ্যবিদ্যা নিয়ে আলোচনা, অধ্যয়ন ও গবেষণাদি করেন তাঁদের এই দুইখানি পুঁথির তালিকা নানাভাবে সাহায্য করবে বলেই মনে হয়। প্রথম তালিকায় ১৪৭৮৯ ও দ্বিতীয় তালিকায় ২৬৯৭টি পুঁথির নাম দেওয়া হয়েছে।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

Vol. I. No. 7 : Sraman : October 1973
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১.	সাতটী জৈন তীর্থ	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩০.০
২.	অতিমুক্ত	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৪.০০
৩.	শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩.০০
৪.	শ্রাবককৃত্য	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	নিঃশুল্ক

हिन्दी

१ श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला
—श्री कान्तिसागरजी महाराज ५.००

२ श्रीमद् देवचन्द्रकृत अध्यात्मगीता
—श्री केशरीचन्द धूपिया .७५

English

1. Bhagavati Sutra Vol. I (Satak 1-2) (Text with English Translation) —Sri K. C. Lalwani 40.00
2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha, tr. by Sri Ganesh Lalwani .75
3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani .50

আশ্বিন ১৩৮১

দ্বিতীয় বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৮১ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

তীর্থংকর শান্তিনাথ

পাকভিরা, খৃষ্টীয় ১১ শতক

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

সংগমক পরাভূত হয়েছেন, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। মরুর মতো বর্দ্ধমানের ধৈর্য, সাগরের মতো বর্দ্ধমানের গম্ভীরতা। কিন্তু পরাভূত হয়ে সংগমক এখন কোন মুখে স্বর্গে ফিরে যাবেন? ফিরে যাবার সেই লজ্জাই যেন তাঁকে বর্দ্ধমানের প্রতি আরো অকরুণ করে তুলেছে। বর্দ্ধমানকে অপদস্থ করবার জন্য তিনি তাই বদ্ধপরিকর হলেন।

বর্দ্ধমান বালুকা হয়ে এসেছেন সুযোগ, তারপর সুচ্ছেত্তা, মলয়, হস্তীশীর্ষ আদি স্থান হয়ে তোসলি গ্রাম। তোসলি গ্রামে তিনি যখন এক বৃক্ষমূলে ধ্যানারূঢ় হয়েছেন তখন সংগমক গ্রামে গিয়ে গ্রামীণের ঘরে সিঁধ দিতে আরম্ভ করলেন।

সংগমক লোক দেখিয়েই সিঁধ দিতে গিয়েছিলেন তাই সহজেই ধরা পড়ে গেলেন। ধরা পড়ে যখন মার খেতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা কেন অনর্থক আমাকে মারছ। আমি আমার গুরুর আদেশে সিঁধ দিতে এসেছিলাম। এতে আমার কী দোষ?

লোকেরা তখন তাঁর নির্দেশ মতো বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল ও তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল চড় লাথি ঘুষি যখন নিঃশেষ হল তখন তাঁকে বেঁধে আরক্ষালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। এমন সময় সেখানে এসে পড়লেন ঐন্দ্রজালিক মহাভূতিল। মহাভূতিল বর্দ্ধমানকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন, এঁকে কেন তোমরা বাঁধছ। এঁর সমস্ত গায়ে রাজচক্রবর্তীত্বের লক্ষণ। তাই মনে হয় ইনি ধর্মচক্রবর্তী। ইনি কখনো চোর নন্।

সেকথা শুনে তারা লজ্জিত হয়ে সংগমকের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু সংগমক ততক্ষণে অন্তর্দ্ধান করেছেন।

বর্দ্ধমান তোসলি হতে এলেন মোসলি। মোসলিতেও বর্দ্ধমান যখন ধ্যানমগ্ন হয়েছেন তখন সংগমক তাঁর পাশে সিঁধ কাটবার যন্ত্রাদি রেখে সরে পড়লেন।

আরক্ষকেরা তাঁর কাছে সিঁধ কাটবার যন্ত্রাদি পেয়ে তাঁকে ধৃত করে রাজ সভায় উপস্থিত করল।

সেই সময় রাজ সভায় সুমাগধ নামে এক রাষ্ট্রীয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজা সিদ্ধার্থের মিত্র ছিলেন। বর্দ্ধমানকে দেখা মাত্রই তাই তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন ও রাজাকে তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করিয়ে দিলেন।

বর্দ্ধমান মোসলি হতে আবার এলেন তোসলি। তোসলিতে এবার সংগমকের চক্রান্তে আরক্ষকদের হাতে ধৃত হলেন। তারা তাঁকে ক্ষত্রিয়ের কাছে প্রেরণ করল। ক্ষত্রিয় যখন নানা ভাবে প্রশ্ন করেও কোনো প্রত্যুত্তর পেলেন না তখন তাঁকে চোর ভেবে ফাঁসীর সাজা দিলেন।

বর্দ্ধমানকে ফাঁসীর মঞ্চে তুলে দেওয়া হল। কিন্তু যতবারই তাঁর গলায় ফাঁস পরান হয় ততবারই তা ছিঁড়ে যায়। এ ভাবে এক আধবার নয়, সাত সাত বার। রাজপুরুষেরা সেকথা ক্ষত্রিয়কে গিয়ে নিবেদন করল। ক্ষত্রিয় তখন তাঁর মুক্তির আদেশ দিলেন।

তোসলি হতে বর্দ্ধমান গেলেন সিদ্ধার্থপুর। সেখানেও তিনি চোর অপবাদে ধৃত হলেন কিন্তু অশ্ববণিক কৌশিক তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে মুক্ত করিয়ে নিল।

সংগমক যখন এভাবে তাঁকে পর্যুদস্ত করতে পারলেন না তখন ভিন্ন পথ নিলেন। বর্দ্ধমান যখন যেখানে ভিক্ষে করতে যান, সংগমক তাঁর আগে আগে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। বর্দ্ধমানকে শ্রমণ ধর্মের নিয়মানুযায়ী তাই ভিক্ষে না নিয়েই সেখান হতে ফিরে যেতে হয়। এভাবে এক আধ দিন নয় দীর্ঘ ছ'মাস তিনি কোথাও ভিক্ষে গ্রহণ করতে পারলেন না।

ব্রজগ্রামে সেদিন ভিক্ষা গ্রহণ করতে গেছেন। গিয়ে দেখেন সংগমক সেখানে আগে হতেই উপস্থিত।

বর্দ্ধমান যখন ভিক্ষা না নিয়েই সেখান হতে ফিরে যাচ্ছেন তখন সংগমক

তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে নমস্কার করে বললেন: দেবার্য, ইন্দ্র আপনার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন--আপনার মতো ধ্যানী বা ধীর নেই, তা অক্ষরশঃ সত্যি। আমি এতদিন আপনাকে নানাভাবে উত্যক্ত করেছি, আপনার ধ্যান ভাঙবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। বাস্তবে আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ, আমি ভগ্ন প্রতিজ্ঞ। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর বাধা দেব না। আপনি ভিক্ষেয় যান।

বর্দ্ধমান সেদিনো ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে গেলেন। পরদিন এক গ্রাম-বৃদ্ধার হাতে পায়সান্ন গ্রহণ করে দীর্ঘ ছ'মাসের উপবাস ভঙ্গ করলেন।

ব্রজগ্রাম হতে অলংভিয়া, সেয়বিয়া হয়ে তিনি এলেন শ্রাবস্তী। তারপর কৌশাম্বী বারাণসী, রাজগৃহ ও মিথিলা হয়ে বৈশালী। বৈশালীর বাইরে সমরোদ্যান বলে যে উদ্যান ছিল সেই উদ্যানে বলদেব মন্দিরে অবস্থান করলেন। বৈশালীতেই তিনি এবারের বর্ষাবাস ব্যতীত করবেন।

বৈশালীতে থাকেন শ্রেষ্ঠী জিনদত্ত। জিনদত্তের এখন পূর্বের সে সমৃদ্ধি নেই। তাই সকলে তাঁকে জিন শ্রেষ্ঠী না বলে, বলে জীর্ণ শ্রেষ্ঠী। কিন্তু সে যা হোক, জিন শ্রেষ্ঠী ছিলেন খুবই সরল ও শ্রদ্ধাবান। বর্দ্ধমান তাই যখন সমরোদ্যান উদ্যানে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি প্রতিদিন এসে তাঁর বন্দনা করে যেতেন ও তাঁকে তাঁর ঘরে ভিক্ষা নেবার জন্য আমন্ত্রণ করতেন।

বর্দ্ধমানের চাতুর্মাসিক তপ ছিল। তাই তিনি ভিক্ষা নিতেই যান না। তাছাড়া শ্রমণকে আমন্ত্রিত হয়ে ভিক্ষা নিতে যেতে নেই।

বর্দ্ধমানকে ভিক্ষা নিতে নগরে যেতে না দেখে জিন শ্রেষ্ঠী ভাবলেন, বর্দ্ধমানের হয়ত মাসিক তপ রয়েছে। তাই মাসান্তে তিনি বর্দ্ধমানকে তাঁর ঘরে ভিক্ষা গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কিন্তু বর্দ্ধমান সেদিন ও তারপরেও ভিক্ষাচর্যায় গেলেন না।

জিন শ্রেষ্ঠী তখন ভাবলেন, বর্দ্ধমানের হয়ত দ্বিমাসিক তপ রয়েছে।

এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ মাসও অতীত হয়ে গেল। চাতুর্মাস্যের শেষের দিন জিন শ্রেষ্ঠী আবার তাঁর প্রার্থনা জানালেন ও নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করে রইলেন।

বর্দ্ধমান সেদিন ভিক্ষায় গেলেন—কিন্তু জিন শ্রেষ্ঠীর ঘরে গেলেন না,

অভিনব শ্রেষ্ঠীর ঘরে ভিক্ষা নিয়ে তিনি তাঁর অবস্থান স্থানে ফিরে এলেন। অভিনব শ্রেষ্ঠীর দাসী দারুহস্তকে করে তাঁকে কলাই সেদ্ধ ভিক্ষা দিল। তিনি তাই গ্রহণ করে তাঁর চাতুর্মাসিক তপের পারণ করলেন।

জিন শ্রেষ্ঠী যখন সেকথা জানতে পারলেন তখন মনে মনে একটু দুঃখিত হলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত যখন তিনি বুঝতে পারলেন বর্দ্ধমান কেন তাঁর ঘরে ভিক্ষা নিতে আসেন নি।

বর্দ্ধমান বৈশালী হতে এলেন সুংসুমারপুর। সুংসুমারপুর হতে ভোগপুর। তারপর নন্দীগ্রাম, মেঁঢ়িয়গ্রাম হয়ে কৌশাম্বী।

কৌশাম্বীতে বর্দ্ধমান এক ভীষণ অভিগ্রহ গ্রহণ করলেন। অভিগ্রহ অর্থ মানসিক সঙ্কল্প—যে সঙ্কল্প পূর্ণ হলে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন, নইলে নয়। সে অভিগ্রহ মুণ্ডিত মাথা, হাতে কড়া পায়ে বেড়ী, তিন দিনের উপবাসী দাসত্ব প্রাপ্ত কোনো রাজকন্যা ভিক্ষার সময় অতীত হয়ে গেলে কুলোর প্রান্তে কলাই সেদ্ধ নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁকে যদি ভিক্ষে দেয় তবেই তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন।

কিন্তু এধরণের অভিগ্রহ সহজেই পূর্ণ হবার নয়। তাই বর্দ্ধমান রোজই নগরে ভিক্ষায় যান আর রোজই ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে আসেন।

একদিন বর্দ্ধমান ভিক্ষা নেবার জন্য এসেছেন কৌশাম্বীর অমাত্য সুগুপ্তের ঘরে। সুগুপ্তের স্ত্রী নন্দা নিজের হাতে পরমান্ন সাজিয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে এলেন। কিন্তু বর্দ্ধমান সে ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে গেলেন।

নন্দা জৈন শ্রাবিকা ছিলেন। তাই মনে মনে দুঃখিতা হলেন ও নিজের মন্দ ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

নন্দাকে বিষাদগ্রস্তা দেখে তাঁর পরিচারিকা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, দেবী, উনি ভিক্ষা নেননি বলে আপনি দুঃখিত হবেন না। উনি প্রতিদিনই নগরে ভিক্ষাচর্যায় আসেন আর প্রতিদিনই ভিক্ষা না নিয়ে ফিরে যান।

সেকথা শুনে নন্দা বুঝতে পারলেন বর্দ্ধমানের এমন কোনো অভিগ্রহ রয়েছে যা পূর্ণ না হবার জন্য তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন না।

কিন্তু কি সে অভিগ্রহ?

সে অভিগ্রহের কথা কারু জানবার উপায় নেই। বর্দ্ধমান সে অভিগ্রহের কথা নিজে হতে কাউকে বলবেন না।

সুগুপ্ত তাই ঘরে আসতেই নন্দা তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। বললেন, তোমার বুদ্ধিচাতুর্যে ধিক যদি তুমি তাঁর কী অভিগ্রহ তা না জানতে পার। তোমার অমাত্য পদে অভিষিক্ত থাকাও বৃথা যদি না কৌশাম্বীতে বর্দ্ধমান ভিক্ষা পান।

যখন তাঁদের মধ্যে এই কথা হচ্ছিল তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিল রাণী মৃগাবতীর দূতী বিজয়া। বিজয়া সেকথা গিয়ে মৃগাবতীকে নিবেদন করল। মৃগাবতী শতানীককে বললেন। বললেন, বর্দ্ধমান আজ কয়েকমাস ধরে নগরে ভিক্ষাচর্যায় আসছেন কিন্তু ভিক্ষা না নিয়েই ফিরে যাচ্ছেন। অথচ তিনি কেন ভিক্ষা নিচ্ছেন না—সেকথা কারু মনে এল না, বা তাঁর কী অভিগ্রহ তাও জানা গেল না।

শতানীক সুগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন। সুগুপ্ত তথ্যবাদী পণ্ডিতদের। তাঁরা অনেক শাস্ত্র মন্থন করে সেখানে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব বিষয়ক যে সব অভিগ্রহের কথা লিপিবদ্ধ আছে ও সাত রকমের যে পিণ্ডৈষণা ও পানৈষণা তা নিরূপিত করে শ্রমণদের আহার ও জল দেবার যে রীতি তা বিবৃত করলেন। রাজাও সেই তথ্য নগরে প্রচারিত করে দিলেন ও সেই ভাবে বর্দ্ধমানকে ভিক্ষা দিতে বললেন। কিন্তু বর্দ্ধমান তবু ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না।

সেই অভিগ্রহ নেবার পর ছ'মাস প্রায় অতীত হতে চলেছে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী। বর্দ্ধমান সেদিন ভিক্ষায় এসেছেন শ্রেষ্ঠী ধনবাহের ঘরে।

না ঘরের মধ্যে না ঘরের বাইরে ঠিক দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মলিন বসনা একটী মেয়ে। মুণ্ডিত যার মাথা, হাতে হাত কড়া, পায়ে বেড়ী। হাতে কুলোর কোণে রাখা সেদ্ধ কলাই। ভাবনায় বিভোর। বর্দ্ধমানের ওপর চোখ পড়তেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

উৎফুল্ল হয়ে উঠল কারণ সে মনে মনে তাঁরই আগমন প্রতীক্ষা করছিল। ভাবছিল, আজ তিন দিনের আমার উপবাস। এই সময় যদি তিনি আসেন তবে তাঁকে ভিক্ষা দিয়ে আমি আহার গ্রহণ করি।

মেয়েটী তাই উদ্ভাসিত মুখে স্খলিত পায়ে বর্দ্ধমানকে ভিক্ষা দিতে এলো।

বর্দ্ধমান ভিক্ষা নেবার জন্য হাত দুটি প্রসারিতও করেছিলেন কিন্তু তখুনি আবার তা গুটিয়ে নিলেন।

তবে কি তার অন্তরের প্রার্থনা বর্দ্ধমানের কানে পৌঁছয় নি—না তার হৃদয়ের আকুতি?

মুহূর্ত মাত্রই। মুহূর্তের মধ্যে নামল মেয়েটীর চোখ বেয়ে শ্রাবণের অজস্র বন্যা। অঝোর ধারায়। সেই জলের ধারায় তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। সব আজ তার ব্যর্থ। তার জীবন, তার প্রতীক্ষা, তার প্রার্থনা, সব। সে কি এতই ভাগ্যহীনা যে তার হাতে শ্রমণ বর্দ্ধমানও ভিক্ষা গ্রহণ করলেন না।

কিন্তু না। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সে দেখল বর্দ্ধমান যেন থমকে দাঁড়ালেন। তারপর এক এক পা করে এগিয়ে এলেন। আবার হাত দুটো প্রসারিত করলেন তার সামনে। না, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। সে কম্পিত হাতে কুলোর কোণে রাখা সেই কলাই সেদ্ধর সমস্তটা বর্দ্ধমানের হাতে ঢেলে দিল।

[ক্রমশঃ

প্রাচীন বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রভাব

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে অংশ 'প্রাচ্যদেশ' বলে পরিচিত ছিল, আজকের পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উত্তর প্রান্তের জেলাগুলি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলকে সেই ভূখণ্ডের অন্তর্ভূত বলা চলে। এই 'প্রাচ্যদেশে'র আর্যীকরণ যে জৈন ধর্মের দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল সেকথা বলেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর। 'প্রাচ্যদেশে'র অব্যবহিত পশ্চিমে অবস্থিত মগধ যে পুরাকালে জৈনধর্মের পীঠস্থান ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিংবদন্তী ও প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, মোট চব্বিশজন জৈন তীর্থংকরের মধ্যে অন্ততঃ কুড়িজনই সেখানে আবির্ভূত, কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত ও তিরোহিত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি ছাড়াও, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মিডিভ্যাল্ স্কাল্পচারস' গ্রন্থে বলেছেন, বহুসংখ্যক জৈন মন্দির ও জৈন মূর্তি প্রাপ্তির ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে ধানবাদ-বরাকর থেকে শুরু করে উড়িষ্যা ও রেওয়া এলাকা অবধি জৈনধর্ম একদা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর মতে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তখন লোকবসতি ছিল খুবই ঘন এবং সে জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল জৈনধর্মাবলম্বী। এই সিংভূম-মানভূম-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে পাল যুগের পূর্বের প্রত্নতাত্ত্বিক নজির বিশেষ কিছু না পাওয়া গেলেও, সে যুগে বা তার পরবর্তীকালের যেসব স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে জৈন নিদর্শনের সংখ্যা অগণিত। সে কেন্দ্রভূমি থেকে জৈন ধর্মের প্রভাব যে অব্যবহিত পূর্বের বাংলাদেশকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকবে এমন অনুমান কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

'প্রাচ্য দেশে' আদি জৈন ধর্মের প্রতিপত্তির মূল কারণ এই যে আর্য সভ্যতা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে জৈন ধর্মই এই অনগ্রসর অঞ্চলে সব চেয়ে প্রথমে প্রবেশ লাভ করেছিল। আর্যাবর্তের সীমারেখার বাইরে পূর্ব ভারতের এই অঞ্চল তখন ছিল অনেকাংশে অরণ্যাবৃত এবং অশ্রীক ও

দ্রাবিড়বংশীয় জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। অস্ট্রীকেরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এ-অঞ্চলের আদিবাসী, আর দ্রাবিড়বংশীয়দের কিছু অংশ যে আর্য-অভিযানের অগ্রগতির চাপে পশ্চাদপসরণ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এই অরণ্য অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন সেকথা স্বীকৃত। আর্যদের কাছে এই ভূভাগ তখন ছিল এক পাণ্ডববর্জিত দেশ।যেখানে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। ফলে, আর্য-বৌদ্ধ অথবা আর্য-হিন্দু সভ্যতার এই দূরবর্তী এলাকায় এসে পৌঁছতে বেশ বিলম্ব হয়েছিল এবং সে অনুপ্রবেশ পরেও এ-অঞ্চলের সর্বত্র বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু তার পূর্বেই, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, জৈনধর্ম বাহিত হয়ে আর্য সভ্যতার প্রথম তরঙ্গগুলি এই ভূখণ্ডের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। জৈন সাহিত্যের অতি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্র' যে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের আগেই অনেকাংশে রচিত হয়েছিল, অধ্যাপক জেকোবি সেকথা সম্যকভাবেই প্রমাণ করেছেন। সে-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শেষতম জৈন তীর্থংকর মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করবার পূর্বে কিছুকাল 'প্রাচ্যদেশে'র সুব্বভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে-সব প্রদেশের অধিবাসীরা তখন ছিল খুবই অনুন্নত। মহাবীরের উপর তারা ঢিল ছুঁড়েছিল, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল ও আরও নানাবিধভাবে তাঁর উপর অত্যাচার করেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মহাবীরের জীবদ্দশার কালকে খৃঃ পূঃ ৫৪০ থেকে ৪৬৮ সাল বলে নির্ণয় করেছেন। 'আচারাঙ্গ সূত্রে'র নজিরে প্রমাণ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকেও প্রাচীন বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চলে আর্য-সভ্যতা ছাড়পত্র পায়নি। কিন্তু জৈন ধর্ম প্রচারকেরা স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে বিরূপ অভ্যর্থনা সত্ত্বেও তাঁদের ধর্ম প্রচার থেকে বিরত হননি। কেননা, মহাবীরের দেহত্যাগের দু' তিন শ' বছরের মধ্যেই জৈন ধর্মের প্রভাব বঙ্গদেশের দূর দূরান্তরে বিশেষভাবে অনুভূত হতে আরম্ভ করে। ১৩৪৬ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ' নামক প্রবন্ধে ডক্টর প্রবোধ চন্দ্র বাগচী বলছেন—"বঙ্গদেশে জৈনধর্ম অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আর উত্তরবঙ্গে যে সে-সম্প্রদায়ের প্রভাব খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবল

ছিল তার প্রমাণ হিউয়েন-সাংয়ের বিবরণী থেকে পাওয়া যায়। তাঁর সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নিগ্রন্থদের সংখ্যা ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশী।"

নিগ্রন্থদের, অর্থাৎ প্রাচীন জৈনদের, সমাবেশ যে শুধু পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; উত্তর বঙ্গের কোটিবর্ষ ও দক্ষিণ বঙ্গের তাম্র-লিপ্তিতেও তাঁদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। জৈন 'কল্পসূত্র' ও বৌদ্ধ 'বোধিসত্ত্ব-কল্পলতা', 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায় খৃঃ পূঃ যুগেই পুণ্ড্রনগর 'প্রাচ্যদেশে' জৈনধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। জৈন কল্পসূত্রে 'গোদাস-গণ' সম্প্রদায়ের প্রথম শাখাকে কোটিবর্ষ নগরে অবস্থানকারী কোটিবর্ষীয় বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাম্রলিপ্তিতে বসবাসকারী দ্বিতীয় শাখার নামকরণ করা হয়েছে তাম্রলিপ্তীয় বলে। বঙ্গদেশে আর্য-সংস্কৃতির এগুলি প্রথম অনুপ্রবেশ; কেননা, সেই দূর অতীতে আর্য-বৌদ্ধ বা আর্য-হিন্দু সংস্কৃতির কোন প্রবাহ এ-অঞ্চলে এসে পৌঁছয় নি। এক কথায় এই ঘটনার সমীক্ষা করে রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বলেছেন: 'প্রাচ্যদেশে' জৈন ধর্ম দ্বারাই আর্যীকৃত হয়েছিল।

জৈন ধর্মের প্রথম তরঙ্গ অতি প্রাচীনকালেই বঙ্গদেশে এসে পৌঁছলেও খৃঃ অষ্টম-নবম শতাব্দী নাগাদ একমাত্র রাঢ় ভূখণ্ড ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ ধর্মের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, পাল রাজবংশ ধর্ম বিষয়ে মোটামুটি উদার মতাবলম্বী হলেও বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশব্যাপী পুনরুত্থানও বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের অবনতির অন্যতম কারণ। রাঢ়দেশ, বিশেষ করে সেখানকার বিস্তীর্ণ অরণ্যাবৃত অঞ্চলে, পাল রাজশক্তি কখনও পুরাপুরিভাবে কর্তৃত্বলাভ করেনি। অতএব, পাল যুগে পশ্চাদপসরণকারী আশ্রয়প্রার্থী জৈন ধর্ম অপেক্ষা-কৃত নিরাপদ এই ভূভাগেই নিজ প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করে। আগেই বলেছি, এ অঞ্চলের অব্যবহিত পশ্চিমে পুরাকালের জৈন ধর্ম একদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আজকের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় এবং বিহারের অন্তর্গত সংলগ্ন অঞ্চলে সেজন্য প্রভূত পরিমাণে জৈনমূর্তি ও মন্দিরাদির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অবিষ্কৃত হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে, ১৮৭২-৭৩ খৃঃ আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের মিঃ

বেগলার এই অঞ্চলের দূরদূরান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ কানিংহাম এর 'আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টে'র অষ্টম খণ্ডে সবিস্তারে উল্লিখিত আছে। তা থেকে দেখা যায়, বেগলারের আবিষ্কৃত পুরাকীর্তিগুলির অধিকাংশই জৈন। পুরুলিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সুবর্ণ-রেখার তীরে তুলমি গ্রামে মিঃ বেগলার বহু জৈন মূর্তি ও মন্দিরের অবশেষ এবং একটি ভগ্ন দুর্গ আবিষ্কার করেন। সেখান থেকে বারো মাইল দূরে দেউলি গ্রামে কয়েকটি জৈন মন্দির ও তীর্থংকর শান্তিনাথের মূর্তিসমেত বহু জৈন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। দেউলির দেড়মাইল উত্তর-পশ্চিমে সুইসা গ্রামে পার্শ্বনাথের এক দিগম্বর মূর্তিও মিঃ বেগলারের নজরে পড়ে। পুরুলিয়ার তেইশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাকভিরা গ্রামে আবিষ্কৃত বহু জৈন নিদর্শনের মধ্যে পদ্মপ্রভ, ঋষভনাথ ও প্রতিমা সর্বতোভদ্রিকার মূর্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই একই অঞ্চলে তেলকুপি, বোড়াম, ছড়রা, লৌলাড়া ও পুঞ্চ প্রভৃতি গ্রামের জৈন পুরাকীর্তি সম্বন্ধে নির্মলকুমার বসু মহাশয় তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল ১৩৪০ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। আরও সম্প্রতিকালে, পুরুলিয়া জেলার সফা, সেনারা, ঝালদা, বলরামপুর, পারা প্রভৃতি স্থানেও বহু জৈন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সংলগ্ন বাঁকুড়া জেলাতেও এককালীন জৈন কেন্দ্রের সংখ্যা কিছু কম নয়। এ জেলার প্রধান নদী পথগুলির আশেপাশে প্রাচীন জৈন কেন্দ্রের অবস্থান দেখে মনে হয়, পশ্চিমের কেন্দ্রগুলি থেকে নদীপথ বাহিত হয়েই সম্ভবতঃ এ অঞ্চলে আদি জৈনধর্মের প্রসার ঘটেছিল। দামোদরের তীরে বিহারীনাথ, দারকেশ্বরের তীরে সোনাতপল, বহুলাড়া, ধরাপাট ও ডিহর, শিলাবতীর তীরে হাড়মাসরা এবং কংসবতীর তীরে পরেশনাথ, অম্বিকানগর ও বড়কোলা প্রভৃতি স্থানে জৈনধর্ম যে একদা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেকথা সন্দেহাতীত। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতঃ এ দু'টি জেলাতেই জৈন নিদর্শনের সংখ্যা বেশী হলেও বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এমন কি ২৪-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলেও সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্দ্ধমান জেলার সাতদেউলিয়া, কাটোয়া ও উজানি, মেদিনীপুর জেলার রাজপাড়া ও সুন্দরবনের নলগোড়া এবং কাঁটাবেনিয়ায় জৈন পুরাকীর্তি প্রাপ্তি থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে এই ধর্মমত আধুনিক

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে তো বটেই, দক্ষিণ অংশেও একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রাচীন বঙ্গদেশে জৈন-ধর্মের প্রতিপত্তির কথা সমর্থন করে। বাংলা দেশের পশ্চিমের জেলাগুলিতে 'শরাক' নামে এক আদিবাসী জাতি এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করেন যাঁরা বর্তমান আচার-আচরণে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত হলেও আদিতে তাঁরা যে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 'শরাক' কথাটি 'শ্রাবক' শব্দ থেকে উদ্ভূত। জৈন সম্প্রদায়ে যাঁরা সংসার ত্যাগী সাধুসন্তের জীবন যাপন করতেন না, ধর্মকথা শ্রবণ করে সাধারণ গৃহীর মতো সংসারধর্ম পালন করতেন তাঁদেরই এই নামে অভিহিত করা হত। এ নামের ছায়া এখনও দেখা যায় 'সারাওগী' পদবীতে।

এই চিত্তাকর্ষক আদিবাসী সম্পর্কে মিঃ রিজলীই সর্বপ্রথম ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ট্রাইবস এণ্ড কাস্টমস অব বেঙ্গল'-এ তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে আধুনিক কালে হিন্দু রীতিনীতির অনুগামী হলেও শরাকদের পূর্ব পুরুষেরা জৈন ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন লোহারডগা অঞ্চলে শরাকেরা পার্শ্বনাথকেই তাঁদের প্রধান দেবতা বলে পূজা করেন যদিও পরবর্তীকালের হিন্দু প্রভাবে শ্যামচাঁদ, রাধামোহন ও জগন্নাথও তাঁদের উপাস্য। রিজলীসাহেব তাঁদের মধ্যে অহিংসার ভাবধারা বিশেষ ভাবে বর্তমান দেখতে পান। তাঁরা প্রাণী হিংসার বিরোধী ও সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত। শুধু তাই নয়, 'কাটা' এই শব্দটী তাঁরা কখনই উচ্চারণ করতেন না এবং রন্ধনের সময় ভুলক্রমে হিংসামূলক এ-শব্দটি উচ্চারিত হলে প্রস্তুত আহার্য তাঁদের ফেলে দিতে হত।

১৯০১ সালের লোক গণনার-রিপোর্টে মিঃ গেইট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শরাকদের সংখ্যার একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তা থেকে দেখা যায়, এই সমস্ত অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার শরাকের মধ্যে প্রায় সাড়ে তেরো হাজারই বাস করতেন মানভূমি, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায়। তাঁদের মধ্যে আবার সাড়ে দশ হাজারের বাস ছিল মানভূমে অর্থাৎ বর্তমান কালের পুরুলিয়ায়। গেইট সাহেব লক্ষ্য করেন, বাংলা দেশের এই শরাকদের

ধারণা তাঁদের পিতৃপুরুষেরা গুজরাট থেকে এসেছিলেন। জৈনধর্ম অধুনা রাজপুতানা ও গুজরাট অঞ্চলেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ। সরাকদের পূর্বতন বাসভূমির এ-ধারণা হয়ত কিছুটা সম্ভাব্য সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শরাকদের আর একটি ঐতিহ্যের কথাও তিনি বলেছেন। সেটি, তাঁদের ধারণা, যে ভাস্কর ও রাজমিস্ত্রী হিসাবেই তাঁদের এখানে আনা হয়েছিল। বস্তুতঃ সরাক সম্প্রদায়ের মধ্যে এ-বিশ্বাস বদ্ধমূল যে স্থানীয় জৈন মূর্তি ও মন্দিরগুলি তাঁদেরই পূর্ব-পুরুষের নির্মিত। মিঃ ডল্টনও শরাক এবং জৈনদের এক করে দেখেছেন এবং তাঁদের কিছু অংশ যে ঝাড়খণ্ড ছেড়ে জয়পুর চিতোর ইত্যাদি অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন সেকথাও বলেছেন। বস্তুতঃ এই শ্রাবক সম্প্রদায় পরবর্তী-কালে প্রবলতর হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে পড়লেও সাবেক জৈন আচার আচরণ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে মেনে চলেন যা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে অতীতে এ অঞ্চলে জৈন ধর্মমতের তাঁরাই অন্যতম শক্তিশালী ধারক ও বাহক ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে, একথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে উড়িষ্যায় কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সরাকেরও বসবাস আছে। তাঁরা বাঙলাদেশে, বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলায় অল্পবিস্তর অনুপ্রবেশ করেছেন। সে জেলার চন্দ্রকোনা, ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থানে অল্প সংখ্যায় তাঁদের বসতি এখনও দেখা যায়। বহু কালের সামাজিক ও ধর্মীয় আদান-প্রদানের ফলে তাঁদের বর্তমান পদবী— চাঁদ, দত্ত, কর, নন্দী প্রভৃতি বাঙালীদের পদবী থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। তাঁরাও নিরামিষভোজী ও অহিংসায় বিশ্বাসী। ধর্মীয় আচার-আচরণে তাঁরা চতুর্ভুজ মূর্তিতে বুদ্ধদেবের পূজাও করেন আবার বরুণ এবং গণপতিও তাঁদের উপাস্য। কিন্তু পূজিত দেবতা যিনিই হোন না কেন, তাঁর আবাহন 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে করা হয়ে থাকে। উড়িষ্যা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের পূর্বে সেখানকার বৌদ্ধ সরাকদের পূর্বপুরুষেরা মানভূম-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের প্রবলতর জৈন সরাক গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন প্রকারে সম্পর্কিত ছিলেন কিনা সেকথা নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। সে যাই হোক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের এই অগণিত দৃষ্টান্ত থেকে কোন সন্দেহ থাকে না যে বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলিতে, বিশেষতঃ রাঢ় ভূখণ্ডে, জৈন ধর্ম একদা প্রভূত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল।

সরাক জাতি ও জৈনধর্ম

শ্রীতরণীপ্রসাদ মাজি

বর্তমানে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, সিংভূম, মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলার স্থানে স্থানে সরাক জাতির বসবাস দেখা যায়। সুদূর অতীতের ইতিহাস পাওয়া না গেলেও দুই তিন শত বৎসর পূর্বের যে সমস্ত দলিল-পত্র পাওয়া যায় তাহাতে সপ্রমাণিত হয় যে সরাক জাতি জৈন ধর্মাবলম্বী। এই নিরীহ ও ধর্মপরায়ণ জাতিটি বর্তমানে কৃষিকার্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তৎপূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যই যে প্রধান জীবিকা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সরাক জাতির মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যে বা যাহারা কৃষিকর্ম জীবিকারূপে গ্রহণ করিবে, তাহারা তীর্থদর্শনে যাইতে পারিবে না। এই কারণেই মনে হয় বর্তমানে অধিকাংশ সরাক তীর্থযাত্রাদি হইতে বিরত রহিয়াছে।

পরেশনাথ যাহা একাধিক তীর্থংকরের নির্বাণ স্থান, জৈনদিগের প্রধান তীর্থগুলির অন্যতম। এবং একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই পরেশনাথকে কেন্দ্র করিয়াই সরাক জাতি নিজ বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল। কারণ তৎকালে পদব্রজেই তীর্থ যাত্রা করিতে হইত। সরাকেরা মন্দির নির্মাণ করিয়া তীর্থংকরগণের পূজার্চনা করিত। তাই অদ্যাপি সরাক অধ্যুষিত অঞ্চলে মন্দির ও মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুলিয়া হইতে কয়েক মাইলের মধ্যে পালমা নামক একটি নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। সেখানে মূর্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয় মানভূম জেলায়—যেখানে অধিক সংখ্যক সরাক বাস করে—
—সেখানে কিছুদিন আগে একস্থানে মৃত্তিকার নীচে একটি অপূর্ব তীর্থংকর মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলায় স্থানে স্থানে ভগ্ন দেউলের চিহ্ন বর্তমান। শুনা যায় বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া জৈন সাধুগণ পরিক্রমা করিতেন।

সরাকগণের আচার ব্যবহারের সহিত বর্তমান জৈন সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারের হুবহু মিল আছে। 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—ইহা তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তাহাদের গোত্রাদিও তীর্থংকরগণের নামানুসারে। আমিষ ভোজীগণের মধ্যে বাস করিয়াও তাহারা অদ্যাপি খাদ্য বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা সরাকগণের গভীর ধর্মানুরাগের পরিচায়ক। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারেও তাহাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সরাক জাতি বহু পুরাতন এবং কতকটা গোঁড়া বলিয়াই প্রগতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই এবং এখনও নিজেদের সত্তা বজায় রাখিয়াছে।

কিন্তু একটি মর্মান্তিক ব্যাপার হইতেছে যে সরাকগণের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয় নাই—এবং দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র কারণ। জৈন সম্প্রদায়ের ধনী ব্যক্তিরা যদি এ বিষয়ে সজাগ হইতেন তাহা হইলে এই আত্ম-বিস্মৃত ও অধঃপতিত জাতির উন্নয়নের পথ সুগম হইত।

জৈন সম্প্রদায় বহু সৎকার্যে অর্থব্যয় করেন। যদ্যপি তাঁহারা এই বিচ্ছিন্ন ও অধঃপতিত সরাক জাতিকে আপনার ভাই বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং সর্বভাবে উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে রাহুমুক্ত সরাক জাতির গৌরবে তাঁহারাও গৌরবান্বিত হইতেন।

সরাকদের সম্পর্কে কয়েকটী অভিমত

'সরাক' শব্দটী নিঃসন্দেহে শ্রাবক শব্দ হতে উদ্ভূত হয়েছে। এর সংস্কৃত অর্থ শ্রবণকারী। জৈনদের মধ্যে শ্রাবক শব্দটী গৃহস্থদের বেলায় প্রযুক্ত হয়।

—গেইট, সেন্সর রিপোর্ট

'সরাকে'রা সম্পূর্ণ নিরামিষাসী, কখনো মাংসাহার করেন না এবং কোন কারণেই জীব হত্যা করেন না। এমন কি ব্যঞ্জন কুটবার সময় 'কাটা' শব্দের ব্যবহার করলে তা অপবিত্র হয়ে গেছে বলে মনে করেন ও সমস্তটা ফেলে দেন।

—এইচ্. রিজলী, দি পিপল অব ইণ্ডিয়া

'সরাকে'রা যে মূলতঃ জৈন তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের এবং এঁদের প্রতিবেশী ভূমিজদের মধ্যে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে তাতে মনে হয় যে ভূমিজদের মানভূমে আসবার অনেক আগে হতেই সরাকেরা এখানে বসবাস করতেন। প্রাক্ভূমিজ দিনের পাড়া, ছড়রা, বোড়াম ও অন্যান্য জায়গার মন্দিরাদিও সে কথারই সাক্ষ্য দেয়। সরাকেরা চিরকালই শান্তিপ্রিয় এবং ভূমিজদের সঙ্গে এ যাবৎকাল নির্বিবাদে বাস করে এসেছেন।

—কুপল্যাণ্ড, গেজেটীয়র অব মানভূম ডিষ্ট্রীক্ট

যে সমস্ত অঞ্চলে তামা পাওয়া যায়, সেই সমস্ত অঞ্চলে গত বছর আমি পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। ছোট নাগপুর মালভূমির পাদদেশ হতে··· যেখানে যেখানে তামার খনি রয়েছে সেখানেই দেখি অতীতের খনন কার্যের চিহ্ন বর্তমান। ···এ সম্পর্কে 'সরাক'দের কথা বলা হয়।

—ভি বল, অন দি এনসিয়েণ্ট কপার মাইনার্স অব সিংভূম

মানভূম জেলায় আমরা দুই বিভিন্ন রকম স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। তার মধ্যে যেটি বেশী প্রাচীন তার সম্বন্ধে বলা হয় যে তা সেরাপ,

সেরাব, সেরাক বা সরাক নামে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কীর্তি। এমন কি ভূমিজরা যাঁরা এখানে দীর্ঘকাল বসবাস করছেন তাঁরাও বলেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা অরণ্য পরিষ্কার করতে গিয়ে এই সব পুরাকীর্তি দেখতে পান। সিংভূমের পূর্বাঞ্চলেও সরাকেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন—এরকম কিম্বদন্তী প্রচলিত রয়েছে। মনে হয় সরাকেরা নদীর ধার দিয়ে দিয়ে তাঁদের বসতি স্থাপন করেছিলেন। ...কাঁসাই নদীর তটভূমি পুরাকীর্তির একটী সমৃদ্ধ ক্ষেত্র। সেখানকার বহু মূর্তি আমি দেখেছি। সেগুলি লাঞ্ছনসহ তীর্থংকর মূর্তি। ...আমি যে সমস্ত মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছি সেই মন্দিরগুলো বীর বা মহাবীর যে পথ দিয়ে পরিব্রাজন করেছিলেন সেই পথ রেখা ধরে তাঁর ভক্তদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত মন্দির সময় শিখর বা সম্মেত শিখরের পরিধির মধ্যে। এই সম্মেত শিখর সম্বন্ধে আরো বলা হয় যে বীর নির্বাণের ২৫০ বছর আগে সেখানে তীর্থংকর পার্শ্বনাথ নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাই মনে হয় যে অরণ্যের মধ্যে মধ্যে নদীর তীরে তীরে যাঁরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তাঁরা জৈন।

—লেঃ কর্ণেল ই. টি. ডল্টন, নোটস অন এ টুর ইন মানভূম

অহিংসা ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও মাংস ভক্ষণের দোষ

[মহাভারতের অনুশাসন পর্বে অহিংসা ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও মাংস ভক্ষণ দোষের কথা বলা হয়েছে। শ্রমণ ভাবধারার সঙ্গে এই অংশের সাদৃশ্য আশ্চর্য রকমের। পাঠকদের নিকট সেই অংশটি আমরা এখানে উপস্থিত করছি। —সম্পাদক]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্ত কার্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয় সংযম, তপস্যা ও গুরু শুশ্রূষা এই কয়েকটির মধ্যে কোনটিতে শ্রেয়: সাধন হইয়া থাকে?"

বৃহস্পতি কহিলেন, "ধর্মরাজ! এই ধর্ম কার্য শ্রেয়: সাধনোপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্বোৎকৃষ্ট পরমার্থ সাধন বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে দোষের আকর জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ পূর্বক অহিংসা ধর্ম প্রতিপালন করে, তাহার নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণিগণকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না। যিনি সকল প্রাণীকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া কাহাকেও প্রহার বা কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না তিনি দেহান্তে পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সকলকেই আপনার ন্যায় সুখভোগাভিলাষী ও দুঃখ ভোগে অনিচ্ছুক বিবেচনা করিয়া সকলের প্রতি তুল্য দৃষ্টি সম্পন্ন হয়েন, দেবগণও সেই মহাপুরুষের গতি নির্দেশে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। ফলতঃ যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না।..."

সুরগুরু বৃহস্পতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সর্বসমক্ষে আকাশ মার্গে প্রস্থান করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ সুরাচার্য প্রস্থান করিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান শান্তনুতনয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, "পিতামহ! ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদ প্রমাণানুসারে অহিংসা ধর্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্মরাজ! কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্‌বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান না করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। ব্রহ্মবাদীরা এই কারণে অহিংসা ধর্মকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারিটির মধ্যে অন্যতরের অভাব উপস্থিত হইলে অহিংসা ধর্ম আর আস্পদ লাভে সমর্থ হয় না। চতুষ্পদ জন্তু যেমন এক পদের অভাব উপস্থিত হইলে ক্ষণকালও দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না। সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মের একাংশ হীন হইলে ইহার স্থায়িতার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। যেমন হস্তীর পদচিহ্নে অন্যান্য জন্তুর পদচিহ্ন অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই অহিংসা ধর্মে অন্যান্য ধর্ম সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সমাবিষ্ট হয়। মনুষ্য কায়-মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহাকে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন না এবং কদাপি মাংস ভক্ষণ করেন না তিনি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। মাংস ভক্ষণাভিলাষ, মাংস ভক্ষণে উপদেশ প্রদান ও মাংস ভক্ষণ দ্বারা হিংসা জনিত পাপ জন্মে। এই নিমিত্ত তপঃপরায়ণ মহর্ষিগণ মাংসাহার করেন না। এক্ষণে মাংস ভক্ষণের দোষ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"যে ব্যক্তি মোহ প্রভাবে পুত্র সদৃশ অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে, সে অতি নীচাশয় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীপুরুষের সংযোগ যেমন সন্তানোৎপত্তির অদ্বিতীয় কারণ, সেইরূপ হিংসাই বহুবিধ পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।..."

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্মরাজ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, তাহা সর্বাগ্রে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদায় মহাত্মা রূপবান, অবিকলাঙ্গ, দীর্ঘায়ুঃ, বলশালী ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের হিংসা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ কহিয়াছেন,

যতব্রত হইয়া প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, মধু মাংস পরিত্যাগ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বালখিল্য ও মরীচিপ মহর্ষিগণ মাংস পরিত্যাগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়া গিয়াছেন যে ব্যক্তি পশু হিংসা ভোজনে পরাঙ্মুখ হয় তাহাকে সর্বভূতের মিত্র বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি মাংস ভোজন না করে, সে সর্বভূতের অধৃষ্য, সর্বজন্তুর বিশ্বাস পাত্র ও সাধুদিগের সম্মান ভাজন হয়।

"তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমাংস দ্বারা স্বীয় মাংস বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ভগবান বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকে মাংস ভোজনে বিরত হইলে অনায়াসে দাতা যজ্ঞশীল ও তপস্বী হইতে পারে।...

"মনুষ্য মাত্রেরই আত্ম প্রাণের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর প্রাণকে প্রিয়বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা কর্তব্য। যখন সিদ্ধিলাভাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদিগেরও মৃত্যুভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন মাংসোপজীবী দুরাত্মাগণ কর্তৃক নিপীড়িত অজ্ঞ জন্তুগণ যে মৃত্যু হইতে ভীত হইবে তাহার বিচিত্র কি ? মাংস ভোজন পরিত্যাগ ধর্ম, স্বর্গ ও সুখের মূলীভূত কারণ ; অতএব অহিংসাকেই পরম ধর্ম, উৎকৃষ্ট তপস্যা ও সত্য স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।...

"যে ব্যক্তি মাংস ভোজনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাঁহাকে কোনকালেই দুর্গম অরণ্য, দুর্গ বা চত্বরে অথবা উদ্যতশস্ত্র ব্যক্তি বা সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর নিকট ভীত হইতে হয় না। তিনি সর্বদাই সর্বভূতের শরণ্য, বিশ্বাসপাত্র ও শান্তি-জনক হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যদি ইহলোকে কেহই মাংসভোজী না হয়, তাহা হইলে পশু হত্যা এককালে তিরোহিত হইতে পারে। ঘাতকেরা কেবল মাংসভোজীর নিমিত্তই জীব হত্যা করিয়া থাকে ; যদি মাংস ভোজন না থাকে, তাহা হইলে ঘাতকেরা কখনই হত্যারূপ পাপ-কার্যে নিরত হয় না।

"যাহারা হিংসা বৃত্তি আশ্রয় করে, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয় ; অতএব মাংস ভোজন পরিত্যাগ করা হিতাকাঙ্ক্ষী মানবগণের অবশ্য কর্তব্য। হিংস্র জন্তু সদৃশ উদ্বেগজনক মাংসাশিগণ পরলোকে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না।...

"পূর্বে আমি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট মাংস ভোজনের যে সমুদয় দোষ শ্রবণ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত বা অন্য কতৃক নিপাতিত প্রাণীগণের মাংস ভোজন করে, তাহাকে হত্যাকারী ব্যক্তির তুল্য ফলভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কোন জন্তুকে সংহার করিবার নিমিত্ত ক্রয় করে, যে ব্যক্তি উহাকে সংহার করে এবং যে ব্যক্তি উহার মাংস ভোজন করে, তাহাদের তিন জনকেই হত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পণ্ডিতেরা এইরূপ তিন প্রকার হত্যা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংস ভোজনে বিরত হইয়াও অন্যকে তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা করে, তাহাকেও বধভাগী হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

"পূর্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্য লোক লাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহি সমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্দারা যজ্ঞ কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ সময় একদা ঋষিগণ মাংস-ভক্ষণ বিষয়ে সংশয়াবিষ্ট হইয়া চেদিরাজ বসুর নিকট গমন পুর্বক মাংস অভক্ষ্য কিনা এই প্রশ্ন করিলে তিনি অভক্ষ্য মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধের জন্য তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া ধরাতলে আগমন এবং ধরাতলে আগমন পূর্বক পুনরায় মাংসকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করাতে পাতাল তলে প্রবেশ করিতে হয়।...

"মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার মতে যে ব্যক্তি পরিপুর্ণ একশত বৎসর ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করে মাংস ভোজন পরাঙ্মুখ ব্যক্তি তাহার তুল্য ফললাভ করিয়া থাকে।...

"যে মহাত্মারা এই অতি উৎকৃষ্ট অহিংসা ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন। যে সকল মহাত্মা আজন্ম মধু, মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই মুনি বলিয়া পরিগণিত হয়েন। যাঁহারা এই অহিংসা ধর্মের অনুষ্ঠান, শ্রবণ, অধ্যয়ন বা অন্যের কর্ণ-গোচর করেন, তাঁহারা দুরাচার হইলেও তাঁহাদিগের সমুদয় পাপ বিনাশ ও জ্ঞাতিমধ্যে প্রাধান্য লাভ হয়। এই অহিংসা ধর্ম প্রভাবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধৃত, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত, রোগী রোগ শূন্য এবং দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। যাহারা এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ

করে, তাহাদিগকে কখনই তির্যগ্ যোনি লাভ করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহাদিগের বিপুল অর্থ ও কীর্তিলাভ হয়।

"হে ধর্মরাজ। এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি কথিত মাংস ভক্ষণ ও মাংস পরিত্যাগের ফল কীর্তন করিলাম।

"ধর্ম পরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাত্মক কার্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন। যে মহাত্মা দয়া পরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে অভয় প্রদান করেন সমস্ত প্রাণী হইতে তাঁহার আর কিছু মাত্র ভয় উপস্থিত হয় না। প্রাণিগণ সেই অভয় দাতা ক্ষত, স্খলিত বা আহত হউন, সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। হিংস্র জন্তু বা পিশাচেরাও তাঁহাকে বিনাশ করে না। যিনি অন্যের বিপদে সাহায্য করেন, তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রাণ দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কখন হয় নাই, হইবেও না। প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মৃত্যু সকল প্রাণীরই অপ্রীতিকর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণ এই সংসার মধ্যে জন্ম ও জরাজনিত দুঃখে নিরন্তর ক্লিষ্ট হয়, পরিশেষে আবার মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যার পর নাই যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা মাংসাহার নিরত, তাহারা প্রথমতঃ কুম্ভীপাক নরক ভোগ করিয়া পরিশেষে বারংবার তির্যগ্ জাতির গর্ভে অবস্থান পূর্বক ক্ষার, অম্লত্ব কটুরস এবং মূত্র, শ্লেষ্মা, পুরীষ দ্বারা সিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়, তৎপরে ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্যের বশীভূত এবং পুনঃ পুনঃ ছিন্ন ও পতিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বারংবার অন্য কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইতে হয়।

"পৃথিবীতে আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই; অতএব সমুদয় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া সকলেরই উচিত। যিনি যাবজ্জীবন কোন পশুর মাংস ভোজন করেন না স্বর্গে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ স্থান্ লাভ হইয়া থাকে। যে দুরাত্মারা জীবিত-প্রিয় পশুগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পরজন্মে সেই সমস্ত নিহত পশু কর্তৃক আবার ভক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা পশু বিনাশ করে পরজন্মে তাহারা অগ্রে এবং যাহারা সেই বিনষ্ট পশুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা তৎপশ্চাৎ সেই পশু কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, তাহাকে পরজন্মে অন্য কর্তৃক

আক্রুষ্ট ও যে অন্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহাকে তৎ কর্তৃক দ্বিষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় যে কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই সেই কার্যের ফলভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞের দান ও সমস্ত তীর্থ স্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তু দানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতামাতা স্বরূপ।

"হে ধর্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট সামান্যতঃ অহিংসার ফল কীর্তন করিলাম, ইহার সমগ্র ফল শত বৎসরেও বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না।"

—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় ১১৩-১১৬

জৈন সাহিত্যে উৎসব

বাঙলা দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণের কথা আমরা বলে থাকি অর্থাৎ বছরে যত না মাস তার চাইতে বেশী উৎসব বা পার্বণ। কিন্তু একথা শুধু বাঙলাদেশ সম্বন্ধেই নয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও বোধ হয় বলা যায়।

এই উৎসবের বাড়াবাড়ি আবার শরৎকালে বিশেষ করে দুর্গাপুজো বা নবরাত্রি হতে কালীপুজো বা দেওয়ালী পর্যন্ত।

একালের উৎসবের সঙ্গে কমবেশী আমরা সকলেই পরিচিত। তাই এখানে সেকালের কিছু উৎসবের আমরা পরিচয় দেব। এই পরিচয় প্রাচীন জৈন সাহিত্য হতে গৃহীত। অর্থাৎ সেকালে যেসব উৎসবাদি প্রচলিত ছিল তাদের নাম ও বিবরণ জৈন সাহিত্যে যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাই। এভাবে যদি আমরা অন্যান্য সাহিত্য হতেও তৎকালীন প্রচলিত উৎসবাদির নাম ও বিবরণ সংগ্রহ করি তবে তুলনামূলক আলোচনার পথই যে সহজ হবে তা নয়, সেই সঙ্গে আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণভাবে চিনতে ও জানতে পারব।

জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে সাধু ও সাধ্বীদের ভিক্ষাটন প্রসঙ্গে কিছু উৎসব ও দেবদেবীর নামের উল্লেখ আছে। জৈন সাধু ও সাধ্বীরা যেখানে এই সমস্ত পুজো বা উৎসবাদি হয় সেখান হতে যেন ভিক্ষা গ্রহণ না করেন। যেমন সামূহিক ভোজন; শ্রাদ্ধ; ইন্দ্র, রুদ্র, মুকুন্দ, ভূত, যক্ষ বা নাগ উৎসব; অথবা চৈত্য, বৃক্ষ, গিরি, দরী কূপ, পুষ্করিণী, হ্রদ, নদী, সরোবর, সাগর বা খনির উৎসব অথবা এমন উৎসব যেখানে অনেক শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, অতিকৃপণ ও ভিক্ষুকদের ভোজন করানো হয়।

জ্ঞাতাধর্মকথায় নিম্নলিখিত দেব দেবীর নাম পাওয়া যায়। যেমন: ইন্দ্র, স্কন্দ, রুদ্র, শিব, বৈশ্রমণ, নাগ, ভূত, যক্ষ, অজ্জা, কোট্টকিরিয়া।

ভগবতী সূত্রে যে সমস্ত দেবদেবীর নাম পাওয়া যায় তা এই: ইন্দ্র, স্কন্দ, রুদ্র, শিব, কুবের, আর্যা পার্বতী, মহিষাসুর, চণ্ডিকা।

ভগবতী সূত্রের অন্যত্র ইন্দ্রমহ, স্কন্দমহ, মুকুন্দমহ, নাগমহ, যক্ষমহ, ভূতমহ, কূপমহ, তড়াগমহ, নদীমহ, হ্রদমহ, রুদ্রমহ, চৈত্যমহ, স্তূপমহ'র বর্ণনা পাওয়া যায়।

নিশীথ চুর্ণি ও জ্ঞাতাধর্ম কথাতেও অনুরূপ উৎসবের নাম পাওয়া যায়।

এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে ইন্দ্রমহ আষাঢ় পূর্ণিমায়, স্কন্দমহ আশ্বিন পূর্ণিমায়, যক্ষমহ কার্তিক পূর্ণিমায়, ভূতমহ চৈত্র পূর্ণিমায় পরিপালিত হত বলে বলা হয়েছে।

এবারে আমরা এই সমস্ত উৎসবের পৃথক পৃথক বিবরণ উপস্থিত করব।

ইন্দ্রমহ—উপরোক্ত উৎসবের মধ্যে ইন্দ্রমহ বোধহয় সব চাইতে প্রাচীন। ইন্দ্রমহ অর্থাৎ ইন্দ্রের উৎসব। যদিও আমরা সাধারণতঃ একজন ইন্দ্রের কথাই জানি কিন্তু জৈন সাহিত্যে চৌষট্টি জন ইন্দ্রের উল্লেখ আছে। এই চৌষট্টি জন ইন্দ্রের মধ্যে যিনি প্রথম দেবলোকের ইন্দ্র, যাঁর নাম শক্র তাঁরই এই উৎসব।

এই ইন্দ্রোৎসব কে কবে সুরু করেছিলেন তার যে বিবরণ ত্রিষষ্টিশলাকা-পুরুষ-চরিত্রে দেওয়া আছে, সে এইরূপ :

আপনারা হয়ত জৈনদের চব্বিশজন তীর্থংকরের প্রথম তীর্থংকর ভগবান ঋষভদেবের নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। সেই ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল ভরত। যাঁর নাম হতে আসমুদ্রহিমাচল এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ। এ কথা যে শুধু জৈনরাই বলেন তা নয়, শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে :

> প্রিয়ব্রতোনাম সুতো মনোঃস্বায়ংভুবস্য যঃ।
> তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভিঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতং ॥
> তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্মবিবক্ষয়া।
> অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ ব্রহ্মপারগম্ ॥
> তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ
> বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্ ॥

—স্কন্ধ ১১ অধ্যায় ২

সে যা হোক্, এই ভরত একদিন ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে দেবরাজ, যেরূপে আপনি আমাদের দেখা দেন, স্বর্গেও কি আপনি সেই রূপেই অবস্থান

করেন না অন্যরূপে ? কারণ দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে আপনারা 'কামরূপ' অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণ করতে পারেন।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র বললেন, হে রাজন, স্বর্গে আমাদের রূপ এ রকম নয়, সে রূপ এ রকম যে সেরূপ মানুষ দেখতে সমর্থই নয়। ভরত তখন সেই রূপ দেখতে চাইলেন। ইন্দ্র তখন 'যোগ্যালংকারশালিনীম্ স্বাংগুলীং দর্শয়ামাস জগদ্বেশমৈকদীপিকাম্'—যোগ্যালংকারে সুশোভিত ও জগৎরূপ মন্দিরের বর্তিকার মতো নিজের একটি অঙ্গুলি ভরতকে দেখালেন ও একটা অঙ্গুরীয়ক তাঁকে দান করলেন। ভরত সেই অঙ্গুরীয়ক নিজের রাজধানী অযোধ্যায় নিয়ে এসে সেখানে স্থাপন করে এক অষ্ট দিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করলেন। সেই হতে ইন্দ্রোৎসব 'সমারব্ধো লোকৈরদ্যাঽপি বর্ততে'—ইন্দ্র-পূজার আরম্ভ ও লোকপ্রচলিতি।

ইন্দ্রপূজার প্রচলন সম্বন্ধে অনুরূপ বিবরণ আবশ্যক চূর্ণি, বাসুদেব হিণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। স্থানাঙ্গ সূত্রে ইন্দ্রমহ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় অর্থাৎ কোজাগরী পূর্ণিমায় হবার উল্লেখ আছে। রামায়ণেও আশ্বিন পূর্ণিমায় ইন্দ্রমহ হত বলে বলা হয়েছে।

ইন্দ্রধ্বজ ইবোদ্ভূতঃ পৌর্ণমাস্যাং মহীতলে।
আশ্বযুক্ সময়ে মাসি গত শ্রীকো বিচেতনঃ ॥

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৬, শ্লোক ৩৬

উত্তরাধ্যয়নের টীকায় কম্পিলপুরের রাজা দ্বিমুখ যেভাবে ইন্দ্রমহ উৎসব পালন করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি :

একবার ইন্দ্রোৎসবের সময় এলে রাজা দ্বিমুখ পৌরজনদের ইন্দ্রধ্বজ স্থাপন করবার আদেশ দিলেন। নাগরিকগণ উত্তম বস্ত্রে একটি মনোহর স্তম্ভ আচ্ছাদিত করে তার উপরে সুন্দর বস্ত্রের একটি ধ্বজা স্থাপন করলেন। তারপর ছোট ছোট ঘণ্টা ও ধ্বজায় সেই স্তম্ভটিকে সুসজ্জিত করলেন। ভ্রমর গুঞ্জরিত পুষ্প ও মুক্তা মাল্য দ্বারা সুশোভিত করলেন। এবং বাদ্যভাণ্ড সহকারে সেই ধ্বজাটিকে নগরের মাঝখানে স্থাপন করলেন। তারপর পত্র-পুষ্প ও ফলের অর্ঘ্য দিয়ে তাঁরা ধ্বজার পুজো করলেন। সেখানে কেউ নৃত্য

করতে লাগলেন, কেউ গীতবাদ্য। কেউ বা কল্প বৃক্ষের মতো যাচকদের দান দিতে লাগলেন। কেউ বা কর্পূর-কেশর-সুবাসিত রং ও সুগন্ধিত চূর্ণ ছড়াতে লাগলেন। এভাবে সাতদিন ধরে উৎসব চলল। পূর্ণিমা লাগলে দ্বিমুখ রাজা সেই ধ্বজার পুজো করলেন।

অনুরূপ ইন্দ্রপূজার বিবরণ অন্যত্রও পাওয়া যায়।

ইন্দ্রর বিবরণ কল্পসূত্রে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। তার খানিকটা—তিনি দেবিংদে অর্থাৎ দেবতাদের স্বামী, দেবরায় অর্থাৎ দেবতাদের রাজা, বজ্রপাণি—বজ্রধারণকারী, পুরন্দর—দৈত্যনগর বিনাশকারী, সহস্সকৃখে—এক সহস্র চক্ষু সম্পন্ন, (ইন্দ্রের পাঁচশ জন মন্ত্রী ছিলেন। পাঁচশ জন মন্ত্রীর এক হাজার দৃষ্টির পরামর্শানুসারে ইন্দ্র কাজ করতেন।) মঘবং—মঘবা দেব যাঁর সেবা করেন, পাবসাসনে—পাক নামক দৈত্যকে যিনি শাসন করেন বা শিক্ষা দেন, ইত্যাদি।

স্কন্দমহ—বা কার্তিক উৎসব। আবশ্যক চূর্ণিতে আছে যে ভগবান মহাবীর যখন শ্রাবস্তীতে পৌঁছলেন তখন সেখানে স্কন্দ বা কার্তিককে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হচ্ছিল।

বৃহৎ কল্পসূত্রেও স্কন্দের মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। মূর্তি দারু বা কাষ্ঠ নির্মিত হত। এই মূর্তির সামনে সমস্ত রাত্রি ধরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত।

রুদ্রমহ—রুদ্র ঘরের উল্লেখ অনেক জৈন গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এই রুদ্রকে মহাদেবতাও বলা হয়েছে। রুদ্রঘরে—রুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে মাঈ বা চামুণ্ডা, আদিত্য ও দুর্গার মূর্তিও স্থাপিত হত। ব্যবহার ভাষ্যে বলা হয়েছে রুদ্রঘর মৃত ব্যক্তির শবের উপর নির্মিত হত। রুদ্রমূর্তিও দারু বা কাষ্ঠেরই হত।

মুকুন্দমহ—জৈন গ্রন্থে মুকুন্দমহের উল্লেখ আছে। মুকুন্দের সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব ও বলদেবের পূজাও প্রচলিত ছিল। বলদেবের মূর্তির সঙ্গে হাল বা লাঙ্গলও থাকত।

শিবমহ—শিবপূজাও সে সময় প্রচলিত ছিল। পাতা ফুল গুগ্‌গুল ও জলের দ্বারা শিবের পুজো হত।

বৈশ্রমণ মহ—বৈশ্রমণ অর্থাৎ কুবের। জীবাজীবাভিগম্ সূত্রে কুবেরকে যক্ষ ও উত্তর দিকের অধিপতি বলে বলা হয়েছে।

নাগমহ—নাগপূজার প্রারম্ভ সম্বন্ধে জৈনগ্রন্থে যে গল্প আছে তার সঙ্গে ভগীরথের গঙ্গানয়নের মিল ও অমিল দুই-ই রয়েছে।

ভগবান ঋষভদেবের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি অষ্টাপদ বা কৈলাসে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁর নির্বাণের পর ভরত সেখানে একটি রত্নময় মন্দির নির্মাণ করেন। কালান্তরে সগরের জহ্নু আদি ষাট হাজার পুত্র একবার ভ্রমণ করতে করতে অষ্টাপদ পাহাড়ে যান। সেখানে মন্দিরটিকে সুরক্ষিত করবার জন্য তাঁরা সেই পর্বতের চারদিকে পরিখা খনন করেন ও গঙ্গার জল এনে সেই পরিখা পূর্ণ করেন। সেই গঙ্গার জল যখন নাগ কুমারদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে তখন নাগকুমারদের আজ্ঞায় দৃষ্টিবিষ সাপেরা এসে সগরপুত্রদের ভস্ম করে দেয়।

কিছুকাল বাদে সেই গঙ্গাজল পরিখার ভিতর আর আবদ্ধ রইল না নিকটবর্তী গ্রামে তা প্রবেশ করতে লাগল। সেকথা জানতে পেরে সগর তাঁর পৌত্র ভগীরথকে পাঠালেন গঙ্গাজলকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলবার জন্য। ভগীরথ অষ্টাপদে গিয়ে নাগ পূজা করলেন ও তাঁর অনুমতি নিয়ে গঙ্গাজল সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এই নাগ পূজার প্রারম্ভ।

এই গল্পটি উত্তরাধ্যয়ন টীকার মতো ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ-চিরত্র ও বাসুদেব হিণ্ডীতেও পাওয়া যায়।

নাগপূজার বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতাধর্ম কথায় আছে। রাণী পদ্মাবতী খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এই পূজো করতেন। সেই সময়ে সমস্ত নগরে জল ছড়ানো হত। মন্দিরের নিকট পুষ্পমণ্ডপ নির্মাণ করা হত। সুন্দর ও সুগন্ধিত মাল্যে তা সুসজ্জিত করা হত। পদ্মাবতী ঝিলে স্নান করে আর্দ্রবস্ত্রে সেই মন্দিরে যেতেন—প্রতিমা পূজো করতেন।

যক্ষমহ—যক্ষপূজা ভগবান মহাবীরের সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলা যায় কারণ প্রব্রজ্যাকালে তিনি অনেক সময়েই এই সব যক্ষায়তনে অবস্থান করতেন।

যক্ষদের সম্বন্ধে জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এরা 'বাণ-মন্তর' দেবতা। বাণ-মন্তর অর্থ বনের মধ্যভাগে যাঁরা বাস করেন।

যক্ষের রূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এঁদের বর্ণ শ্যাম, পাণি, পাদ, তল,

নখ, তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ; গম্ভীর আকৃতি ও কিরীট ও রত্নালঙ্কার ভূষিত।

যক্ষ যেমন পুত্রদাতা, রোগনাশক ও বলদায়ক তেমনি কষ্টদানকারীও। যক্ষ ক্রুদ্ধ হলে নির্দয় ও হিংসক।

ভূতমহ—ভূত নিশাচর। আবশ্যক চূর্ণিতে ভূতের সম্মুখে বলি দেবার উল্লেখ আছে। ইন্দ্রমহ আদির মতো ভূতমহও সেকালের একটি বিশিষ্ট পর্ব। এরা রক্তপানকারী ও মাংসখাদক।

অজ্জা-কোট্টকিরিয়া—অজ্জা কোট্টকিরিয়া আর কেউ নয়, আমরা যে দুর্গা পুজো করি সেই দুর্গা। দুর্গা যখন শান্তিময়ী তখন অজ্জা বা আর্যা। যখন মহিষাসুরমর্দিনী তখন কোট্টকিরিয়া।

পুস্তক পরিচয়

তীর্থংকর ভগবান শ্রীমহাবীর, জৈন চিত্রকলা নিদর্শন, বোম্বাই, ১৯৭৪। মূল্য ৬১.০০ টাকা।

ভগবান মহাবীরের পুণ্য জীবন ৩৫ খানি রঙীন চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রখ্যাত শিল্পী গোকুলদাস কাপড়িয়া। মুনিশ্রী যশোবিজয়জীর নির্দেশনায় ও উৎসাহে এই অমূল্য গ্রন্থটী ভগবান মহাবীরের ২৫০০ নির্বাণ উৎসব বৎসরে প্রকাশিত হয়েছে। সকলের বোধার্থে ছবির ব্যাখ্যা গুজরাতী, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় দেওয়া হয়েছে। জৈন প্রতীকের ১২১ খানি রেখাচিত্র ও শিল্প সম্পর্কিত ১২টী পরিশিষ্ট গ্রন্থের মূল্য আরো বর্দ্ধিত করেছে। শিল্প রসিকদের এই গ্রন্থটী অবশ্যই সংগ্রহণীয়। আশা করি ভগবান পার্শ্বনাথ, অরিষ্ট-নেমি, ঋষভদেব প্রভৃতি তীর্থংকরের জীবনও এইভাবে চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করবার প্রকল্প মুনিশ্রী অবশ্যই গ্রহণ করবেন।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. II. No. 6 : Sraman : Sep.-Oct. 1974

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১. সাতটী জৈন তীর্থ —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

২. অতিমুক্ত —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৪.০০

৩. শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

৪. শ্রাবককৃত্য —শ্রীগণেশ লালওয়ানী নিঃশুল্ক

हिन्दी

१ श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला
श्री कान्तिसागरजी महाराज ५.००

२ श्रीमद् देवचन्दकृत अध्यात्मगीता
—श्री केशरीचन्द धूपिया .७५

English

1. Bhagavati Sutra
(Text with English Translation)
—Sri K. C. Lalwani
Vol. I (Satak 1-2) 40.00
Vol. II (Satak 3-6) 40.00

2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha .75
tr. by Sri Ganesh Lalwani

3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani .50

কার্তিক ১৩৮১

দ্বিতীয় বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮১ ॥ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

পার্শ্বনাথ, মথুরা

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

মুহূর্তের মধ্যে সেই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল কৌশাম্বীতে—বর্দ্ধমান ভিক্ষাগ্রহণ করেছেন শ্রেষ্ঠী ধনবাহের ঘরে ক্রীতদাসী চন্দনার হাতে। এই সেই চন্দনা যাকে তিনি নগরের চৌমাথা হতে কিনে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটী রূপসীই ছিল না; তার চারপাশে ছিল শুভ্রতার, নির্মলতার এক পরিমণ্ডল। তাই তিনি তাকে ক্রীতদাসীদের ঘরে না পাঠিয়ে নিজের অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছিলেন, নিজের মেয়ের মতো ব্যবহার করেছিলেন। আর চন্দনের মতো শীতল তার ব্যবহার বলে তার নাম দিয়েছিলেন চন্দনা।

কিন্তু চন্দনার প্রতি শ্রেষ্ঠীর এই অহেতুক স্নেহই হল চন্দনার কাল। শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী মূলা এর জন্য বিষ চোখে দেখতে লাগলেন চন্দনাকে। ভাবলেন, চন্দনা তার রূপের জন্য হয়ত একদিন কর্ত্রী হয়ে উঠবে এই ঘরের। সেদিন সে তার সপত্নীই হবে না, সেদিন সন্তানহীনা মূলার কোন মর্যাদাই থাকবে না শ্রেষ্ঠীর চোখে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি করতে পারেন মূলা? তাছাড়া শ্রেষ্ঠীর অনুরাগের এখনো তিনি কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান নি।

তবু চন্দনার প্রতি তাঁর দুর্ব্যবহারের সীমা নেই।

কিন্তু শেষে একদিন সেই অনুরাগের প্রমাণও পাওয়া গেল। অন্ততঃ মূলার তাই মনে হল। মূলা দেখলেন, শ্রেষ্ঠী সেদিন মধ্যাহ্নে ঘরে আসতেই চন্দনা যেভাবে ভৃঙ্গারে করে তাঁর পা ধোয়াবার জল নিয়ে এল। তারপর তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর পা ধুইয়ে দিল।

শ্রেষ্ঠী অবশ্যই নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজেই ধুয়ে নিতে পারবেন। অন্যদিন অন্য দাসীরাই ধুইয়ে দেয়। আজ কেউ নিকটে ছিল না। তাই চন্দনা জল নিয়ে এসেছে। কিন্তু চন্দনা তাঁর কথা শুনল না।

তারপর পা ধোয়াবার সময় কেমন করে তার চুলের গ্রন্থি খুলে গিয়ে সমস্ত চুল এলিয়ে পড়ল। কিছু মাটিতে গিয়ে পড়ল। চুলে কাদা লাগবে ভেবে শ্রেষ্ঠী সেই চুল আলগোছে তুলে নিয়ে আবার তার মাথায় গ্রন্থি বেঁধে দিলেন।

মূলা এই দৃশ্য নিজের চোখেই দেখলেন। এর মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মূলার চোখে ঈর্ষ্যার অঞ্জন। মূলা তাই সমস্তটাকে অনুরাগের লক্ষণ বলে ধরে নিলেন।

এর জন্য চন্দনাকে কি শাস্তি দেওয়া যায়? শুধু শাস্তি কেন, তাকে কী একেবারেই সরিয়ে দেওয়া যায় না? মূলা সেদিন হতে সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করে রইলেন।

সেই সুযোগও আবার সহসাই এসে গেল। শ্রেষ্ঠী কি একটা কাজে তিন দিনের জন্য কৌশাম্বীর বাইরে গেলেন। মূলা সেই অবসরে এক ক্ষৌরকারকে ডেকে তাঁর স্বামী চন্দনার যে চুল স্পর্শ করেছিলেন তা কাটিয়ে ফেললেন। তারপর তার হাতে কড়া, পায়ে বেড়ি পরিয়ে নীচের এক অন্ধকার কুঠরীতে বন্ধ করে দিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। যাবার আগে অন্যান্য দাসদাসীদের বলে গেলেন একথা যেন তারা শ্রেষ্ঠীর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে।

শ্রেষ্ঠী ফিরে এসে তাই মূলার পিতৃগৃহে যাবার সংবাদ পেলেন কিন্তু চন্দনার কোনো খবরই পেলেন না।

শ্রেষ্ঠী চন্দনার জন্য চিন্তিত হলেন ও তার ব্যাপক অনুসন্ধান করতে সুরু করলেন। তখন এক বৃদ্ধা দাসী সমস্ত কথা তাঁকে খুলে বলল। বলল, মূলার ভয়েই তারা শ্রেষ্ঠীকে এতক্ষণ সমস্ত কথা খুলে বলতে পারে নি।

শ্রেষ্ঠী তখন চন্দনা যে কুঠরীতে বন্ধ ছিল সেই কুঠরীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন ও দরজা খুলে তাকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে এলেন। চন্দনার তখনকার স্থিতি দেখে তাঁর চোখেও জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু চন্দনাকে তখনই কিছু খেতে দেওয়া দরকার। ঘরে আর কিছু নেই। রান্নাঘরেও কুলুপ দেওয়া। শ্রেষ্ঠী তাই গাই বাছুরের জন্য যে কলাই সেদ্ধ করা ছিল তাই পাত্রের অভাবে কুলোর এক কোণে রেখে নিয়ে এলেন ও

চন্দনাকে তাই খেতে দিয়ে কামার ডাকতে গেলেন—চন্দনার হাতের কড়া, পায়ের বেড়ী কাটিয়ে দিতে হবে। শ্রেষ্ঠীও যেই গেছেন। আর বর্দ্ধমানও সেই এসেছেন।

কিন্তু কে এই চন্দনা! কে সেই ভাগ্যবতী যার হাতে বর্দ্ধমান ভিক্ষা গ্রহণ করলেন! শ্রেষ্ঠীর গৃহে কৌশাম্বীর সমস্ত লোক ভেঙে পড়েছে। শতানীক এসেছেন আর পদ্মগন্ধা মৃগাবতী। সুগুপ্ত এসেছেন ও নন্দা। সকলের দৃষ্টি এখন চন্দনার ওপর।

তোমরা কাকে বলছ চন্দনা? এতো বসুমতী—বলে এগিয়ে এলো রাজান্তঃপুরের এক বৃদ্ধা দাসী। এ যে রাজা দধিবাহনের মেয়ে বসুমতী।

মৃগাবতী এবারে চন্দনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, বসুমতী, আমি যে তোর মাসী হই। যুদ্ধে তোর বাবা মারা যাবার পর আমি তোদের অনেক সন্ধান করিয়েছি। কিন্তু কোন সন্ধান পাইনি। শুনি, প্রাসাদ আক্রমণ হলে তোরা প্রাসাদ পরিত্যাগ করে কোথায় যেন চলে গেলি।

তখন প্রকাশ পেল প্রাসাদ আক্রমণের সময় এক সুভট যে ভাবে তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মা ধারিণী শীল রক্ষার জন্য যে ভাবে নিজের প্রাণ দিলেন। বসুমতী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কিন্তু সুভটের হৃদয় পরিবর্তন হওয়ায় সে তাকে আশ্বস্ত করে কৌশাম্বীতে নিয়ে আসে। কিন্তু তার স্ত্রীর বিরূপতায় সে শেষ পর্যন্ত চন্দনাকে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। প্রথমে তাকে কিনতে চেয়েছিল কৌশাম্বীর এক রূপোপজীবিনী। কিন্তু সে তার ঘরে যেতে অস্বীকার করে। পরে শ্রেষ্ঠী ধনবাহ তাকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন।

মৃগাবতী আর একবার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বসুমতী আজ হতে তোর সমস্ত দুঃখের অবসান হল।

সেকথা শুনে চন্দনা চোখের জলের ভেতর দিয়ে হাসল। হাসল, কারণ সংসারে কি দুঃখের শেষ আছে! যদিও চন্দনার বয়স খুব বেশী নয়, তবু সে সংসারের নির্লজ্জ রূপটাকে দেখেছে। দেখেছে মানুষের লালসা ও লোভ, নীচতা ও উৎপীড়ন। সংসারে তার আর মোহ নেই। সে শান্তি চায়, জন্ম মৃত্যুর এই প্রবাহ হতে মুক্তি।

চন্দনা তাই রাজান্তঃপুরে ফিরে গেল না। প্রতীক্ষা করে রইল সেইদিনের যেদিন বর্দ্ধমান কেবল-জ্ঞান ল'ভ করে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর হবেন। বর্দ্ধমান যখন জ্ঞান লাভ করে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর হলেন সেদিন চন্দনা এসে তাঁর কাছে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করল। মেয়েদের মধ্যে চন্দনাই তাঁর প্রথম শিষ্যা।

চন্দনা এই জীবনেই সাধ্বী ধর্ম পালন করে জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হতে মুক্তি লাভ করেছিল।

আর মৃগাবতী? মৃগাবতীও পরে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করে শ্রমণী সংঘে প্রবেশ করেছিলেন যার সর্বাধিনায়িকা ছিল আর্যা চন্দনা। কিন্তু সেকথা এখানে নয়।

বর্দ্ধমান কৌশাম্বী হতে সুমঙ্গল, সুচ্ছেত্তা, পালক আদি গ্রাম হয়ে এলেন চম্পায়। চম্পায় তিনি তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের দ্বাদশ চাতুর্মাস্য ব্যতীত করবেন।

বর্দ্ধমান সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন স্বাতী দত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞ শালায়।

সেই যজ্ঞ শালায় বর্দ্ধমানের তপশ্চর্যায় প্রভাবিত হয়ে প্রতি রাত্রে তাঁকে বন্দনা করতে আসে পূর্ণভদ্র ও মণিভদ্র নামে দু'জন যক্ষ। বর্দ্ধমানের সঙ্গে তাদের কথা হয়। স্বাতি-দত্ত যেদিন সেকথা জানতে পারলেন সেদিন তিনিও এলেন তাঁর কাছে ধর্মতত্ব জিজ্ঞাসু হয়ে। এসেই প্রশ্ন করলেন, এই শরীরে আত্মা কে?

বর্দ্ধমান প্রত্যুত্তর দিলেন, যা আমি শব্দের বাচ্যার্থ, তাই আত্মা।

আমি শব্দের বাচ্যার্থ বলতে আপনি কী বলতে চান?

স্বাতি দত্ত, যা এই দেহ হতে সম্পূর্ণ-ই ভিন্ন এবং সূক্ষ্ম।

ভগবন্, কি রকম সূক্ষ্ম? শব্দ, গন্ধ ও বায়ুর মতো সূক্ষ্ম কী?

না স্বাতি দত্ত, কারণ চোখ দিয়ে শব্দ, গন্ধ ও বায়ুকে দেখা না গেলেও, অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে এদেরকে গ্রহণ করা যায়। যেমন কান দিয়ে শব্দকে, নাক দিয়ে গন্ধকে, ত্বক দিয়ে বায়ুকে। যা কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করা যায় না তাই সূক্ষ্ম; তাই আত্মা।

ভগবন্, তবে কি জ্ঞানই আত্মা ?

না, স্বাতি দত্ত। জ্ঞান তার অসাধারণ গুণ মাত্র, আত্মা নয়। যার জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানীই আত্মা।

স্বাতি দত্ত অন্য প্রশ্ন করলেন। বললেন, ভগবন্ প্রদেশন শব্দের অর্থ কী ?

বর্দ্ধমান বললেন, প্রদেশন শব্দের অর্থ উপদেশ। উপদেশ দুই ধরণের : ধার্মিক, অধার্মিক।

স্বাতি দত্ত আবারো অন্য প্রশ্ন করলেন। ভগবন্, প্রত্যাখ্যান কী ?

স্বাতি দত্ত, প্রত্যাখ্যান অর্থ নিষেধ। নিষেধও দুই ধরণের। মূল-গুণ প্রত্যাখ্যান, উত্তর গুণ প্রত্যাখ্যান। আত্মার দয়া, সত্যবাদিতা আদি স্বাভাবিক মূলগুণের রক্ষা ও হিংসা, অসত্যাদি বৈভাবিক প্রবৃত্তির পরিত্যাগ মূলগুণ প্রত্যাখ্যান। এই মূলগুণের সহায়ক সদাচারের বিপরীত আচরণের ত্যাগ উত্তরগুণ প্রত্যাখ্যান।

এই সব প্রশ্নোত্তরের ফলে স্বাতী দত্তের বিশ্বাস হল বর্দ্ধমান কেবল মাত্র কঠোর তপস্বীই নন, মহাজ্ঞানীও।

চাতুর্মাস্য শেষ হতে বর্দ্ধমান সেখান হতে এলেন জংভিয় গ্রাম। জংভিয় গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করে মেঁঢ়িয় হয়ে এলেন ছম্মানি। ছম্মানিতে গ্রামের বাইরে তিনি ধ্যানস্থিত হলেন।

যেখানে তিনি ধ্যানস্থিত হলেন, সেখানে এক গোপ খানিক বাদে এসে তার বলদ দুটো ছেড়ে দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেল। তারপর গ্রাম হতে ফিরে এসে যখন সে সেখানে তার বলদ দুটো দেখতে পেল না তখন বর্দ্ধমানকে জিজ্ঞাসা করল, দেবার্য, আপনি কী আমার বলদ দুটো দেখেছেন ?

বর্দ্ধমান ধ্যানে ছিলেন, তাই কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না।

প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় গোপ ক্রুদ্ধ হল ও কাষ্ঠ শলাকা এনে তাঁর কানের ভেতর প্রবেশ করিয়ে কালা সাজবার সাজা দিল। এমনভাবে প্রবেশ করাল যাতে তা কর্ণপট ভেদ করে মাথার ভেতর পরস্পর মিলিত হয় অথচ বাইরে থেকে দেখলে কিছুই যেন বোঝা না যায়।

বর্দ্ধমানের সেই সময় অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল কিন্তু তবু তিনি ধ্যানে নিশ্চল রইলেন।

ধ্যান ভঙ্গের পরও সেই শলাকা নিষ্কাশন করবার কোনো প্রযত্নই তিনি করলেন না, সেইভাবে সেই অবস্থায় প্রব্রজন করে পরদিন সকালে এলেন মধ্যমা পাবায়। মধ্যমা পাবায় ভিক্ষাচর্যার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠী সিদ্ধার্থের ঘরে গেলেন।

শ্রেষ্ঠী সেই সময় ঘরে ছিলেন। তাঁর মিত্র বৈদ্য খরকও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের মুখাকৃতি দেখা মাত্রই বৈদ্যরাজ বলে উঠলেন, দেবার্যর শরীর সর্বসুলক্ষণযুক্ত হলেও সশল্য।

সেকথা শুনে সিদ্ধার্থ কোথায় শল্য রয়েছে তা দেখতে বললেন।

খরক তখন বর্দ্ধমানের সমস্ত শরীর নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারলেন, যে তাঁর কানের ভেতর শলাকা বিদ্ধ রয়েছে।

খরক ও সিদ্ধার্থ তখন বর্দ্ধমানের সেই শলাকা নিষ্কাশনের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বর্দ্ধমান তাঁদের নিবারিত করে গ্রামের ধারে গিয়ে আবার ধ্যানস্থিত হলেন।

কিন্তু নিবারিত হয়েও খরক ও সিদ্ধার্থ নিবৃত্ত হলেন না। তাঁকে অনুসরণ করে তিনি যেখানে ধ্যানস্থিত ছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে ধরে তেলের এক দ্রোণীর মধ্যে বসিয়ে প্রথমে সর্বাঙ্গে তৈলমর্দন করলেন ও পরে সাঁড়াসী দিয়ে তাঁর দুই কান হতে দুই কাষ্ঠশলাকা টেনে বার করলেন। বর্দ্ধমান অসাধারণ ধৈর্যশীল হওয়া সত্বেও সেই সময় তীব্র বেদনায় চীৎকার দিয়ে উঠলেন। শলাকা নিষ্কাশন করবার পর খরক তাঁর কানের ভেতর সংরোহণ ঔষধিতে ভরে দিলেন।

গোপের অত্যাচারের উপসর্গ দিয়ে বর্দ্ধমানের প্রব্রজ্যা জীবনের আরম্ভ হয়েছিল, গোপের অত্যাচারের উপসর্গ দিয়েই তার শেষ হল।

বর্দ্ধমানকে যে সব উপসর্গের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার মধ্যে জঘন্য উপসর্গ ছিল কঠপুতনাকৃত শীত উপসর্গ, মধ্যম উপসর্গের মধ্যে সংগমক সৃষ্ট কালচক্র নিক্ষেপ উপসর্গ ও উৎকৃষ্ট উপসর্গের মধ্যে খরক কৃত শলাকা নিষ্কাশন-রূপ এই উপসর্গ।

বর্দ্ধমান প্রব্রজ্যা নেবার পর সাড়ে বারো বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এই দীর্ঘকাল তাঁর অনুপম জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম চারিত্র, অনুপম

লাঘব, অনুপম ক্ষান্তি, অনুপম মুক্তি, অনুপম প্রাপ্তি, অনুপম সত্য, অনুপম সংযম ও অনুপম ত্যাগের দ্বারা আত্মানুসন্ধান করতে করতেই ব্যয়িত হয়েছে। এখন উপস্থিত হয়েছে তাঁর কেবল-জ্ঞান লাভের চরম মুহূর্ত।

বর্দ্ধমান মধ্যমা পাবা হতে এসেছেন আবার জংভীয়গ্রামে। সেখানে জংভীয়গ্রামের বাইরে ঋজুবালুকার উত্তর তীরে শ্যামাকের ভূমিতে শালবৃক্ষের নীচে ধ্যানস্থিত হয়েছেন। বর্দ্ধমান সেদিন দু'দিনের উপবাসী ছিলেন। সেখানে সেই ধ্যানাবস্থায় দিনের চতুর্থ প্রহরে শুক্ল ধ্যানের পৃথকত্ব বিতর্ক সবিচার, একত্ব বিতর্ক অবিচার অবস্থা অতিক্রম করে জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় এই চার রকম ঘাতি কর্মের ক্ষয় করে কেবল-জ্ঞান ও কেবল-দর্শন লাভ করলেন।

এই চরম উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও দর্শন অনন্ত, ব্যাপক, সম্পূর্ণ নিরাবরণ ও অব্যাহত, যে জন্য এর প্রাপ্তির পর সমস্ত লোকালোকের সমস্ত পর্যায় বর্দ্ধমানের দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। তিনি অর্হন অর্থাৎ পূজনীয়, জিন অর্থাৎ রাগদ্বেষজয়ী ও কেবলী অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হলেন।

সেদিন বৈশাখ শুক্লা দশমী ছিল। চন্দ্রের সঙ্গে উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রের যোগ ছিল।

[ক্রমশঃ

জৈন ধর্মের পূর্ববর্তী নাম

মুনি শ্রীনথমল

ইতিহাসের দৃষ্টিতে জৈন ধর্ম মাত্র ২৮০০ বছর পুরুনো, কিন্তু সাহিত্যের দৃষ্টিতে তা কয়েক হাজার বছর পুরুনো। জৈন ধর্ম শ্রমণ পরম্পরার প্রাচীনতম রূপ। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে তা অভিহিত হয়ে এসেছে। বৈদিক কাল হতে আরণ্যক কাল পর্যন্ত তা বাতরশন শ্রমণদের ধর্ম নামে অভিহিত হত। ঋগ্বেদে বাতরশন মুনিদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুনয়োবাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা।[১]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কেতু, অরুণ ও বাতরশন ঋষিদের স্তুতি করা হয়েছে।

কেতবো অরুণাসশ্চ ঋষয়ো বাতরশনাঃ।
প্রতিষ্ঠাং শতধা হি সমাহিতাসো সহস্রধায়সম্॥[২]

আচার্য সায়ণের মতে কেতু, অরুণ ও বাতরশন এ তিনটী ঋষি সংঘ ছিল। তাঁরা অপ্রমত্ত ছিলেন।[৩] এঁদের উৎপত্তি প্রজাপতি হতে হয়েছিল। প্রজাপতিতে সৃষ্টির বাসনা উৎপন্ন হলে তিনি তপস্যা করলেন ও সৃষ্টির পর্যালোচনা করে নিজের শরীর প্রকম্পিত করলেন। তাঁর প্রকম্পিত শরীরের মাংস হতে তিন ঋষির উদ্ভব হল: অরুণ, কেতু ও বাতরশন। তাঁর নখ হতে বৈখানস ও চুল হতে বালখিল্য মুনির উৎপত্তি হল।[৪]

এই সৃষ্টিক্রমে সর্ব প্রথম ঋষিদের উদ্ভবের কথা বলা হয়। এ হতে এই মনে হয় যে এখানে ধার্মিক সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে। জৈন দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই উদ্ভব ক্রমের ব্যাখ্যা এ ভাবে করা যায়। ভগবান ঋষভদেব যখন দীক্ষিত হন তখন তাঁর সঙ্গে আরো চার হাজার লোক দীক্ষিত হয়। ঋষভদেব দীক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ ছয় মাস অনাহারে কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকেন।[৫] অন্য মুনিরা কিছুদিন যাবৎ তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে

থাকে কিন্তু পরিশেষে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বল্কলধারী তাপস ও পরিব্রাজক হয়ে যায়।[৬] ঋষভদেবের পৌত্র মরীচি হতে আবার সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়।[৭] ভগবান ঋষভদেবের ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই এভাবে নানা ধর্ম সংঘেরও প্রবর্তন হয়। যদিও এই সব সংঘ নায়কেরা ঋষভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন[৮] তবু তাঁর পরম্পরার সঙ্গে কালক্রমে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ থাকে না। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কেবল মাত্র বাতরশন শ্রমণদের সঙ্গেই বর্তমান থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বাতরশন শ্রমণদের ধর্ম যে ভগবান ঋষভের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়েছিল তার সমর্থন পাওয়া যায়।

ধর্মান্ দর্শয়িতুকামো বাতরশনানাং শ্রমণানামৃষীণামূর্ধ্ব-মন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবততার।[৯]

ভগবান ঋষভদেবের নয় পুত্রও বাতরশন মুনি হন।

নবাভবন্ মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ।
শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ॥[১০]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বিবৃতি রূপকের ভাষায়। প্রজাপতির শরীর প্রকম্পিত করা, শরীরের মাংস হতে অরুণ, কেতু ও বাতরশন ঋষিদের উৎপত্তি—এদের অর্থ মহাপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের পর্যালোচনায় এই দাঁড়ায় যে ধ্যান ভঙ্গের পর ঋষভ যখন ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন তার পূর্বেই অনেক ঋষি সংঘের উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল। এ হতে আরো প্রমাণিত হয় যে শ্রীমদ্ভাগবতের ঋষভ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রজাপতি একই ব্যক্তি ছিলেন।

গোড়ার দিকে অরুণ ও কেতুও ঋষভের শিষ্য ছিলেন। কারণ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৫।১) অরুণকে স্বায়ম্ভুব বলা হয়েছে—আরুণঃ স্বায়ম্ভুবঃ।

মহাপুরাণেও (১৮।৬০) একথা লেখা হয়েছে যে ঐ সময় স্বয়ম্ভু ঋষভ ছাড়া অন্য কাউকেও দেবতা বলে স্বীকার করা হত না—ন দেবতান্তরং তেষামাসীন্মুক্তা স্বয়ম্ভুবম্। যে আরুণ-কেতুক অগ্নিচয়ন করে তার পক্ষে জলও অহিংসনীয়।

অঘাতুকা আপঃ। য এতমগ্নিং চিনুতে।[১১]

য এবমারুণকেতুকমগ্নিং চিনুতে যশ্চৈবং বেদ তমেনং প্রত্যোদকাম্‌্যদক-

বর্তীনি মীনাদীনি অঘাতুকান্যহিংসকানি ভবন্তি। আপোপ্যঘাতুকাঃ। উদকমরণং ন ভবেদিত্যর্থঃ।[১২]

অহিংসার এই সূক্ষ্ম ধারণায় এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে আরুণ ও কেতুক ঋষিগণ গোড়াতে ঋষভের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জৈন ধর্মের পূর্ববর্তী ধারক রূপে বাতরশন শ্রমণেরাই অবশেষ রইলেন। তাঁরা উর্দ্ধমন্থীরূপে পরিচিত হলেন।[১৩] ব্রাত্য শব্দও বাতরশন শব্দের সহচারী রূপে পরিগণিত হল।

জৈন ধর্মের দ্বিতীয় মুখ্য নাম আর্হৎ। ভগবান অরিষ্টনেমির পূর্বেই এই নাম প্রচলিত হয় ও ভগবান পার্শ্বনাথের তীর্থকাল অবধি প্রচলিত থাকে। অরিষ্টনেমির তীর্থকালে প্রত্যেক-বুদ্ধদেরও অর্হৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৪]

পদ্ম ও বিষ্ণুপুরাণেও[১৫] জৈন ধর্মের স্থানে আর্হৎ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন পদ্মপুরাণে :

আর্হতং সর্বমেতচ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্।
ধর্মাদ্ বিমুক্তেরর্হোয়ং ন তস্মাদপরঃ পরঃ ॥[১৬]

জৈন ধর্মের তৃতীয় মুখ্য নাম নিগ্রর্ন্থ। নিগ্রর্ন্থ শব্দের ব্যবহার বৈদিক বা পৌরাণিক সাহিত্যে তেমন পাওয়া যায় না। আচার্য সায়ণ অবশ্য এক স্থানে নিগ্রর্ন্থ সম্পর্কিত একটী বাক্য উদ্ধৃত করেছেন : কন্থা কৌপীনোত্তরাসঙ্গ-দীনাং ত্যাগিনো যথাজাত রূপধরা নিগ্রর্ন্থা নিষ্পরিগ্রহাঃ —ইতি সংবর্ত-শ্রুতিঃ।[১৭]

জাবালোপনিষদেও এক জায়গায় নিগ্রর্ন্থ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তবে ভগবান মহাবীরের তীর্থকালেই এই শব্দের বহুল ব্যবহার করা হয় এবং তৎকালীন সাহিত্যে নিগ্‌গংথং পাবয়নং—নিগ্রর্ন্থ প্রবচনের প্রমুখ উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে মহাবীরকে নিগ্রর্ন্থ নাতপুত্র বলা হয়েছে ও জৈন শ্রমণদের জন্য বারবার নিগ্‌গণ্ঠং শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। অশোকের শিলা লেখেও নিগ্‌গণ্ঠং-এর উল্লেখ পাওয়া যায়—ইমে বিয়াপটা হোহন্তি নিগ্‌গংঠেসু পি মে কটে।[১৮]

সেকালীন জৈন আগমে সোচ্চাণং জিণ সাসণং[১৯], অনুত্তরং ধম্মং মিণং

জিণাণং[২০], জিণময়[২১], ণিণবময়[২২] প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকলেও জৈন ধর্ম এরূপ সুস্পষ্ট প্রয়োগ দেখা যায় না। ভগবান মহাবীরের পর আঠ গণধর বা আচার্য অবধি নিগ্রর্ন্থ শব্দ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।[২৩]

শ্রীসুধর্মস্বামিনোষ্টৌ সূরীন্ যাবৎ নিগ্রর্ন্থাঃ। সাধবোঽনগারা ইত্যাদি সামান্যার্থাভিধায়িন্যাখ্যাসীৎ।

বিশেষাবশ্যক ভাষ্যে প্রথম জৈন তীর্থ, জৈন সমুদঘাত ইত্যাদি প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[২৪]

মৎস্যপুরাণের

গত্বার্থমোহয়মাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ ॥[২৫]

বা দেবী ভাগবতের

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্।
জৈনধর্ম কৃতং স্বেন যজ্ঞ নিন্দাপরং তথা ॥[২৬]

জিন ধর্ম বা জৈন ধর্ম তারই প্রতিধ্বনি।

তাই মনে হয় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই বিভেদের পর যখন হতে ভিন্ন ভিন্ন গচ্ছের স্থাপনা হয় তখন হতে নিগ্রর্ন্থ শব্দ গৌণ হয়ে জৈন শব্দ মুখ্যতঃ প্রযুক্ত হতে থাকে। এবং সেই সময় হতে একাল অবধি জৈন ধর্ম নাম ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

১ ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১৩৬।২

২ তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।২১।৩, ১ ২৪, ১।৩১ ৬

৩ ঐ ১।২১ ৩, ভাষ্য।

৪ ঐ ১।২৩।২-৩

৫ মহাপুরাণ ১৮ ২

৬ ঐ ১৮।৫৫-৫৯

৭ ঐ ১৮।৬১-৬২

৮ ঐ ১৮।৬০

৯ শ্রীমদ্‌ভাগবত ৫ ৩ ২০

১০ ঐ ১১ ২।২০

১১ তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।২৬।৭

১২ ঐ।

১৩ ঐ ২।৭।১

১৪ ইসিভাষিয় ১-২০

১৫ ৩।১৮।১২

১৬ ১৩।৩৫০

১৭ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ভাষ্য ১০।৬৩

১৮ প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখোঁকা অধ্যয়ন, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯

১৯ দশ বৈকালিক ৮।২৫

২০ সূত্রকৃতাঙ্গ

২১ দশ বৈকালিক ৯।৩।১৫

২২ উত্তরাধ্যয়ন ৩৬।২৬০

২৩ পট্টাবলি সমুচ্চয়, তপাগচছ পট্টাবলি, পৃঃ ৪৫

২৪ ১০৪৩ জেণং তিথং। ১০৪৫-১০৪৬ তিথং…জইণং। ৩৮৩ জইণ সমুগ্ধায়গঈএ

২৫ মৎস্যপুরাণ ২৮।৪৭

২৬ দেবী ভাগবত ৪।১৩।৫৪

জৈন মতে জীবভেদ

পূরণচাঁদ নাহার

জৈনধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। ইহার দর্শন বিচার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ। জৈনদিগের দর্শন, সাহিত্য, ন্যায়, অলঙ্কার আদির ঔৎকর্ষ ও সর্বাঙ্গীনতার প্রতি বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কর্মই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং জীবই কর্মের ভোক্তা। জৈন সুধীগণ জীবতত্ত্বের কিরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। অধুনা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উদ্ভিদাদিতে চেতনা (sensation etc.) ও খনিজ ধাতুতে রোগাদির (diseases etc.) অস্তিত্ব ও ব্যাপকতা দর্শাইয়াছেন, জৈন মনীষীগণ খৃষ্ট শতাব্দীর বহুকাল পূর্বে তদ্রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কৌতূহলী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি। জৈন কেবলীগণ জ্ঞানমার্গে কতদূর উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইবে, এই জন্য জীবভেদের একটি নাম-লতা (chart) অপর পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইল।

জৈনমতে 'জীবন্তি কালত্রয়েঽপি প্রাণান্ ধারয়ন্তি ইতি জীবাঃ'। জীববৃন্দ দুই প্রকার : (১) সংসারী ও (২) সিদ্ধাত্মী।

প্রথমতঃ, সংসারী অর্থাৎ চতুর্গতিরূপ সংসারে যাহারা অবস্থিতি করিতেছে তাহাদের স্থূল বিভাগ দুইটি : (ক) স্থাবর ও (খ) ত্রস্ (গতিবিশিষ্ট)। স্থাবর জীবের কেবলমাত্র একটি স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। ইহারা পাঁচপ্রকার :

(১ক) পৃথ্বীকায়—যথা স্ফটিক, মুক্তা, চন্দ্রকান্তাদি মণি (সমুদ্রজ), বজ্রকর্কেতনাদি রত্ন (খনিজ), প্রবাল, হিঙ্গুল, হরিতাল, মনঃশিলা, পারদ, কনকাদি সপ্তধাতু, খড়িমাটি, রক্ত মৃত্তিকা, শ্বেত মৃত্তিকা, অভ্র, ক্ষার মৃত্তিকা, সর্বপ্রকার প্রস্তর, সৈন্ধবাদি লবণ ইত্যাদি।

(২ক) অপ্‌কায়—যথা ভূমিগর্ভস্থ জল (কূপোদকাদি). বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, হিম, তুষার, শিশির, কুজ্ঝটিকা, সমুদ্রবারি ইত্যাদি।

(৩ক) অগ্নিকায়—যথা অঙ্গার, উল্কা, বিদ্যুৎ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি।

(৪ক) বায়ুকায়—যথা ঝঞ্ঝাবাত, গুঞ্জবাত, উৎকলিকাবাত, মণ্ডলীবাত, শুদ্ধবাত, ঘনবাত, তনুবাত[১] ইত্যাদি।

(৫ক) উদ্ভিদকায় দ্বিবিধ: সাধারণ ও প্রত্যেক।

যে উদ্ভিদে বহুবিধ (অনন্ত) উদ্ভিদকায় জীবাণু একই শরীরে থাকে তাহারা সাধারণ উদ্ভিদ বা নিগোদ,—যথা কন্দ, অঙ্কুর, কিশলয়, শৈবাল, ব্যাংছাতি, আদ্রা, হরিদ্রা, সর্বপ্রকার কোমল ফল, গুগ্ গুল, গুলঞ্চ প্রভৃতি ছিন্নরুহ (ছেদন করিবার পরও যাহা পুনরায় জন্মে) যাহাদের শিরা, সন্ধি ও পর্ব গুপ্ত থাকে ও যাহারা সমভঙ্গ (পানের ন্যায় যাহা ছিঁড়িলে অদন্তুর ভাবে ভগ্ন হয়) ও অহীরক (ছেদন করিলে যাহার মধ্য হইতে তন্তু পাওয়া যায় না) ইত্যাদি।

যে উদ্ভিদের এক শরীরে একটি মাত্র জীব থাকে তাহা প্রত্যেক উদ্ভিদ নামে বিশেষিত হইয়াছে। যথা ফল, ফুল, ছাল, কাষ্ঠ, মূল, পত্র ইত্যাদি।

প্রত্যেক উদ্ভিদ ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার স্থাবর জীব সূক্ষ্ম ও বাদর হইয়া থাকে।

সংসারী জীবের দ্বিতীয় প্রধান বিভাগ ত্রস্ জীব চারি প্রকার:

(১খ) দ্বীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ ও রসনাজ্ঞান আছে। যথা শঙ্খ, কপর্দক, ক্রিমি, জলৌকা, কেঁচো ইত্যাদি।

(২খ) ত্রীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ এই তিনটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা কর্ণকীট, উকুন, পিপীলিকা, মাকড়সা, আরসোলা ইত্যাদি।

(৩খ) চতুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও নেত্র এই চারিটি ইন্দ্রিয় আছে। যথা বৃশ্চিক, ভ্রমর, পতঙ্গপাল, মশক, মক্ষিকা ইত্যাদি।

(৪খ) পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইহাদের স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, নেত্র ও শ্রোত্র এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে।

(১) নারকীয় জীবেরা তাহাদের বাসস্থান ভেদে সাত প্রকার—যথা রত্নপ্রভাবাসী, শর্করাপ্রভাবাসী, বালুকাপ্রভাবাসী, পঙ্কপ্রভাবাসী, ধূমপ্রভাবাসী, তমঃপ্রভাবাসী, তমস্তমঃপ্রভাবাসী।

১ জৈন মতে রত্নপ্রভাদিভূমি ও সৌধর্মাদি বিমান লোকের ঘনবাত ও তনুবাত-এর ওপর আধারভূত আছে। ঘনবাত ঘৃতসদৃশ গাঢ় ও তনুবাত তাপিত ঘৃতবৎ তরল।

(২) তির্যক জীব ত্রিবিধ—জলচর (মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, হাঙ্গর ইত্যাদি), স্থলচর ও খেচর।

স্থলচর তিনপ্রকার—চতুষ্পদ, উরঃপরিসর্প ও ভূজ-পরিসর্প।

চতুষ্পদ—যথা গো, অশ্ব, মহিষাদি।

উরঃপরিসর্প—যথা সর্প ইত্যাদি।

ভুজপরিসর্প—যথা নকুল ইত্যাদি।

খেচর—ইহারা দুইপ্রকার: রোমজ ও চর্মজ।

রোমজ—যথা হংস, সারস ইত্যাদি। চর্মজ—যথা চর্মচটিক ইত্যাদি।

যাবতীয় জলচর স্থলচর ও খেচর জীবগণ সমূর্চ্ছিম ও গর্ভজ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মাতৃপিতৃনিরপেক্ষতায় যাহাদের উৎপত্তি তাহারা সমূর্চ্ছিম। গর্ভে যাহারা জন্মে তাহারা গর্ভজ।

(৩) মনুষ্যের বিভাগও বাসস্থান ভেদে তিন প্রকার—(১) কর্মভূমিবাসী, (২) অকর্মভূমিবাসী, (৩) অন্তর্দ্বীপবাসী।

(১) কর্মভূমি অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি কর্মপ্রধান ভূমি—পঞ্চভরত, পঞ্চ ঐরাবত ও পঞ্চবিদেহ এই পঞ্চদশ প্রদেশকে কর্মভূমি বলে।

(২) অকর্মভূমি অর্থাৎ হৈমবৎ, ঐরাবত, হরিবর্ষ, রম্যকবর্ষ, দেবকুরু ও উত্তরকুরু এই ষট্ অকর্মভূমি পঞ্চ মেরুর প্রত্যেক মেরুতে অবস্থিত আছে। তজ্জন্য মেরুভেদে অকর্মভূমির মোট সংখ্যা ৩০।

(৩) অন্তর্দ্বীপের সংখ্যা ৫৬।

দেবগণ প্রধানতঃ চারিপ্রকার—যথা (১) ভুবনপতি, (২) ব্যন্তর, (৩) জ্যোতিষ্ক ও (৪) বৈমানিক।

ভুবনপতি দেবতা—অসুরকুমার, নাগকুমার, সুপর্ণকুমার, বিদ্যুৎকুমার, অগ্নিকুমার, উদধিকুমার, দিগ্‌কুমার, বায়ুকুমার ও স্তনিতকুমার এই দশ প্রকার।

ব্যন্তর দেবতা—পিশাচ, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, কিংপুরুষ, মহোরগ ও গন্ধর্ব এই আট প্রকার।

জ্যোতিষ্ক দেবতা—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা। ইহারা মনুষ্য-ক্ষেত্রে 'চর তদ্বহিঃ স্থির'।

বৈমানিক দেবতা দুই প্রকার—যথা কল্পোৎপন্ন ও কল্পাতীত।

সৌধর্ম, ঈশান, সনৎকুমার, মাহেন্দ্র, ব্রহ্ম, লান্তক, শুক্র, সহস্র, আনত, প্রাণত, আরণ ও অচ্যুত এই দ্বাদশ কল্পবাসী দেবতারা কল্পোৎপন্ন।

সুদর্শন, সপ্রবুদ্ধ, মনোরম, সর্বতোভদ্র, বিশাল, সমনঃ, সোমনসঃ, প্রিয়ঙ্কর, নন্দীকর, এই নয় গ্রৈবেয়ক বিমানবাসী ও বিজয়, বৈজয়ন্ত, অপরাজিত, সর্বার্থসিদ্ধ এই পঞ্চানুত্তর বিমানবাসী দেবতারা কল্পাতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

জীবের দ্বিতীয় বিভাগ সিদ্ধগামী জীব তীর্থ সিদ্ধ ও অতীর্থসিদ্ধ ভেদে পঞ্চদশ প্রকার জৈন সিদ্ধান্তে বর্ণিত আছে। তাহাদের নাম: যথা (১) জিনসিদ্ধ, (২) অজিনসিদ্ধ, (৩) তীর্থসিদ্ধ, (৪) অতীর্থসিদ্ধ, (৫) গৃহস্থলিঙ্গসিদ্ধ, (৬) অন্যলিঙ্গসিদ্ধ, (৭) স্বলিঙ্গসিদ্ধ, (৮) স্ত্রীলিঙ্গসিদ্ধ, (৯) পুরুষলিঙ্গ সিদ্ধ, (১০) নপুংসকলিঙ্গসিদ্ধ, (১১) প্রত্যেকবুদ্ধসিদ্ধ, (১২) স্বয়ংবুদ্ধসিদ্ধ, (১৩) বুদ্ধপোষিতসিদ্ধ, (১৪) একসিদ্ধ ও (১৫) অনেকসিদ্ধ।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২১ হইতে সংকলিত।

জৈন ধর্ম ও বাঙ্‌লা সাহিত্য

বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে জৈনধর্মের সম্পর্ক যখন অনেক প্রাচীন তখন বাঙ্‌লা সাহিত্যে জৈনধর্মের সুস্পষ্ট কোনো প্রভাব নেই কেন, সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। কিন্তু সত্যিই কি কোনো প্রভাব নেই? অবশ্য অপভ্রংশের কাল কাটিয়ে যে সময় হতে বাঙ্‌লা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয় সে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতক। সেই সময় পৌরাণিক ভক্তিবাদের প্রাধান্য। তাই বাঙ্‌লা সাহিত্যেও রাধাকৃষ্ণের গীতি কবিতার প্রাবল্য। অবশ্য তার পূর্বে চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। চর্যাচর্য বিনিশ্চয় রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতি কবিতার পাশে পাশে বাঙ্‌লাদেশে সেদিন আর এক ধরণের সাহিত্যও রচিত হয়েছিল যাদের আমরা শিবায়ন ও মঙ্গল কাব্য বলে অভিহিত করি। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে আবার ধর্মমঙ্গল। এই ধর্ম কে ছিলেন? ইনি কি জৈন তীর্থঙ্কর ধর্মনাথ স্বামী? অবশ্য ধর্মপূজা আজ যে ভাবে প্রচলিত তাতে জৈন ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন একটু কষ্টকর হয় বটে তবে ধর্মপূজার বিশুদ্ধ রীতি যে আজ রক্ষিত হয় নি সেকথা সকলেই স্বীকার করেছেন। তীর্থঙ্কর মূর্তির সামনে মানভূম অঞ্চলে অনেক জায়গায় আজ পশুবলি দেওয়া হয়। তাই ধর্মপূজায় কোনো এক সময়ে পশুবলি প্রবেশ করে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে ধর্মপূজার প্রচলন জৈনধর্ম হতে যে উদ্ভূত হয়েছিল সেকথা মনে করবার অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ, এই ধর্মপূজা বাঙ্‌লা দেশের রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বাঙ্‌লাদেশের এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। অনেকে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের 'ত্রিশরণ' মন্ত্রের ধর্মকেই এই ধর্ম বলে মনে করেন ও ধর্ম পূজাই বাঙ্‌লা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ নিদর্শন বলে থাকেন। কিন্তু ত্রিশরণ

মন্ত্রের ধর্ম কি কেবলমাত্র বৌদ্ধদের? কেবলীপন্নতং ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, কেবলীপন্নতং ধর্ম্মং মঙ্গলং—এ মন্ত্র জৈনরাও উচ্চারণ করেন। বিশেষ করে ধর্ম্মং মঙ্গলং লক্ষ্য করবার। মনে হয় এ হতে ধর্মমঙ্গল ও মঙ্গল কথার উদ্ভব হয়ে থাকবে। তাছাড়া ধর্ম মঙ্গলের ধর্ম যদি বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ মন্ত্রের ধর্মই হত তবে তা বাঙ্‌লাদেশের রাঢ় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেখানে এখনো বহু বৌদ্ধ বাস করেন সেখানে প্রচলিত থাকত।

দ্বিতীয়তঃ,

শূন্যমূর্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্তি ভজি ॥

এর সঙ্গে জৈন উপাসনা পদ্ধতির মিল আছে। জৈনরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না কিন্তু তীর্থঙ্করের সাকার মূর্তির উপাসনা করেন। মূর্তি উপাসনা জৈনদের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হতেই প্রচলিত। কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থাদির সমর্থনেই নয়, পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারেও একথা আজ অবিসম্বাদিত সত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত কায়োৎসর্গস্থিত মূর্তিগুলি যে জৈন মূর্তি সেকথা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করতে সুরু করেছেন।

তৃতীয়তঃ, মানসিক শোধের জন্য ধর্মের যে আড়ম্বরপূর্ণ পূজা হয় তা অক্ষয় তৃতীয়ায় আরম্ভ হয়। প্রথমেই মানসিক শোধ কথাটী লক্ষ্য করবার। মানসিক শোধ জৈনদের ত্রিবিধ 'কায়িক, বাচিক ও মানসিক' কথাকে স্মরণ করায়। দ্বিতীয়, অক্ষয় তৃতীয়া জৈনদের একটী বিশেষ পর্বদিন। এই দিনটীতে ভগবান আদিনাথ বা ঋষভদেব বার্ষিক তপস্যার পর পারণ করেন। সেইজন্য এই তিথিতে আজো বহু জৈন বার্ষিক তপস্যার (একান্তরী উপবাস) পর পারণ করেন ও এই উপলক্ষে শত্রুঞ্জয়ে (পালিতানা) বিরাট উৎসব ও মেলা হয়। প্রসঙ্গতঃ, আদিনাথ বৃষভলাঞ্ছন। (সিন্ধু সভ্যতার বহুল প্রচারিত বৃষ আদিনাথের লাঞ্ছন কিনা সেকথা বিবেচ্য।) এই লাঞ্ছনই মনে হয় পরবর্তীকালে বাহনরূপে রূপান্তরিত হয় ও আদিনাথ শিব রূপে সর্বত্র পূজিত হন। একথা মনে করবার কারণ এই যে আদিনাথের নির্বাণভূমি অষ্টাপদ বা কৈলাস। এই কৈলাসে আদিনাথের পুত্র ভরত (বিষ্ণু পুরাণের মতে যাঁর

নামানুসারে আসমুদ্র-হিমাচল এই ভূখণ্ডের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ) পিতার নির্বাণ লাভের পর রত্নময় মন্দির নির্মাণ করান ও আরো পরবর্তীকালে তাঁরই বংশধর সগর পুত্রেরা তার চতুর্দিকে খাল খনন করে গঙ্গা প্রবাহিত করেন। সে যা হোক, বাঙ্‌লাদেশের শিবায়ণ কাব্যের শিবের সঙ্গে এই আদিনাথের অনেক মিল দেখা যায়। শিবায়ণ কাব্যের শিব যেমন যোগী তেমনি ভোগীও। আদিনাথও তাই ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি যেমন মানুষকে কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষণাদি শিক্ষা দেন, পরবর্তী জীবনে তেমনি তিনি মুক্তিমার্গের উপদেশ দেন। শিবায়ণ কাব্যে কৃষি কর্মনিরত শিবের যে চিত্র পাই তা তাই মনে হয় জৈন আদিনাথের আদর্শের প্রভাব জাত।

চতুর্থতঃ, চরণপূজা জৈনদের একটী বিশেষত্ব। জৈনদের বহু মন্দির রয়েছে যেখানে কোন মূর্তি নেই, রয়েছে শুধু তীর্থঙ্কর বা আচার্যদের চরণ। ধর্ম পূজাতেও এই চরণ পূজাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

পঞ্চমতঃ, ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে। অহিংসা সম্পর্কে বৌদ্ধদের চাইতেও জৈনরাই বেশী সোচ্চার। তাছাড়া ভগবান মহাবীর মধ্যমাপাবায় যজ্ঞে সমাগত এগার জন ব্রাহ্মণকে প্রতিবোধদানে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই এগারো জন ব্রাহ্মণই পরবর্তীকালে ভগবান মহাবীরের প্রধান শিষ্য বা গণধর রূপে পরিচিত হন। ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করার মধ্যে মনে হয় এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত থেকে থাকবে। এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় যখন আমরা দেখি যে ধর্মপূজার আদিস্থান বল্লুকা জৈনশাস্ত্রোক্ত ঋজু বালুকা যার তীরে ভগবান মহাবীর কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। বল্লুকা বর্দ্ধমানের নিকটস্থ দামোদর হতে উদ্ভূত। শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মতে বর্তমান বর্দ্ধমানই প্রাচীন অস্থিক গ্রাম যেখানে মহাবীর শূলপাণি যক্ষকে শান্ত করেন এবং সেই হতে তাঁর নামে অস্থিক গ্রামের নাম হয় বর্দ্ধমানপুর।

ধর্মপূজার আর একটী বিশিষ্ট স্থান চম্পানদীর ঘাট। মহাবীর তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের শেষ চাতুর্মাস্য চম্পাতেই অতিবাহিত করেন। ধর্মমঙ্গলের রঞ্জাবতী 'শালে ভর দিয়া' পুত্র কামনায় ধর্মপূজা করেছিলেন। আমরা জানি শাল বৃক্ষের নিচেই ভগবান মহাবীর কেবল জ্ঞান-লাভ করেছিলেন এবং শাল বৃক্ষই তাঁর চৈত্য বৃক্ষ ছিল।

মনসা মঙ্গলের মনসা বা পদ্মাবতী কে ছিলেন তা অনুসন্ধানের জন্য আমরা বেদপুরাণ মহাভারত সমস্তই ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছি এবং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী হতে মহীশূরের মুদমা এমনকি কানাড়ী মনে মঞ্চম্মা পর্যন্ত ধাওয়া করেছি কিন্তু কোনো সময়েই জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শাসনদেবী বা শক্তি পদ্মাবতীর ওপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়নি। অথচ এই পদ্মাবতী সর্পদেবী, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তস্মিন্নেব তীর্থে সমুৎপন্নাং পদ্মাবতীং দেবীং কনকবর্ণাং কুক্ট-বাহনাং চতুর্ভুজাং পদ্মপাশস্থিতদক্ষিণকরাং ফলাং কুশধিষ্ঠিত বামকরাং চেতি। প্রবচন সারোদ্ধার, ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত্র ও আচার দিনকরের মতে কুকুর্ট বাহনাং অর্থ কুকুর্টজাতীয় সর্প যাঁর বাহন। পদ্মাবতীর বাহন যেমন সর্প, তেমনি এই সর্প তাঁর মাথায় ছত্র ধারণ করে থাকে। পার্শ্বনাথও সর্পছত্র। পার্শ্বনাথ সম্বন্ধে একটী কাহিনী প্রচলিত আছে যে পঞ্চাগ্নিতপ নিরত কমঠ সাধুর কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থ যুগল সর্পের তিনি প্রাণ রক্ষা করেন। লেঃ কর্ণেল ডাল্টন জৈন চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি ষষ্ঠীরূপে পূজিত হচ্ছেন তার উদাহরণ দিয়েছেন। তাই জৈন পদ্মাবতী পদ্মাপুরাণের পদ্মা বা মনসা রূপে পূজিত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? শব্দকল্পদ্রুমে কশ্যপেন মনসা সৃষ্টা দেবী 'মনসা দেবী' অলুক সমাস নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কশ্যপ তীর্থঙ্কর গোত্র। সুতরাং তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মানসোদ্ভূত শক্তি পদ্মাবতীর মনসারূপে রূপান্তরিত হওয়া খুবই সম্ভব। এবং আরো একটী লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে প্রাচীন যে সমস্ত মনসা মূর্তি পাওয়া গেছে তার সমস্তই বীরভূম অঞ্চল হতে।

তাছাড়া বেহুলা কাহিনীর উদ্ভবের মূলেও রয়েছে হয়ত কোনো প্রাচীন জৈন কাহিনী। বেহুলার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ মনোভাব ও স্বামীকে নিয়ে মান্দাসে করে যাত্রায় অনেকে দ্রাবিড় গন্ধ পেয়েছেন। কারণ এই স্বাধীন মনোভাব বাঙালী সমাজে সুলভ নয়। এই প্রসঙ্গে জৈন সাহিত্যের একটী প্রাচীন কাহিনী শ্রীপাল চরিত্রের কথা মনে পড়ে। সেখানেও দেখি মূল চরিত্র ময়না কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও নিজের ভক্তি ও আত্মত্যাগের দ্বারা স্বামীকে সুন্দর স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনছেন। তাঁর স্বচ্ছন্দতা ও নির্ভীকতা বেহুলার মতো। তাছাড়া সেই কাহিনীর স্থান অঙ্গদেশের চম্পানগরী। বেহুলার কাহিনীর স্থানও চম্পকনগর। জৈনধর্মের

প্রসার বণিক সম্প্রদায়েই বেশী দেখা যায়। মনসা মঙ্গলে ত বটেই মঙ্গল কাব্যেও বণিক সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে মনসা মঙ্গল সম্পর্কে বলেছেন যে বিহারই (অঙ্গদেশ) এই গীতির আদিস্থান।

চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীও কি জৈনদের ষোল মহাবিদ্যার চণ্ডী ? না আদিদেব বা আদিনাথের শক্তি বা শাসনদেবী চক্রেশ্বরী ? মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় যে আদিদেব বা ধর্মের শক্তিস্বরূপিনী আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। আদিনাথ, আদিদেব বা ধর্মের নাম শুনলেই আমরা তাকে বৌদ্ধ বলে মনে করে নেই, ভুলে যাই যে আদিনাথ বা আদিদেব ছিলেন জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর। তাঁকে আদিনাথ বা আদিদেব বলবার কারণ এই যে এই অবসর্পিণীতে তিনিই ছিলেন ধর্মের প্রথম প্রবর্তক।

চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের কথা আগেই বলেছি এবং তার ভাষা রাঢ় অঞ্চলের সেকথাও বলা হয়েছে। চর্যাচর্য বিনিশ্চয় যে সমস্ত সিদ্ধাচার্যদের রচিত লুইপাদ তাঁদের মধ্যে আদি সিদ্ধ। এই লুইপাদকে অনেকে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাঙলাদেশে মীননাথ হতে যে নাথ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে তাঁরা অজিতনাথ, সম্ভবনাথ, শীতলনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রমুখের শিষ্য সম্প্রদায়। স্বাধ্যায় নিষ্ঠার অভাবে শিথিলাচার হয়ে ক্রমশঃ তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গেছেন। মনে হয় এর মধ্যে অনেকখানি সত্য রয়েছে। কারণ, জৈন ধর্মের সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্যই নয়, নাথ সাহিত্যে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী হতে আরো এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে আদিনাথই এই মার্গের প্রথম উপদেষ্টা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ তাঁর কৃপাতেই নাথ ধর্ম প্রচার করেন। নেপালে পাওয়া একটা পুঁথিতে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক রচনায় দেখা যায় :

শ্রীআদিনাথ কহিয়ে উপদেশ।

এই আদিনাথ যে জৈন প্রথম তীর্থঙ্কর বৃষভলাঞ্ছন আদিনাথ তাতে সন্দেহ নেই। এ হতে আমরা কেবলমাত্র চর্যাচর্য বিনিশ্চয়েই নয়, পরবর্তী শৈব নাথ তন্ত্রেও জৈন প্রভাবের মূলসূত্র আবিষ্কার করতে পারি।

অনুবাদ শাখায়[১] বাঙলা রামায়ণেও জৈন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃত্তিবাসীর :

পঞ্চ মাস আছে গর্ভ সীতার উদরে।
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই বসেছেন ঘরে॥
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে চিরুণী।
সীতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণী॥
সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ॥

সীতা বলে সে ছাবে না দেখি কোনো কালে।
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে॥
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ।
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ॥

হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশ স্কন্ধ॥
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হইল যত নারী॥
সীতার পাশে দেখি রাম লিখিত রাবণ।
সত্য অপযশ মম করে সর্বজন॥

এ সম্পর্কে ডাঃ দিনেশচন্দ্র সেনের অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি : "মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সঙ্গে যে উত্তরাকাণ্ড জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা এ পর্যন্ত তাঁহারই নামে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সীতার প্রতি রামের কোনো হীন সন্দেহ স্থান পায় নাই। 'তিনি জগৎ মধ্যে শুদ্ধা, তিনি আমার

প্রতি প্রীতা হউন' রাম এইরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা বনবাস বাঙ্‌লা রামায়ণে যে সন্দেহের ভিত্তির ওপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা জৈন রামায়ণ অবলম্বনে। ...এককালে বাঙ্‌লা দেশে জৈন প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাঁহারা রাম ও রাবণ সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন আখ্যায়িকা এ দেশে লইয়া আসিয়াছিলেন। জৈন রামায়ণে সীতার সতিনী তাঁহাকে রাবণের আকৃতি অঙ্কণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।" এই ধারারই অনুসরণ করে চন্দ্রবতী রামায়ণের কুকুয়াও—

আবার সীতারে কয় রাবণ আঁকিতে ॥
এড়াতে না পারি সীতা গো পাখার ওপর।
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজালঙ্কেশ্বর ॥
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল।
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলে দিল ॥

কুকুয়া কৈকয়ী কন্যা, সীতার ননদ। কুকুয়া তখন রামকে ডেকে নিয়ে এসে দেখাল—দেখ, তোমার সাধ্বী সীতা এখনও রাবণকে ভুলতে পারেনি, তার ছবি এঁকে বুকে লুকিয়ে রেখেছে।

রামের বহুপত্নীত্বও জৈন ধারারই অনুবর্তন।

বদ্রী বিশাল কী ভগবান ঋষভ দেব ?

শ্রীতাজমল বোথরা

বদ্রী বিশালের মূর্তিই সম্ভবতঃ এমন একটী নারায়ণ মূর্তি যাকে ধ্যান মুদ্রায় দেখানো হয়েছে। এ ধরণের হাজারো তীর্থংকর মূর্তি ভারতবর্ষের সব খানে পাওয়া যাবে। তাছাড়া বদ্রীনাথের মূর্তি খুব পুরুণো, ভাঙা ও যার মাত্র দুটী হাত রয়েছে এবং সে হাত কোলের ওপর ধ্যান মুদ্রায় একটীর ওপর আর একটী রাখা। রাওয়াল, যিনি বদ্রীবিশালের পূজোর একমাত্র অধিকারী, তিনি একাহার করেন এবং সেও দিনের বেলায়, রাত্রে নয় ও আলু জাতীয় উদ্ভিদ যা মাটীর নীচে হয় তা খান না। জৈন উপাসকের সংযত জীবনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আশ্চর্য রকমের এবং এ হতে এ ধারণাই দৃঢ় হয় যে মূর্তিটি কোনো জৈন তীর্থংকরের। নির্বাণ অভিষেকের সময় আবার যে মন্ত্র পাঠ করা হয় সে মন্ত্রও হিন্দু মন্ত্র হতে ভিন্ন।

বহু দিন আগে শ্রীসহজানন্দঘনজী মহারাজ যখন একবার বদ্রীনাথ যান তখন তিনি মূর্তি দেখে এই অভিমত ব্যক্ত করে ছিলেন যে মূর্তিটি তীর্থংকরের। জৈন সাধু শ্রীবিদ্যানন্দজী মহারাজও মূর্তিটি যে নগ্ন ও ভগবান ঋষভ দেবের সেকথা বলেন। তীর্থংকরদের মধ্যে একমাত্র ঋষভদেবের মাথায় জটা দেখানো হয় ও তিনি হিমালয়ে কৈলাস পর্বতে নির্বাণ লাভ করেন। মূর্তির বসা অবস্থায় ধ্যান মুদ্রা, হাতের ওপর হাত রাখা, মাথায় জটা, নগ্নতা ও উপাসনা বিধি ইত্যাদি মূর্তিটি যে জৈন তীর্থংকরের সে দিকেই নির্দেশ করে।

এই অভিমত যে কেবল মাত্র জৈন সাধু বা গৃহীদের তা নয়, হিন্দু পর্যটকরাও বিষয়টীকে এই ভাবে উপস্থাপিত করেছেন যার তাৎপর্য হল মূর্তিটি ভক্তের অভিলাষানুযায়ী তার কাছে সেই রূপে পরিদৃষ্ট হয়। শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁর 'উত্তরাখণ্ড-কী যাত্রা'য় লিখেছেন :

"বদ্রীনাথ মন্দিরের তিনটী ভাগ—অন্তবর্তী গৃহ গর্ভগৃহ। সেখানে অন্যান্য মূর্তিসহ বদ্রীনাথের মূর্তি রক্ষিত। মূর্তিটি ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং কাল পাথরের, পৃষ্ঠফলকসহ একই সঙ্গে ক্ষোদিত।

"বদ্রী বিশালের এই মূর্তি পদ্মাসনে বসা ধ্যান মূর্তি। ধ্যানাবস্থায় কোলের ওপর যেমন হাতের ওপর হাত রাখা থাকে ঠিক সেই ভাবে।

"বৌদ্ধরা এটিকে বুদ্ধ মূর্তি বলে দাবী করেন। জৈনরা পার্শ্ব বা ঋষভনাথের মূর্তি বলে অভিহিত করেন। তবে সাধারণে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে ভক্তের অভিলাষানুযায়ী তাঁর নিকট তিনি তৎ তৎরূপে পরিদৃষ্ট হন। বক্ষদেশে ভৃগুপদ চিহ্ন বা শ্রীবৎস লক্ষণীয়।" (পৃঃ ২১-২৪)

বলা বাহুল্য তীর্থংকরের বক্ষদেশে শ্রীবৎস চিহ্ন উৎকীর্ণ থাকে।

লাক্ষ্মৌর লালা রাম নারায়ণ তাঁর 'মেরে উত্তরাখণ্ড-কী যাত্রা'য় (১৯৪২) বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপিত করেছেন:

"বদ্রী বিশালের দরজায় দুটী সোনার পত্রক সহ কলস অঙ্কিত। দরজাটী পূব দিকে খোলে।" (পৃঃ ৬৫)

"পূজারী. এবারে আমাদের সেই মূর্তি দেখালেন যা তিনি সিংহাসনের মাঝখানে বসালেন। মূর্তির গায়ে তখন কোনো অঙ্গ সজ্জা ছিল না। রাওয়াল (পূজারী যে নামে অভিহিত হন) প্রদীপ আরো একটু উজ্জ্বল করে দিলেন। সেই আলোয় মূর্তিটি কালো পাথরের ও দৈর্ঘে এক হাত মতো বলে মনে হল। মূর্তিটিকে এভাবে দেখার পর আমার পূর্ব রাত্রের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। মূর্তির ডানদিকে কুবের, উদ্ধব, গণেশ ও গরুড়, বাঁ দিকে নারায়ণ মূর্তি। মূর্তির কাছে ঘণ্টাকর্ণ বা ক্ষেত্র পাল। সিংহাসনটী সম্পূর্ণ রূপোর তৈরী, এবং পূজায় ব্যবহৃত সমস্ত বাসনও আবার রূপোর।" (পৃঃ ৭২)

লালজী এই বলে শেষ করছেন: "মূর্তিটি এমন ভাবে তৈরী যে, যে যেভাবে দেখতে চায় সে সেই ভাবেই এই মূর্তিটিকে দেখতে পায়।"

মূর্তিটি সম্পর্কে শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখনী হতে একটী সুন্দর বিবরণ পাই। তিনি তাঁর 'হিমালয়ের পথে পথে' গ্রন্থে লিখছেন:

"কালো পাথরের মূর্তি। প্রায় ফিট দুই উঁচু। কেউ বলেন যোগাসন, কারু মতে সিদ্ধাসন। চরণ দু'খানি দেখা যায়; চরণে পদ্ম চিহ্ন—বর্ণনায় শুনি। দুইটী হাত কোলের উপর রাখা—স্পষ্ট দেখা যায়। কারো মতে চতুর্ভুজ মূর্তি—অপর দুইটী হাত এক সময়ে থাকার কয়েকটি নিদর্শন মূর্তির

অঙ্গে দেখানো হয়। কম্বু গ্রীব—প্রদীপের আলোকেও শাঁখের ন্যায় রেখা গ্রীবায় স্পষ্ট ফোটে। যোগী নারায়ণ—শিরোভাগ থেকে জটা ভার নেমে এসেছে দু'দিকে কাঁধের উপর। বুকের উপর উপবীত, মধ্যখানে ভৃগুপদ চিহ্ন। বিশাল বক্ষ। ক্ষীণ-কটি। সুন্দর লীলায়িত মূর্তি। কিন্তু মুখ মণ্ডলের অস্তিত্ব নেই—যেন কিসের আঘাতে অবলুপ্ত হয়েছে—এমনি মসৃণ, সমতল!

"এ-মূর্তি কোন দেবতার তা নিয়ে মতভেদ আছে। সে কথাও প্রচার করা হয়। বৈষ্ণবরা এই বিগ্রহে দেখেন চতুর্ভুজ নারায়ণ। শৈবরা বলেন, দ্বিভুজ জটাধারী শিব মূর্তি। শক্তি উপাসকদের মতে—দেবী ভদ্রকালীর মূর্তি। জৈনরা বলেন, ইনি তীর্থংকর। আবার, কারো মতে—এটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি; নারায়ণের প্রাচীন মূর্তি অপসারিত হবার পর, এই মূর্তি তিব্বত থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবাদ আছে, রাজা বৈখানস বদরী নারায়ণের মূর্তিতে রামচন্দ্রজির পূজা করতেন। ব্যাখ্যাকারী উপসংহারে বলেন দেবতার মূর্তি যে ভক্ত যেমন বিশ্বাস নিয়ে দেখবেন তিনি এখানে সেই রূপেরই সেই ভাবে দর্শন পাবেন।…

"শোনা যায়, বদরীনাথে নারদকুণ্ড থেকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এখনকার এই মূর্তি উদ্ধার করেন এবং গরুড় শিলার কাছে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে, ১৫শ শতাব্দীতে গাড়োয়ালের এক মহারাজা বদরীনাথে একটি মন্দির নির্মাণের জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং এখন যেখানে মন্দির সেইখানে মূর্তিটি নিয়ে আসেন।" (পৃঃ ১৪৩-৪৪)

কিম্বদন্তী ও পুরাণ কথা বিষয়টার ওপর আলোকপাত না করে বরং আরো ঘোরালো করে তুলেছে; তবে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের অভিমত এই যে আমরা যেন তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কেবল মাত্র মূর্তির পর্যবেক্ষণের দ্বারাই সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করি। এবং তা যদি করা হয় তবে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে একথা বলা যাবে যে মূর্তিটি ভগবান ঋষভদেবের যাঁর মাথার দু'দিক হতে জটাভার নেমেছে এবং যিনি হিমালয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। মুখ যে ভেঙে দেওয়া হয়েছে তাও ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়। যাতে এটিকে তীর্থংকর মূর্তি বলে চেনা না যায়। শিল্প সম্পদকে এভাবে বিকৃত করবার নিদর্শন

অন্যত্রও দেখা যায়। বসা ধ্যান মূর্তি, জৈন সিদ্ধান্তানুযায়ী হাতের অনুস্থাপন প্রত্যেকটাই ইনি যে বিতরাগী পরম্পরার সে কথা বলে। মূর্তিটি যে বৌদ্ধ মূর্তি নয়, শরীরে কাপড়ের চিহ্ন না থাকায় এর নগ্নতা দৃষ্টে তা বলা যায়। মূর্তি ছাড়াও মন্দিরের গর্ভগৃহ, সভামণ্ডপ ইত্যাদির রচনা শৈলীতে, মন্দিরের দরজায় দুইটা স্বর্ণ পত্রকসহ কলস স্থাপনে ও দরজা পূর্বদ্বারী করায়, রূপোর সিংহাসনে মূর্তিকে মাঝখানে বসানোতে ও পূজার জন্য রূপোর বাসন ব্যবহার করায়, ঘণ্টাকর্ণ বা ক্ষেত্রপালের উপস্থিতিতে, পরিকর সহ মূল নায়ক একই পাথরে ক্ষোদিত করায়, নির্বাণ অভিষেকে ও রাওলের সংযত জীবন যাপনে মূর্তিটি যে জৈন তাই অনুমিত হয়।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. II. No. 7 Sraman Oct.-Nov. 1974

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১.	সাতটী জৈন তীর্থ	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩.০০
২.	অতিমুক্ত	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৪.০০
৩.	শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩.০০
৪.	শ্রাবককৃত্য	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	নিঃশুল্ক

हिन्दी

१ श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला
—श्री कान्तिसागरजी महाराज ५.००

२ श्रीमद् देवचन्द्रकृत अध्यात्मगीता
—श्री केशरीचन्द धूपिया .७५

English

1. Bhagavati Sutra
   (Text with English Translation)
   —Sri K. C. Lalwani
   - Vol. I (Satak 1-2) 40.00
   - Vol. II (Satak 3-6) 40.00
2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha .75
   tr. by Sri Ganesh Lalwani
3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani .50

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮১ ॥ অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

"গৌতম, আমার নির্বাণের পর লোকে বলবে—'নিশ্চয়ই এখন কোনো জিন দেখা যাচ্ছে না।' কিন্তু গৌতম, আমার উপদিষ্ট ও বিবিধ দৃষ্টিতে প্রতিপাদিত পথই পথ-প্রদর্শকরূপে বর্তমান থাকবে।"

"গ্রাম ও নগরে যেখানেই যাবে সংযত থেকে শান্তি পথের অভিবৃদ্ধি করবে, অহিংসা পথের প্রচার করবে।"

—ভগবান মহাবীর

মহাবীর স্বামী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

'জ্ঞান-ক্রিয়াভ্যাং মোক্ষঃ'

জ্ঞানপ্রভা-দীপ্ত তব চিত্ত অভিরাম,
রাজপুত্র, ভারতের যুগ-অন্ধকারে
জ্বালিলে অতুল শিখা। ত্যজি' সর্বকাম—
জীবনের জয় বার্ত্তা দিলে দ্বারে দ্বারে।

সত্যসাধনার তৃপ্তি, কর্ম বন্ধনের
চির বিলুপ্তির পথ স্বীয় মাঝে আনি,
প্রতিজনে বিতরিয়া পরম মোক্ষের
প্রাণ দ্যুতি, শ্রেয়োলাভে জাগালে, সন্ধানি'!

সাধকের হৃদি-মন নমে তব নামে,
মহাসিদ্ধ, জয়জিৎ, আদর্শ গম্ভীর,
তীর্থস্রষ্টা, ধর্মময়, অহিংস সংগ্রামে
মহাবীর, আনন্দ-প্রতীক ধরিত্রীর।

প্রকাশ দীপ

ভগবান মহাবীর ২৫০০ বৎসর পূর্বে যে উদার আদর্শ বহির্জগতে প্রচার ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—সেই অপরিগ্রহ ও অহিংসার বাণী আজও আমাদের জীবনে ও সমাজে যেন চিরন্তন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়ে যাবে যদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে লোভ ও হিংসাকে আমরা জয় করতে না পারি। মহাত্মা গান্ধিও এই বাণীই তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গেছেন—অহিংসাই সংসারে চরম সত্য। জৈন ধর্মের প্রভূত প্রভাব গান্ধিজীর জীবনে ও তাঁর পরিবারে সঞ্চারিত হয়েছিল। জৈন ধর্ম সেকালের এক বিস্মৃত-প্রায় 'দর্শন' মাত্র নয়, জৈন সিদ্ধান্ত আধুনিক ও ভবিষ্যৎ কালেও মানব সমাজের সংগঠন ও সংরক্ষণে কাজে লাগবে একথা আমাদের মনে রাখা দরকার।

—ডঃ কালিদাস নাগ

ভারতীয় ধর্মচিন্তায় যে যে ক্ষেত্র মহাবীরের শিক্ষার দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা হইতেছে আত্মা বিষয়ক চিন্তা; কর্মফলবাদ অর্থাৎ আচরণ বা চরিত্রই ধর্মাধর্মের মূল অঙ্গ; মোক্ষলাভে ইহজন্মের বা মানব জন্মের সার্থকতা এবং পুরুষাকারের শিক্ষা অর্থাৎ জীব সম্পূর্ণতঃ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। সে যুগের যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডময় পুরোহিত-পরিচালিত ধর্মের ও দেবোপাসনায় স্বর্গলাভ-ধর্মের বাতাবরণের মধ্যে এই শিক্ষার খুব প্রয়োজন ছিল।

—ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন

মহাবীরের কর্মবাদের আদর্শও কর্ম কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে নাই। মোক্ষলাভে প্রত্যেক মানুষেরই চিরন্তন জন্মগত অধিকার রহিয়া গিয়াছে। মহাবীরের কর্মবাদে এই অধিকারকে নূতন করিয়া স্বীকৃতি দেয়। ফলে সেদিনকার সামাজিক ও জাতিগত বৈষম্যের উপর পতিত হয় এক প্রচণ্ড আঘাত। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ঘোষণা করে জীব জগতের প্রতিটি হিংসাত্মক কার্যেরই রহিয়াছে এক দূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া, তাই তাঁহার ধর্মের আদর্শ মানুষের হৃদয়ে এক উচ্চতর সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তোলে।

—শঙ্করনাথ রায়

মহাবীর ছিলেন প্রকৃত মহাবীর।…ইতিহাস লেখকেরা মিথ্যা করে পাইকারী হত্যার নেতা আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন প্রমুখ দিগ্বিজয়ীদের মহাবীর রূপে বর্ণনা করে মহা অন্যায় এবং মহা ক্ষতি করেছেন। অগণিত মানুষের মৃত্যুর এবং অন্যান্য নানাবিধ দুঃখের যাঁরা কারণ হন, তাঁদের প্রশংসা না করে ধিক্কার দেওয়া উচিত; তাঁদের প্রাপ্য অভিনন্দন নয়—নিন্দা, তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় নয়—বর্জনীয়; তাঁরা মহাবীর আখ্যার কোনো প্রকারেই যোগ্য নন্। অহিংসা কাপুরুষতা নয়, খাঁটি অহিংসাতেই আছে মহান বীরত্ব। …মহাবীরের নামটি (তাই) আমার কাছে শুধু একটি নাম নয়, একটি মহান প্রতীক।

—অজিতকৃষ্ণ বসু

আমরা কেবল ভুলি

শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

আমরা কেবল ভুলি। কিন্তু তবু কই
ভুলেছি একথা ভেবে আশ্চর্য কি হই ?
অহিংসা, তিতিক্ষা, প্রেম, আজো তা না হ'লে
কি করে বিস্মৃত হই ? সারা বিশ্ব চলে
কেন আজো মাৎস্যন্যায়ে ? কেন আজো আছে
ক্ষুরধার তরবারি প্রত্যেকের কাছে
মনের গভীরে রাখা ? কোন প্রয়োজন
আছে তাকে পুষে রেখে, জানে নাকো মন।
তবু রাখি। হয় তো বা নিজেও জানি না।
শান্তি কোথা, তোমার ও পুণ্য স্মৃতি বিনা ?

ভগবান মহাবীর

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

যে মন্ত্র তুমি করে গেছ দান
ভগবান মহাবীর,
দেশে দেশে আর যুগে যুগে তাই
এনেছে তো প্রত্যাশা
তোমাকে যে স্মরে—এমন সাধুই
সত্য শপথে স্থির,
তুমি দিয়ে গেছ অহিংসা-বাণী—
ক্ষমা-ত্যাগ-ভালোবাসা!

সকল ধর্ম তোমাতে মিশেছে—
মিশেছে মিত্র-অরি।
তীর্থংকর, হে যোগীপ্রবর,
তোমাকে প্রণাম করি॥

ভগবান মহাবীর

শ্রী আর. ডি. ভাণ্ডারে

ভগবান মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণ উৎসবের উদ্বোধন করবার যে সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই উৎসব দেশের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ভগবান মহাবীরের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় মুনিদের জায়গায় জায়গায় অভিভাষণ হবে। সেই অভিভাষণ হতে আপনারা জীবন নির্মাণের অনেক প্রেরণা লাভ করবেন। তবে পাবাপুরীর এই উৎসবের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই পাবাপুরীতে ভগবান মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন ও সংসারের জীবন মৃত্যুর প্রবাহ হতে নিজেকে সর্বথা মুক্ত করে নেন। নির্বাণ লাভ খুবই শক্ত এবং তা দু'একজন লোকই করতে পারে। কারণ সত্য জ্ঞান ছাড়া নির্বাণ লাভ করা যায় না এবং সত্য জ্ঞানের পথে পদে পদে বাধা ও প্রলোভন ছড়ানো। এদের ওপর তিনিই জয় লাভ করতে পারেন যিনি অসীম সাহসী ও সঙ্কল্পে অটল।

কল্পসূত্র ও মহাবীর পুরাণে ভগবান মহাবীরের যে জীবন পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তবে তাঁর দর্শন ও উপদেশে কোনো পার্থক্যই নেই। মহাবীর এক নির্ভীক, দৃঢ়চেতা ও সাহসী যুবক ছিলেন। এক সমৃদ্ধ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। সুখী সাংসারিক জীবন যাপন করবার সমস্ত সাধন তাঁর করায়ত্ত ছিল। ধন সম্পদের তাঁর কোনো অভাবই ছিল না। সুন্দরী স্ত্রী ছিল ও পরিবার পরিজন। কিন্তু সে সমস্তকে তাঁর হেয় বলে মনে হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন সেই সুখ যার অন্ত নেই। তিরিশ বছর বয়সে তাই সংসার পরিত্যাগ করে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। নিজের ধন সম্পদ জন সাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তাই মনে হয় সংসার পরিত্যাগের বাসনা তাঁর মনে অনেক আগেই উদিত হয়েছিল। সংসারে তাঁর কোনো অনুরাগ ছিল না। জৈন মান্যতা অনুসারে মাথার চুল উৎপাটিত করে তিনি স্বয়ং প্রব্রজিত হন। এ যে কত বড় ত্যাগ ও সাহস তা আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন।

দীর্ঘ বারো বছর মহাবীর তপস্যা করেন। সাধনার তেরো বছরে তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হন। জ্ঞানের সন্ধান ও পথ কত দুরূহ ও কষ্ট সাধ্য তা এ হতেই অনুমান করা যায়। মহাবীর এভাবে কঠোর তপস্যায় কর্মরজঃ ক্ষয় করে নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর বিজয় প্রাপ্ত হন। তিনি যে জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন তাকে কেবল-জ্ঞান বলে যা সর্বোচ্চ, অব্যবাধ, অভাব-রহিত ও পরিপূর্ণ। মহাবীর সেই জ্ঞান নিজের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি। সেই জ্ঞান যাতে সকলেই লাভ করতে পারে তার জন্ম দীর্ঘ তিরিশ বছর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। বছরের আট মাসই তিনি প্রব্রজন করতেন, শুধু বর্ষার চার মাস এক স্থানে অবস্থান। বর্ষার সময় জীবের অভিবৃদ্ধি হয়, তাই যাতে তাঁর চলায় জীবহানি না হয় তার জন্য এই নিয়ম। মহাবীর এভাবে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান ও সদাচারের উপদেশ দিয়েছেন ও নিগ্রন্থ মতবাদ প্রচার করেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের কথা রাজার প্রাসাদ হতে দীনতম দরিদ্রের কুটীরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। সমস্ত জাতি ও বর্ণের জন্য তাঁর দরজা ছিল সর্বদাই খোলা। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ছিল তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবার সমান অধিকার। বিশ্ব মৈত্রীর ভাবনা তাই তাঁর প্রচারের মধ্যে দিয়ে দিকে দিকে প্রসারিত হল। তিনি বললেন মুক্তি বা মোক্ষ লাভের পথ সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্রের পথ। 'সম্যকদর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষঃমার্গঃ'। সম্যক দর্শনের অর্থ তীর্থংকর বাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস জাত তত্ত্বের যে সত্য বা পূর্ণ জ্ঞান তাই সম্যক জ্ঞান। তদনুযায়ী জীবন যাপন সম্যক চারিত্র বা সদাচারময় জীবন। মহাবীর সম্যক চারিত্রের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ সম্যক চারিত্র জাত বিশুদ্ধতা ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনের বাসনা কামনার ওপর জয় লাভ করা যায় না এবং সমাজেও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা হয় না।

ভগবান মহাবীরের উপদেশ কোনো বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্রের জন্য সীমিত ছিল না। জৈন দর্শনের পৃষ্ঠভূমি অনেকান্ত। দীর্ঘ ২৫০০ বছর তা আমাদের অনুপ্রাণিত করে এসেছে এবং তার দ্বারা আমাদের জীবনও সমৃদ্ধ হয়েছে। সদাচারের জন্য মহাবীর যে পাঁচটী বিষয়ের

ওপর জোর দিয়েছিলেন, তার একটি অহিংসার ওপরই জৈনরা আজ কেবল গুরুত্ব দেন। এই গুরুত্বের জন্য রাত্রে পর্যন্ত তাঁরা আহার করেন না। অহিংসা পরমো ধর্মঃ সন্দেহ নেই তবে তাকে জীব হত্যা না করাতেই সীমিত রাখা ঠিক নয়। অনেকান্ত বৌদ্ধিক অহিংসা। অহিংসার ক্ষেত্র তাই অনেক বিস্তৃত। সাহস, পরোপকার, কাউকে পীড়া না দেওয়া ইত্যাদিও অহিংসার অন্তর্গত।

ভগবান মহাবীরের উপদেশ আমাদের ভালো ভাবে বুঝতে হবে ও তাকে জীবনে রূপায়িত করতে হবে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা প্রধানতঃ সমাজের সুসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী অংশ। তাই তাঁরা যদি সদাচার-সম্পন্ন হন তবে সমাজের রূপ সহজেই পরিবর্তন করতে পারবেন; নৈতিকতার প্রকাশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করতে পারবেন। আজকের পৃথিবীতে এর প্রয়োজন আছে। জৈন ধর্মে যেমন অহিংসার ওপর জোর দেওয়া হয় তেমনি সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহের ওপরও জোর দেওয়া হোক।

শ্রদ্ধেয় অমর মুনি একটু আগেই বললেন যে জৈনধর্ম সমভাব সাধনের ধর্ম। বাস্তবেও সমভাব, সমতা, সমদৃষ্টি ও সাম্য জৈনধর্মের মূল। শ্রম, জ্ঞান ও সাম্য, যার ওপর জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত, আজকের নূতন সমাজের তার ওপরই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারণ একমাত্র সেই ভাবেই সমাজের দুর্বল অংশের শোষণ বন্ধ হতে পারে ও সামাজিক ন্যায়ের ওপর এক সুন্দর, সুস্থ ও সবল সমাজের প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

ভগবান মহাবীরের নির্বাণভূমি পাবাপুরীতে অনুষ্ঠিত ভগবান মহাবীরের ২৫০০তম নির্বাণ মহোৎসবে প্রদত্ত বিহারের রাজ্যপাল শ্রী আর. ডি ভাণ্ডারের অভিভাষণ।

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

কেবল-জ্ঞান লাভ করে ঋজুবালুকা তীর হতে বর্দ্ধমান একরাত্রে বারো যোজন পথ অতিক্রম করে এলেন মধ্যমা পাবায়।

মধ্যমা পাবায় আসবার কারণ তখন সেখানে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন আচার্য সোমিল। সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সর্ব ভারতীয় পণ্ডিতদের। বর্দ্ধমান দেখলেন, তিনি যদি এখন সেখানে যান, যদি সেই সর্ব ভারতীয় পণ্ডিতদের স্বমতে আনতে পারেন তবে নিগ্রর্ন্থ ধর্ম প্রচারে তা তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করবে। তাঁরা তাঁর তীর্থ প্রতিষ্ঠার কাজে সরিক হবেন।

বর্দ্ধমান তীর্থ প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন, তিনি তীর্থংকর।

যাঁরা কেবল কেবল-জ্ঞান লাভ করে নিজেরাই মুক্ত হন তাঁরা জিন, অর্হৎ, কেবলী, কিন্তু তীর্থংকর নন্। যাঁরা নিজেরা মুক্ত হয়ে অন্যের মুক্তির পথ নিরূপণ করে দেন ও চতুর্বিধ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা তীর্থংকর।

জিন, অর্হৎ বা কেবলী অনেক হয়েছেন, কিন্তু তীর্থংকর?

এই অবসর্পিনীতে মাত্র চব্বিশটী। বর্দ্ধমান সেই চব্বিশ সংখ্যক তীর্থংকর।

অবশ্য বর্দ্ধমান মধ্যমা পাবা যাবার আগে দেবতারা ঋজুবালুকা তীরে তাঁর ধর্মসভা বা সমবসরণের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু সেই সমবসরণে কেবল মাত্র দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। তাই বর্দ্ধমানের উপদেশে কেউই সংযম ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি। তীর্থংকরের উপদেশ এভাবে কখনো ব্যর্থ যায় না। তাই এই ঘটনাকে জৈন সাহিত্যে 'অচ্ছেরা' বা আশ্চর্যজনক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বর্দ্ধমান মধ্যমা পাবায় এসে মহাসেন উদ্যানে আশ্রয় নিলেন।

বৈশাখ শুক্লা দশমী। বর্দ্ধমানের উপদেশ শুনতে দলে দলে মানুষ চলেছে। কেউ হেঁটে, কেউ রথে, কেউ চতুর্দোলায়। কারু চিনাংশুকের বসন, কেউ নিরাভরণ। পশুপক্ষীও চলেছে। আকাশ পথে দেবতারা।

বর্দ্ধমান সেই উপদেশ সভায় সকলকে সম্বোধিত করে উপদেশ দিলেন। বললেন জীব ও অজীবের কথা, পাপ ও পুণ্যের কথা, আস্রব ও বন্ধের কথা, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষের কথা।

মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনি ফলভোগ। সৎকর্ম করলে স্বর্গ, অসৎ কর্ম করলে নরক।

কিন্তু স্বর্গও কি কাম্য? মানুষ স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করে। যজ্ঞে পশু বলি দেয়। জীব হত্যা করে।

হিংসা কখনো ধর্ম হতে পারে না। স্বর্গ-সুখও অশাশ্বত। স্বর্গ হতেও মানুষ ভ্রষ্ট হয়। তাই মুক্তিই একমাত্র কাম্য।

জীব মুক্তই। অনন্ত জ্ঞান, দর্শন, বীর্য ও আনন্দ তার স্বরূপ। শুধু কর্মের আবরণ তাকে আবৃত করে রেখেছে। যেমন লাউয়ের খোল। মাটির প্রলেপ দিয়ে জলে ফেলে দিলে ডুবে যায়। কিন্তু মাটি গলে গেলেই আবার ভেসে ওঠে।

কর্ম সংস্পৃষ্ট মানুষ সংসার সমুদ্রে ডুবে রয়েছে। কর্মের আবরণ দূর করে দাও আবার ভেসে উঠবে, উর্দ্ধগতি লাভ করবে।

কর্ম সংস্পৃষ্ট হওয়ার নামই আস্রব। আস্রবের পরিণাম বন্ধ।

সঞ্চিত কর্মের যেমন ক্ষয় করতে হবে, তেমনি নূতন কর্ম বন্ধনের নিরোধ। এরই নাম সংবর ও নির্জরা। চৌবাচ্চার জল খালি করে দিলেই হবে না, দেখতে হবে তাতে যেন নূতন জল জমে না ওঠে।

কর্ম যখন নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন মুক্তি।

এরজন্য সর্ব নিয়ন্তা ঈশ্বরের কল্পনা করবার দরকার নেই কারণ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন বললে কে তাঁকে সৃষ্টি করেছিল, তাঁর স্বরূপ কি সে সব প্রশ্নও তুলতে হয়।

তাই বিশ্বাস করো জীব অনাদি। কর্মও অনাদি। তবে কর্মের অন্ত

আছে, কর্ম অনন্ত নয়। কর্ম অন্তের যে পথ সেই পথ জিন নির্দিষ্ট পথ, সেপথ সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্রের পথ।

এই সত্য, এছাড়া সত্য নেই এই বিশ্বাসের নাম সম্যক দর্শন। এই বিশ্বাস জনিত যে সত্য জ্ঞান তাই সম্যক জ্ঞান। তদনুরূপ যে আচরণ তাই সম্যক চারিত্র।

সম্যক দর্শন বা বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। চাই জ্ঞান, তত্ত্বের অবধারণ। কিন্তু তত্ত্বের অবধারণও বৃথা যদি না হয় তদনুরূপ আচরণ। তাই এই তিনটিকে একত্রে আরাধনা করতে হয়।

. এই তিনটী মিলে এক ত্রিপুটী—ত্রিরত্ন। তিনে এক, একে তিন।

সম্যক চারিত্রের জন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থংকর অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ও অপরিগ্রহের কথা বলেছিলেন; মহাবীর তার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য যোগ করে দিলেন।

পার্শ্বনাথের চতুর্যাম ধর্ম তাই হল পঞ্চযাম।

বর্দ্ধমান বললেন, মনুষ্য জন্মের দুর্লভতার কথা। মানুষই কেবল মুক্ত হতে পারে, আর কেউ নয়। দেবতারাও মুক্ত হতে পারেন না কারণ স্বর্গ কর্ম ভূমি নয়, ভোগ ভূমি। মুক্তির জন্য তাই দেবতাদেরও মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

মানুষ হয়ে জন্মান সুলভ নয়, কত জন্ম-জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে জীব মানুষ হয়ে জন্মায়।

মানুষ হয়ে জন্মালেই কী সদ্ধর্ম শ্রবণ হয়? হয় না। সদ্ধর্ম শ্রবণ তাই দুর্লভ।

সদ্ধর্ম শ্রবণ হলেই কি হয় তাতে শ্রদ্ধা—বিশ্বাস? শ্রদ্ধা তাই দুর্লভ।

কিন্তু শ্রদ্ধা হলেই কি সব হয়? হয় না, যদি না থাকে উদ্যম। দুর্লভ তাই ধর্মে উদ্যম।

বর্দ্ধমান তাই সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন, সময়ং মা পমায়য়—ওঠো, জাগো, অলস হয়ে সময় ক্ষেপ কোরো না। কালগত হয়ে যেমন ঝরছে গাছের পাতা তেমনি ঝরছে আয়ু, সময়। যা পাবার তা দ্রুত লাভ কর।

বর্দ্ধমানের কথা শ্রোতাদের মনে নিয়েছে। মনে নিয়েছে কেন না বর্দ্ধমান

সুন্দর করে সহজ করে বলেছেন ধর্মের তত্ত্ব। বলেন নি, আমার কাছে এসো, আমি তোমায় মুক্তি দেব। বলেছেন মুক্তি তোমার জন্মগত অধিকার। মুক্তি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। শুধু তাকে জানো, বোঝ, লাভ কর।

বর্দ্ধমানের কথা আরো ভালো লেগেছে তার কারণ তিনি ধর্মের তত্ত্ব বলেন নি বিদ্বৎজনের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষায়, দুরূহ শব্দের সমাবেশে। বলেছেন সহজ করে, সাধারণের বোধগম্য লোক ভাষায়, অর্দ্ধমাগধীতে।

বর্দ্ধমানের কথা তাই এখন লোকের মুখে মুখে। ঘাটে মাঠে বাটে, অন্তঃপুরিকাদের অন্তঃপুরে, রাজন্যদের রাজসভায়, বিদ্বৎজনের আলোচনাচক্রে।

ক্রমে সেই কথা সোমিলাচার্যের যজ্ঞশালায় গিয়ে পৌঁছল। শুনে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

যজ্ঞে উপস্থিত বিদ্বৎজনদের মধ্যে ইন্দ্রভূতিই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। ইনি গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাই গৌতম নামেও আবার ইনি অভিহিত হতেন। বাসস্থান মগধান্তর্বর্তী গোবর গ্রাম। পিতার নাম বসুভূতি, মায়ের নাম পৃথিবী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শিষ্য সংখ্যা পাঁচশ।

বর্দ্ধমানের খ্যাতির কথা শুনে গৌতমই সর্ব প্রথম জলে উঠলেন। কারণ তাঁর নিজের জ্ঞানের গর্ব ছিল। নিজেকে তিনি সর্বজ্ঞ ভাবতেন। এক খাপে যেমন দুই তলোয়ার থাকে না, সেই রকম এক সময়ে দুই সর্বজ্ঞ। তাই তিনি মহাসেন উদ্যান হতে প্রত্যাগত একজনকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলে সেই সর্বজ্ঞ?

জবাব এল, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। যেমন জ্ঞানা, তেমনি মধুক্ষরা তাঁর বাণী।

সেকথা শুনে গৌতম আরো জলে উঠলেন। বর্দ্ধমানকে তাঁকে বাদে পরাস্ত করতে হবে। এ তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। নইলে তাঁর সর্বজ্ঞত্ব থাকবে না। আবার ভাবলেন, সত্যিই কী বর্দ্ধমান সর্বজ্ঞ! না কোন শঠ, প্রবঞ্চক বা ঐন্দ্রজালিক নিজের সম্মোহনী শক্তিতে সবাইকে বিভ্রান্ত করছে। যাকেই সে বিভ্রান্ত করুক কিন্তু তাঁকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়। গৌতম তখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে মহাসেন উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন।

গৌতম সত্যিই বড় পণ্ডিত ছিলেন। বাদে সবাইকে তিনি পরাস্ত

করেছেন। কোথাও পরাজিত হননি। কিন্তু পাণ্ডিত্য এক, সাধনলব্ধ সিদ্ধি আর। তাই যখন বর্দ্ধমানের সামনে এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁর যোগৈশ্বর্য ও তপঃপ্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বর্দ্ধমানকে তর্কে পরাস্ত করতে এসেছিলেন কিন্তু এখন দেখলেন তাঁকে তর্কে পরাস্ত করবার কোনো প্রবৃত্তিই যেন তাঁর আর নেই। বরং আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর যে সংশয় ছিল সে সংশয়ের কথা মনে এল। মনে মনে ভাবলেন—ইনি যদি অজিজ্ঞাসিতভাবে সেই সংশয়ের নিরসন করে দেন তবে তিনি তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করে নেবেন।

গৌতমকে তদবস্থ দেখে বর্দ্ধমানই প্রথম কথা বললেন। বললেন, ইন্দ্রভূতি গৌতম, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই না তোমার সন্দেহ। আত্মা আছে কী নেই—তাই নয় কী ?

আশ্চর্য চকিত হলেন গৌতম। কী করে জানলেন ইনি তাঁর মনের কথা, তাঁর নাম ? তবে নিশ্চয়ই ইনি তাঁর সংশয়েরও নিরসন করে দিতে পারবেন। গৌতম তাই আরো বিনীত হয়ে বললেন, হাঁ ভগবন্।

কিন্তু কেন ?

কেন ? ভগবন্, বেদেই ত সেকথা রয়েছে। বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।

কিন্তু গৌতম, স বৈ অয়মাত্মা জ্ঞানময়ঃ ইত্যাদি বাক্যে বেদে আত্মার অস্তিত্বও ত আবার স্বীকৃত হয়েছে ?

হাঁ ভগবন্। আমার শঙ্কার কারণও তাই।

গৌতম, তুমি যেমন বিজ্ঞানঘনর অর্থ করছ, বাস্তবে তা তার অর্থ নয়। বিজ্ঞানঘন ইত্যাদি বাক্যের অর্থ আত্মায় প্রতিনিয়ত যে জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব ও পূর্ববর্তী জ্ঞান পর্যায়ের লোপ হয় তাই। এখানে পদার্থের জ্ঞান পর্যায়ই বিজ্ঞানঘন যা ভূত বা জ্ঞেয় পদার্থ হতে উৎপন্ন হয়। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তির তাৎপর্যও পরলোকের সঙ্গে নয়। যখন নূতন জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব হয় তখন পূর্ববর্তী জ্ঞান পর্যায় স্ফুটিত হয় না এই মাত্র।

বর্দ্ধমানের মুখে বেদবাক্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় শুনে ইন্দ্রভূতি গৌতমের অজ্ঞানান্ধকার মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল। তিনি করযোড়ে

বর্দ্ধমানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভগবন্, আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনতে অভিলাষী।

বর্দ্ধমান তখন তাঁকে নির্গ্রন্থ প্রবচনের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে গৌতম সংসার বিরক্ত হয়ে তাঁর শিষ্যসহ বর্দ্ধমানের কাছে শ্রমণ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

ইন্দ্রভূতি শ্রমণধর্ম গ্রহণ করেছেন সে খবর মুহূর্তেই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। শুনে কেউ বলল বর্দ্ধমান জ্ঞানের অগাধ বারিধি; কেউ বলল ধর্মের সাক্ষাৎ অবতার। তা নইলে গৌতমকে পরাস্ত করা মানুষের সাধ্য নয়।

ইন্দ্রভূতির পরাজয় ও শ্রমণ ধর্ম গ্রহণের খবর তাঁর ছোট ভাই অগ্নিভূতিও শুনলেন। তিনিও মধ্যমা পাবার যজ্ঞশালায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। প্রথমে ইন্দ্রভূতির পরাজয় হয়েছে সে কথা তাঁর বিশ্বাসই হয়নি। পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদিত হতে পারে কিন্তু ইন্দ্রভূতির পরাজয় কখনো নয়। কিন্তু ইন্দ্রভূতি যখন মহাসেন উদ্যান হতে ফিরে এলেন না তখন তিনি খানিকটা ক্ষোভ, খানিকটা অভিমান, খানিকটা আশ্চর্যচকিত ভাব নিয়ে তাঁর পাঁচশ জন শিষ্যসহ মহাসেন উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর এ বিশ্বাস তখন দৃঢ় ছিল যে বর্দ্ধমানকে পরাস্ত করে তাঁর অগ্রজ ইন্দ্রভূতি গৌতমকে তিনি আবার যজ্ঞশালায় ফিরিয়ে আনবেন।

অগ্নিভূতি যজ্ঞশালা হতে যে আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বেরিয়েছিলেন মহাসেন উদ্যানের দিকে যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন ততই দেখলেন তা যেন ক্রমশঃই স্তিমিত হয়ে আসছে। তারপর যখন তিনি বর্দ্ধমানের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তিনি যেন আর এক মানুষ।

বর্দ্ধমানই প্রথম কথা বললেন। বললেন, অগ্নিভূতি, কর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই না তোমার সন্দেহ?

অগ্নিভূতি বললেন, হাঁ ভগবন্।

তার কারণ?

কারণ শ্রুতি যখন পুরুষ এবেদং গ্নিং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং এই বাক্যে পুরুষাদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা করছে, যখন দৃশ্য অদৃশ্য, বাহ্য অভ্যন্তর, ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু পুরুষই তখন পুরুষের অতিরিক্ত কর্মের অস্তিত্ব কিভাবে স্বীকার করা

যায়। তাছাড়া যুক্তিতেও কী কর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়? কর্মবাদীরা বলেন, যেমন কর্ম তেমনি ফল। জীব যেমন কর্ম করে তেমনি ফল লাভ করে। জীব নিত্য, অরূপী ও চেতন, অথচ কর্ম অনিত্য, রূপী ও জড়। সে ক্ষেত্রে এদের সম্বন্ধ অনাদি না সাদি অর্থাৎ কোনো সময়ে হয়েছিল। যদি কোনো সময়ে হয়ে থাকে তার অর্থ হল জীব তার পূর্ববর্তী সময়ে কর্মরহিত ছিল কিন্তু এই মান্যতা কর্ম সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। কারণ কর্মসিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রবৃত্তিই কর্মবন্ধের কারণ। আর জীবের সেইরূপ কায়িক বাচিক, ও মানসিক প্রবৃত্তি পূর্ববদ্ধ কর্মের জন্য। সেক্ষেত্রে মুক্ত জীব কোনো সময়েই বদ্ধ হতে পারে না। কারণ বদ্ধ হবার কারণের সেখানে সর্বথা অভাব। যদি বলা হয় জীব অকারণে কর্ম বদ্ধ হয় তবে একথাও বলা যেতে পারে যে মুক্তাত্মারও পুনরায় কর্মবদ্ধ হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাউকেই আর মুক্ত বলা যাবে না। যদি জীব ও কর্মের সম্বন্ধকে অনাদি বলা হয় তবে কর্মও আত্ম স্বরূপের মতো নিত্য। যা নিত্য তা কখনো বিনষ্ট হয় না। সেক্ষেত্রে জীব কোনো সময়েই কর্মমুক্ত হবে না। যদি কর্মমুক্তই না হবে তবে মুক্তির জন্য প্রয়াসও নিরর্থক।

বর্দ্ধমান বললেন, অগ্নিভূতি, তোমার কথাতেই বোঝা যায় যে তুমি পুরুষ এবেদং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে পারনি। এই শ্রুতি বাক্য পুরুষাদ্বৈতবাদের সাধক নয়, স্তুতি বাক্য মাত্র।

কেন ভগবন্?

এই জন্যই যে পুরুষাদ্বৈতবাদ দৃষ্টাপলাপ ও অদৃষ্টকল্পনা দোষে দুষ্ট।

সে কী রকম?

অগ্নিভূতি, সে এই রকম। পুরুষাদ্বৈত স্বীকার করলে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু আদি যা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থ তার অপলাপ হয় ও সৎ ও অসৎ হতে স্বতন্ত্র 'অনির্বচনীয়' এক অদৃষ্ট বস্তুর কল্পনা করতে হয়।

না, ভগবন্। পুরুষাদ্বৈতবাদীরা এই দৃশ্য জগৎকে পুরুষ হতে ভিন্ন মনে করেন না, তাই অপলাপের প্রশ্নই নেই। জড় ও চেতনের পার্থক্য ব্যবহারিক কল্পনা মাত্র। বস্তুতঃ যা কিছু দৃশ্য অদৃশ্য, চর অচর সমস্তই পুরুষ স্বরূপ।

আচ্ছা, অগ্নিভূতি, পুরুষ দৃশ্য না অদৃশ্য ?

ভগবন্, পুরুষ রূপ রস স্বাদ গন্ধ ও স্পর্শহীন, অদৃশ্য। ইন্দ্রিয় দিয়ে পুরুষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অগ্নিভূতি, যা চোখ দিয়ে দেখা যায়, কান দিয়ে শোনা যায়, নাক দিয়ে শোঁখা যায়, জিব দিয়ে যার আস্বাদ নেওয়া যায় ও ত্বক দিয়ে যা স্পর্শ করা যায় তাকে তুমি কি বলবে ?

ভগবন্, সে সমস্তই নাম রূপাত্মক জগৎ।

অগ্নিভূতি, এরা পুরুষ হতে ভিন্ন না অভিন্ন ?

অভিন্ন।

অগ্নিভূতি, তুমি এই মাত্র বললে পুরুষ অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়াতীত। পুরুষ হতে অভিন্ন জগৎ তবে কি করে ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের বিষয় হয় ?

ভগবন্, মায়ায়। নামরূপাত্মক দৃশ্য জগতের উদ্ভব হয় মায়ায়। মায়া ও মায়া হতে উদ্ভূত নামরূপ জগৎ সৎ নয় কারণ কালান্তরে এর নাশ হয়।

অগ্নিভূতি, তবে কী দৃশ্য জগৎ অসৎ ?

না, ভগবন্। যেমন তা সৎ নয়, তেমনি অসৎও নয়। কারণ জ্ঞান সময়ে তা সৎরূপে প্রতিভাসিত হয়।

সৎও নয়, অসৎও নয়, তবে তুমি তাকে কি বলবে ?

সৎ ও অসৎ হতে স্বতন্ত্র এই মায়াকে আমি অনির্বচনীয় বলব।

অগ্নিভূতি, শেষ পর্যন্ত তোমাকে পুরুষাতিরিক্ত মায়ারূপ স্বতন্ত্র পদার্থকে স্বীকার করতেই হল। তবে কোথায় রইল তোমার পুরুষাদ্বৈতবাদ? অগ্নিভূতি, একটু চিন্তা কর—এই দৃশ্য জগৎ যদি পুরুষ হতে অভিন্ন হয় তবে তা ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না কিন্তু তুমি সেই জগৎকে প্রত্যক্ষই দেখছ। নিশ্চয়ই তুমি একে ভ্রান্তি বলবে না ?

ভগবন্, যদি আমি একে ভ্রান্তিই বলি।

অগ্নিভূতি, ভ্রান্তজ্ঞান উত্তরকালেও ভ্রান্তই প্রমাণিত হয়। কিন্তু তুমি যাকে ভ্রান্তি বলছ তা কোনো সময়েই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়নি। তাই তা ভ্রান্তি নয়। নির্বাধ জ্ঞান।

ভগবন্, বাস্তবে মায়া পুরুষেরই শক্তি। পুরুষ বিবর্ত সময়ে নামরূপাত্মক জগৎ হয়ে ভাসমান হয়। বস্তুতঃ মায়া পুরুষ হতে ভিন্ন নয়।

অগ্নিভূতি, মায়া যদি পুরুষের শক্তিই হয় তবে তা পুরুষের জ্ঞানাদি অন্য গুণের মতো অরূপী ও অদৃশ্য হতে হয়। কিন্তু মায়া অদৃশ্য নয়। তাই মায়া পুরুষের শক্তি হতে পারে না। মায়া পুরুষ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাছাড়া পুরুষ বিবর্ত স্বীকার করলেও তা হতে পুরুষাদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। পুরুষ বিবর্তের অর্থ পুরুষের মূল স্বরূপের বিকৃতি। পুরুষ বিকৃতি স্বীকার করলে তাকে আর অকর্মক বলা যাবে না, বলতে হবে সকর্মক। যেমন সাদা জলের পচন হয় না তেমনি অকর্মক জীবে বিবর্তও হয় না। তাই পুরুষাদ্বৈতবাদীরা যাকে মায়া নামে অভিহিত করেন তা পুরুষাতিরিক্ত জড় পদার্থ। তাঁরা যে তাকে সৎ বা অসৎ না বলে অনির্বচনীয় বলেন এতেও তা যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র সে কথাই সিদ্ধ হয়। সৎ নয় কারণ তা পুরুষ নয়; অসৎও নয় কারণ তা আকাশ কুসুমের মতো কল্পিত বস্তুও নয়।

ভগবন্, স্বীকার করছি পুরুষাদ্বৈতবাদ স্বীকার করলে প্রত্যক্ষ অনুভবের অসম্ভাব হয়। কিন্তু জড় ও রূপী কর্মপদার্থ চেতন ও অরূপী আত্মার সঙ্গে কিভাবে সংবদ্ধ হয় ও কিভাবে তাকে প্রভাবিত করে?

যেমন অরূপী আকাশের সঙ্গে রূপময় দ্রব্যের সম্বন্ধ হয়, যেমন ব্রাহ্মী ঔষধি ও মদিরা আত্মার অরূপী চৈতন্যের ওপর ভালোমন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ও শঙ্কার সমাধান। শেষ পর্যন্ত অগ্নিভূতিকে স্বীকার করতেই হল কর্মের অস্তিত্ব। স্বীকার করতে হল জীব ও কর্মের অনাদি সম্বন্ধ। যেমন বীজ ও অঙ্কুর। হেতু হেতু রূপে বর্তমান কিন্তু সেই সম্বন্ধের অবসান করা যেতে পারে।

প্রতিবুদ্ধ হয়ে অগ্নিভূতি তখন ইন্দ্রভূতির মতো তাঁর পাঁচশ জন শিষ্যসহ বর্দ্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

অগ্নিভূতির পরাজয় ও শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণের খবর যখন সোমিলাচার্যের যজ্ঞ শালায় গিয়ে পৌঁছল তখন সেখানে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সকলেই প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন ও পরে অগ্নিভূতির ছোট ভাই বায়ুভূতিকে অগ্রবর্তী করে সশিষ্য বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এঁদের মধ্যে ব্যক্ত ছিলেন কোল্লাগ সংনিবেশের ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৫০০। সুধর্মাও ছিলেন কোল্লাগ সন্নিবেশের তবে অগ্নি বৈশ্যায়ন গোত্রীয়। শিষ্য সংখ্যা ৫০০। মণ্ডিক মৌর্য সন্নিবেশের বাশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩৫০। মৌর্যপুত্র মৌর্য সন্নিবেশের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩৫০। অকম্পিত মিথিলার গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। অচলভ্রাতা কোশল নিবাসী হারীত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। মেতার্য তুংগিক সন্নিবেশের কৌডিন্য গৌত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ৩০০। প্রভাস রাজগৃহের কৌডিন্য গৌত্রীয় ব্রাহ্মণ। শিষ্য সংখ্যা ২০০।

বায়ুভূতির শিষ্য সংখ্যা ছিল ৫০০।

এঁরা বর্দ্ধমানকে পরাস্ত করতে গেলেন তা নয় কারণ ইন্দ্রভূতি ও অগ্নি-ভূতির মতো পণ্ডিত যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন তাঁকে পরাজিত করার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। তাঁরা গেলেন সেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করতে ও জীবাদি বিষয়ে তাঁদের প্রত্যেকের মনে যে যে শঙ্কা ছিল তার নিরসন করতে।

বর্দ্ধমান তাঁদের প্রত্যেককে স্বাগত জানালেন এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক শঙ্কার নিরসন করে দিলেন। তারপর তাঁরাও সম্বুদ্ধ হয়ে বর্দ্ধমানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে একদিনে ৪৪১১ জন ব্রাহ্মণ নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করলেন। বর্দ্ধমান ইন্দ্রভূতি প্রমুখ ১১ জন পণ্ডিতদের তাঁদের নিজ নিজ গণ বা শিষ্যের ওপর সর্বাধিকার দিয়ে তাঁদের গণধর পদে অভিষিক্ত করলেন।

এই ৪৪১১ জন ছাড়াও আর যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে শ্রমণ ধর্ম অঙ্গীকার করলেন। যাঁরা শ্রমণ ধর্ম অঙ্গীকারে অসমর্থ হলেন, তাঁরা শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন। এভাবে মধ্যমা পাবায় বৈশাখ শুক্লা দশমীতে বর্দ্ধমান সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা রূপ চতুর্বিধ সংঘের প্রতিষ্ঠা করে তীর্থ প্রবর্তিত করলেন।

এই সভাতেই চন্দনাও তাঁর কাছে সাধ্বী ধর্ম গ্রহণ করলেন। বর্দ্ধমান তাঁকে সাধ্বী সংঘের নেত্রী করে দিলেন।

[ক্রমশঃ

ভগবান মহাবীরের নির্বাণভূমি পাবা

বৌদ্ধদের যেমন কুশীনগর, জৈনদের তেমনি পাবা। কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন, পাবায় ভগবান মহাবীর। কিন্তু পাবার গুরুত্ব আরো একটী কারণে। কারণ, ভগবান মহাবীর পাবায় প্রথম শিষ্য সংগ্রহ করেন। ইন্দ্রভূতি প্রমুখ তাঁর প্রধান এগারো জন শিষ্য যাঁদের গণধর নামে অভিহিত করা হয়, তাঁরা পাবায় দীক্ষিত হন। পাবা তাই জৈনদের কাছে সারনাথও।

পাবায় মহাসেন উদ্যানে যেখানে ভগবান মহাবীর প্রথম ধর্মোপদেশ দেন এখন সেখানে নূতন সমবসরণ মন্দির নির্মিত হয়েছে। তার আগে সেখানে একটী স্তূপ, কুয়ো ও মহাবীরের চরণ পাদুকা ছিল। সে বেশী দিনের কথা নয়, তখন বছরের একদিন ছাড়া যাত্রীরা এদিকে বড় বিশেষ একটা আসত না। তার কারণ জল মন্দির বা গাঁও মন্দির হতে এর দূরত্ব, দ্বিতীয় নিরাপত্তা। কিম্বদন্তী, রাখাল ছেলেরা গরুবাছুর চরাতে এসে মহাবীরের সেই চরণ পাদুকা কুয়োর জলে ফেলে দিত ও তার জলে পড়ার শব্দ শুনত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পরদিন সকালে সেই চরণ পাদুকাকে আবার ঠিক আগের জায়গাটিতে পাওয়া যেত। ক্রমে রাখাল ছেলেদের এ একটা মজার খেলা হয়ে পড়ে। যখন এ খবর জানা গেল তখন তীর্থক্ষেত্রের ব্যবস্থাপকরা জল মন্দিরের সামনে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এক সমবসরণ মন্দির নির্মাণ করান ও সেই চরণ সেখানে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই চরণ আজো সেখানে রয়েছে। এই মন্দিরটিকে এখন পূর্ববর্তী স্থানে নূতন সমবসরণ মন্দির নির্মিত হওয়ায় পুরুণো সমবসরণ বলা হয়। পূর্ববর্তী স্থানে নূতন মন্দির নির্মিত হলেও (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে) সেই স্তূপ ও কূয়ো আজো তেমনি সুরক্ষিত রয়েছে। এই কূয়োর জল সম্পর্কেও আর একটী কিম্বদন্তী আছে। অমাবস্যার রাত্রিতে এর জলে তৈলহীন প্রদীপও নাকি জলত।

এ গেল ভগবান মহাবীর প্রথম যেখানে ধর্মোপদেশ দেন তার কথা। এবারে তাঁর নির্বাণ স্থানের কথা বলি। এখন যেখানে গাঁও মন্দির অবস্থিত সেইটাই নাকি মহাবীরের নির্বাণ স্থান। কল্পসূত্রে লিখিত আছে যে মহাবীর তাঁর অন্তিম চাতুর্মাস্য রাজা হস্তীপালের রজ্জুগশালায় ব্যতীত করেন। সেখানে কার্তিক অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতে দিতে তিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। তাঁর নির্বাণের পর তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধন সেখানে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করান ও মহাবীরের চরণ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর সেখানে মন্দির নির্মিত হয়। সময়ে সময়ে সেই মন্দিরের সংস্কারও সাধিত হয়। শিলালিপিতে অতীতের শেষ সংস্কারের খবর পাওয়া যায় ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সাজাহানের রাজত্বকালের। প্রাচীন জৈন জাতি মহত্তিয়ানরা তখন এখানে প্রভূত পরিমাণে বাস করতেন। মহত্তিয়ান জাতি আজ প্রায় অবলুপ্ত তবে মন্দিরটী যে খুব প্রাচীন তা. বেশ বোঝা যায় মাটির নীচের মন্দির নির্মাণের বিভিন্ন স্তর দৃষ্টে।

গাঁও মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্য ভাগে ভগবান মহাবীরের মনোজ্ঞ মর্মর মূর্তি। তাঁর দুদিকে দক্ষিণে ভগবান ঋষভদেব ও বামে ভগবান শান্তিনাথের অনুরূপ প্রস্তর প্রতিমা। তাছাড়া আরো রয়েছে সেখানে ধাতু নির্মিত কয়েকটী পঞ্চতীর্থি ও ছোট ছোট তীর্থংকর মূর্তি। মূলবেদীর দক্ষিণে রয়েছে ভগবান মহাবীরের চরণ যুগল ও বাঁ দিকে তাঁর এগারো জন গণধরের চরণ-পাদুকা ও দেবর্দ্ধি গণি ক্ষমাশ্রমণের হলুদ পাথরের প্রতিমা। মূল বেদীর সামনে কালো পাথরে মহাবীরের অতিসুন্দর চরণ পাদুকা।

এই মন্দিরের চার কোণে গর্ভগৃহের শিখরের অনুরূপ চারটী শিখর ছিল ও এক একটী মন্দির। প্রথম মন্দিরে ভগবান পার্শ্বনাথের প্রতিমা ও মহাবীরের চরণ, দ্বিতীয় মন্দিরে তিনজন প্রখ্যাত দাদা গুরুর চরণ পাদুকা, তৃতীয়টিতে স্থুলিভদ্রের চরণ ও শেষেরটিতে মহাবীরের প্রথম শিষ্যা চন্দনবালার চরণ পাদুকা। কোণের শিখর ও মন্দিরগুলি এখন নেই। মূল মণ্ডপকে আরো বিস্তৃত করবার জন্য তাদের ভেঙে ফেলা হয়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে মন্দিরটী এক বিশালরূপ লাভ করবে।

গাঁও মন্দিরকে কেন্দ্র করে চার দিকে ধর্মশালা। যাত্রীরা এখানে এসে

অবস্থান করেন ও মন্দিরে ভগবানের পূজো। মন্দিরটি খুবই পবিত্র ও প্রভাব সম্পন্ন। একটী কিম্বদন্তী আছে যে আজো মন্দির যখন বন্ধ থাকে তখনো সময়ে সময়ে ভেতর হতে আলোর প্রকাশ ও গান বাজনা ও ভজনের ধ্বনি শোনা যায়।

জলমন্দিরই পাবাপুরীর প্রধান মন্দির ও দ্রষ্টব্যস্থান। রাজগৃহের পর্বত-মালার পটভূমিতে বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থিত বিমানাকৃতি মর্মর পাথরের জলমন্দিরটী যেমন নয়নাভিরাম তেমনি নির্মল চারিত্রের প্রতীক।

জলমন্দির এখন যেখানে অবস্থিত, ভগবান মহাবীরের সেখানে অগ্নি সংস্কার করা হয়। মহাবীরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সেখানে যে বিপুল জনতা একত্রিত হয়েছিল তারাই সেখানকার মাটি একটু একটু করে তুলে নিয়ে যায়, যার ফলে সেখানে এক বৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি হয়। সেই গহ্বরই কালক্রমে বর্তমান সরোবরের রূপ পরিগ্রহ করে। মহাবীরের নশ্বর দেহকে যেখানে ভস্মীভূত করা হয় সেখানে তাঁর অগ্রজ নন্দীবর্দ্ধন একটি মন্দির নির্মাণ করান। পরবর্ত্তী নানা সময়ে তার সংস্কার সাধিত হয়। বর্তমানের এই রূপটি কিছুদিন আগেও ছিল না। একে মর্মর মণ্ডিত করেন কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁর সর্বস্ব দান করে। একশ বছর আগেও এই মন্দিরে যেতে হত নৌকোয় করে। তারপর তৈরী হল ৬০০ ফুট লম্বা সেতু। সেই সেতুকে প্রশস্ত করা হল আরো পরে। দু'দিকে লাল পাথরের রেলিং দিয়ে তৈরী হল প্রবেশ পথের নহবৎখানা।

মন্দিরের গর্ভগৃহে ভগবান মহাবীরের অতি প্রাচীন ছোট চরণপাদুকা। উভয় দিকের বেদীতে গণধর গৌতম ও সুধর্ম স্বামীর চরণ। পরিবেশ গম্ভীর ও শান্ত। এমন শান্তির নিলয় বোধহয় সংসারে আর একটিও নেই।

এই মন্দিরটি সম্পর্কেও একটি কিম্বদন্তী আছে। মহাবীরের চরণের ওপর যে তিনটী ছত্র তা কার্তিকী অমাবস্যায় তাঁর নির্বাণের বিশেষ সময়ে আপনা হতেই নড়ে ওঠে। এই নড়া অনেকেই দেখেছেন।

পাবার এইগুলিই প্রধান মন্দির। এছাড়া আরো দু'একটি মন্দির আছে যার মধ্যে মহতাববিবির মন্দির ও দিগম্বর জৈন মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাত্রীদের জন্য এখানে অনেক ধর্মশালা রয়েছে, দীন দরিদ্রের জন্য দীনশালা। সেখানে দীন দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করা হয়।

পাবা পাটনা-রাঁচী রোডের ওপর পাটনা হতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজগৃহ হতে হাঁটাপথে মাত্র ৮ মাইল। যাঁরা রাজগীর নালন্দায় যান তাঁদের সকলের এখানে অবশ্যই আসা উচিত।
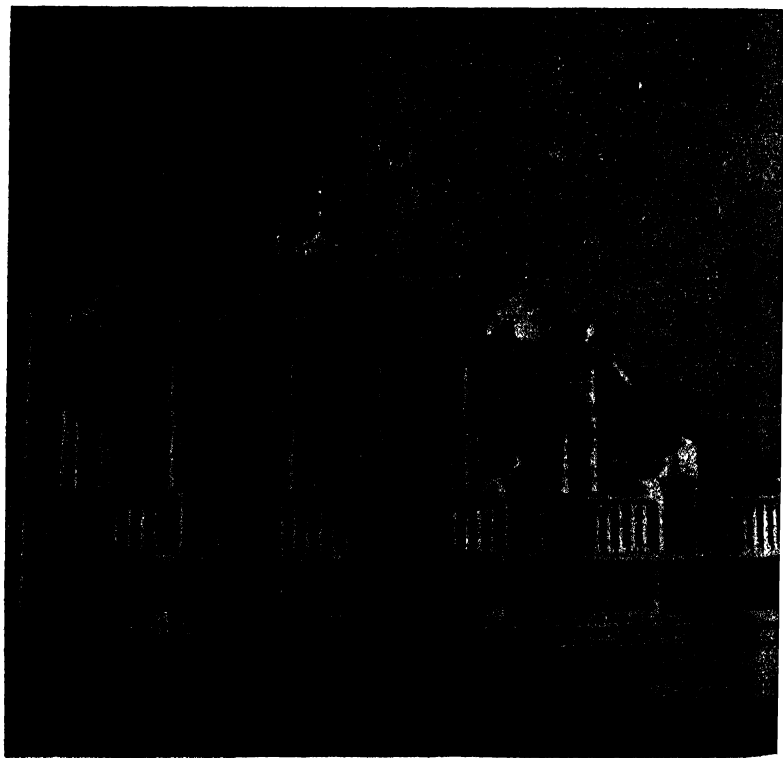
জল মন্দির, পাবাপুরী

মহাবীর সম্পর্কিত সাহিত্য

কুমারী মঞ্জুলা মেহতা

ভগবান মহাবীর জৈন ধর্মের ২৪ সংখ্যক তীর্থংকর। তাঁর নির্বাণের ২৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। জৈন আগম ও তার ব্যাখ্যা সাহিত্যে ভগবান মহাবীর সম্পর্কে অনেক বর্ণনা বা উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁর ওপর অনেক স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থ সংস্কৃত আদি প্রাচীন ভাষার অতিরিক্ত আধুনিক ভাষাতেও লিখিত হয়েছে। যে সমস্ত আগম ও তার ব্যাখ্যা সাহিত্যে ভগবান মহাবীরের বিবরণ বিশেষভাবে পাওয়া যায় তাদের নাম: আচারাঙ্গ, স্থানাঙ্গ, সমবায়াঙ্গ, ভগবতীসূত্র, ঔপপাতিক, কল্পসূত্র, আবশ্যক নির্যুক্তি, আবশ্যক চূর্ণি, বিশেষাবশ্যক ভাষ্য।

ভগবান মহাবীর সম্পর্কিত গ্রন্থের স্বতন্ত্র তালিকা নীচে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা ভগবান মহাবীর সম্পর্কে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখতে চান তাঁদের এগুলি সহায়ক হবে বলে মনে করি।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
জ্ঞাতপুত্র শ্রমণ ভগবান	হীরালাল কাপড়িয়া	১৯৬৯
তীর্থংকর মহাবীর	মহেন্দ্রকুমার	
তীর্থংকর ভগবান মহাবীর	বীরেন্দ্রপ্রসাদ জৈন	১৯৫৯
তীর্থংকর মহাবীর	বিজয়েন্দ্র সূরি	১৯৬২
তীর্থংকর বর্দ্ধমান	শ্রীচন্দ রামপুরিয়া	বী. স. ২৪৮০
তীর্থংকর বর্দ্ধমান	মুনি বিদ্যানন্দ	১৯৭৩
ধর্মবীর মহাবীর ঔর কর্মবীর কৃষ্ণ	সুখলালজী (অনু) শোভাচন্দ্র	১৯৩৪
নির্গ্রন্থ ভগবান মহাবীর	জয়ভিক্ষু	১৯৫৬
বুদ্ধ ঔর মহাবীর	কি. ঘ. মশরুবালা (অনু) জমনালাল জৈন	১৯৫১
ভগবান মহাবীর	গোকুলদাস কাপড়িয়া	১৯৪৯
ভগবান মহাবীর	গোকুল চন্দ্র জৈন	১৯৭৩

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
ভগবান মহাবীর	দলসুখ মালবণিয়া	১৯৫১
ভগবান মহাবীর	কৈলাশচন্দ্র শাস্ত্রী	বী. স. ২৪৭৯
ভগবান মহাবীর	জয়ভিক্ষু	১৯৫৭
ভগবান মহাবীর	জয়ভিক্ষু (অনু) সরোজ শাহ	১৯৬৭
ভগবান মহাবীর	কামতাপ্রসাদ জৈন (অনু) হিমতলাল	১৯৫৩
ভগবান মহাবীর অনে মাংসাহার	রতিলাল শাহ	বি. স. ২০১৫
ভগবান মহাবীর ঔর উনকা মুক্তি মার্গ	রিষভদাস রাঁকা	১৯৫৩
ভগবান মহাবীর ঔর উনকা সংদেশ	পরমেষ্ঠীদাস জৈন	
ভগবান মহাবীর ঔর উনকী অহিংসা	(প্রকা) প্রেম রেডিয়ো এণ্ড ইলেকট্রিক মার্ট	১৯৭৩
ভগবান মহাবীর ঔর মাংস নিষেধ	আত্মারামজী	১৯৫৭
ভগবান মহাবীর ঔর বিশ্বশান্তি	জ্ঞান মুনি	বি. স. ২০১১
ভগবান মহাবীর ঔর বিশ্বশান্তি (উর্দু)	জ্ঞানমুনি	
ভগবান মহাবীর ঔর উনকা তত্ত্বদর্শন	আচার্য দেশভূষণ	১৯৭৩
ভগবান মহাবীর কা অচেলক ধর্ম	কৈলাশচন্দ্র শাস্ত্রী	
ভগবান মহাবীর কা আদর্শ জীবন	চৌথমল মুনি	বি. স. ১৯৮৯

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
ভগবান মহাবীর কা জন্ম কল্যাণ	চৌথমল মুনি	বি. স. ১৯৯৫
ভগবান মহাবীর কী অন্তিম শিক্ষায়েঁ	বর্দ্ধমান মহারাজ	বি. স. ১৯৯৭
ভগবান মহাবীর কী অহিংসা ঔর মহাত্মা গান্ধী	পৃথ্বীরাজ জৈন	১৯৫০
ভগবান মহাবীর কী বোধ কথায়েঁ	অমর মুনি	১৯৬৬
ভগবান মহাবীর কী সাধনা	মধুকর মুনি	বি. স. ২০০৭
ভগবান মহাবীর কী সূক্তিয়াঁ	রাজেন্দ্র মুনি শাস্ত্রী	১৯৭৩
ভগবান মহাবীরকে পাঁচ সিদ্ধান্ত	জ্ঞান মুনি	বি. স. ২০১৫
ভগবান মহাবীরকে প্রেরক সংস্মরণ	মহেন্দ্রকুমার 'কমল'	১৯৭৩
ভগবান মহাবীরনা ঐতিহাসিক জীবননী রূপরেখা	ধীরজলাল শাহ	১৯৬২
মহামানব মহাবীর	ন্যায় বিজয়মুনি	১৯৫৭
মহামানব মহাবীর	রঘুবীরশরণ দিবাকর	১৯৫১
মহাবীর (উর্দু)	অমর মুনি	১৯৪০
মহাবীর	রতিলাল শাহ	বি. স. ২০০৬
মহাবীর	ধীরজলাল শাহ	বি. স. ২০০৯
মহাবীর ঔর বুদ্ধ	কামতাপ্রসাদ জৈন	১৯৫৭
মহাবীর কথা	গোপালদাস পটেল	১৯৪১
মহাবীর কা অন্তস্তল	সত্যভক্ত স্বামী	১৯৫৩
মহাবীর কা জীবন দর্শন	রিষভদাস রাঁকা	১৯৫১
মহাবীর কা সর্বোদয় তীর্থ	জুগল কিশোর মুখ্তার	১৯৫৫
মহাবীর কী জীবন দৃষ্টি	ইন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী	১৯৬৭

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
মহাবীর চরিত্র	জিনবল্লভ	১১২৯
মহাবীর চরিত্র	হর্ষচন্দ্র (অনু) পী. এন. শাহ	বি. স. ২০০২
মহাবীর চরিত্র (সচিত্র)	ভানুবিজয়জী	বি. স. ২০২২
মহাবীর চরিত্র (গুজরাতী অনু)	গুণচন্দ্র	বি. স, ১৯৯৪
মহাবীর চরিত্র	নেমিচন্দ্র সূরী	বি. স. ১৯৭৩
মহাবীর চরিত্র	মফতলাল সংঘবী	বি. স. ১৯৪৯
মহাবীর চরিত্র	গুণচন্দ্র	১৯২৯
মহাবীর চরিত্র	দেবভদ্র সূরি	বি, স. ১১৩৯
মহাবীর জিন স্তুতি	যশোবিজয়জী	১৮৭৮
মহাবীর জীবননী মহিমা	বেচরদাস দোশী	বী. স. ২৪৫৪
মহাবীর জীবন মহিমা	বেচরদাস দোশী	১৯৫৮
মহাবীর জীবন বিস্তার	সুশীল	বী. স. ২৪৭৭
মহাবীরদেবরু জীবন	ভদ্রঙ্কর বিজয়	বি. স. ২০১৩
মহাবীরনা দশ উপাসকো	বেচরদাস দোশী	১৯৩১
মহাবীরনা যুগনী মহাদেবীয়েঁ।	সুশীল	বি. স. ২০০২
মহাবীর দেবনো গৃহস্থাশ্রম	ন্যায়বিজয় মুনি	বি. স. ২০১১
মহাবীর প্রবচন	ক্রান্তিমুনি	১৯৫৮
মহাবীর বত্রীশী	জয়শেখর সূরী	১৫ শতক
মহাবীর : মেরী দৃষ্টিমেঁ	রজনীশ	১৯৭১
মহাবীর যুগনা উপাসকোঁ	(প্রকা) জৈন আত্মানন্দ সভা	বি. স. ২০২৭
মহাবীর বর্দ্ধমান	জগদীশচন্দ্র জৈন	১৯৪৫
মহাবীর বাণী	বেচরদাস দোশী	১৯৪২
মহাবীর বাণী (গুজ)	বেচরদাস দোশী	বি. স. ২০১১
মহাবীর বাণী (১-২)	রজনীশ	১৯৭২-৭৩

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
মহাবীর : ব্যক্তিত্ব, উপদেশ ঔর আচার মার্গ	রিষভদাস রাঁকা	১৯৭৩
মহাবীর—সিদ্ধান্ত ঔর উপদেশ	অমর মুনি	১৯৬০
মহাবীর স্তবন	যশোবিজয়জী	১৮ শতক
মহাবীর স্তুতি	(প্রকা) ভেঁরোদান জেঠমল	১৯২৫
মহাবীর স্তোত্র	(অনু) দেবীলাল	বী. স. ২৪৪৮
মহাবীর স্তোত্র	জিনবল্লভ সূরি	বি. স. ২০০৯
মহাবীর স্তোত্র	হেমচন্দ্রাচার্য	১৮৯০
মহাবীর স্তোত্র	কল্যাণসাগর সূরি	১৮৭৯
মহাবীর স্তোত্র	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
মহাবীর স্বামীনো অন্তিম উপদেশ	গোপালদাস পটেল	১৯৩৮
মহাবীর স্বামীনো আচার ধর্ম	গোপালদাস পটেল	বি. স. ১৯৯২
মহাবীর স্বামীনো সংযম ধর্ম	গোপালদাস পটেল	বি. স. ১৯৯২
মহাবীরাষ্টক	ভাগচন্দ	১৯ শতক
বর্দ্ধমান	অনূপ শর্মা	১৯৫১
বর্দ্ধমান চরিত	অসগ	৯৮৮
বর্দ্ধমান চরিত	সকলকীর্তি	১৫ শতক
বর্দ্ধমান জিন স্তোত্র	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
বর্দ্ধমান দ্বাত্রিংশিকা	ধর্মসাগর উপাধ্যায়	১৭ শতক
বর্দ্ধমান দেশনা	শুভবর্দ্ধন	১৬ শতক
বর্দ্ধমান নির্বাণ কল্যাণক স্তবন	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
বর্দ্ধমান পঞ্চাশিকা	সুশীল বিজয়	বি. স. ১৯৪৪
বর্দ্ধমান মহাবীর	ব্রজকিশোর নারায়	১৯৫০
বীরায়ণ	ধন্যকুমার জৈন	১৯৬০
বীরকল্প	সোমতিলক	১৩৮
বীরচরিত্র	জিনেশ্বর সূরি	১১ শতক

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
বীরচরিত্র	দেবভদ্র সূরি	১২ শতক
বীর জিন স্তুতি	মেরুবিজয়	১৭ শতক
বীরথুই	আত্মারামজী	১৯৪২
বীরনির্বাণ ঔর দীপাবলী	চৌথমল মহারাজ	১৯৬৬
বীরভক্তামর	ধর্মবর্দ্ধন গণি	১৯২৬
বীরবিভূতি	ন্যায়বিজয় মুনি	
বীরস্তব	হরিভদ্র সূরী	৮ম শতক
বীরস্তবন মঞ্জরী	মোহনলাল বাড়িয়া	বি. স. ২০১২
বীরস্তুতি	পুষ্প ভিক্ষু	১৯৩৯
বীরস্তুতি	অমর চন্দ্রজী	১৯৪৬
বীরস্তোত্র	জিনপ্রভাচার্য	১৮৭৯
বৈশালীকে রাজকুমার তীর্থংকর ভগবান মহাবীর	নেমিচন্দ জৈন	১৯৭৩
শ্রমণ ভগবান মহাবীর	ধীরজলাল শাহ	১৯৫১
শ্রমণ ভগবান মহাবীর	কল্যাণ বিজয়	বি. স. ১৯৯৮
শ্রমণ ভগবান মহাবীর তথা মাংসাহার পরিহার	হীরালাল দুগড়	১৯৬৪
শ্রীবর্দ্ধমান পুরাণ	নবল শাহ	বি. স. ১৮২৫
Lord Mahavira	Boolchand	1948
Lord Mahavira	Puranchand Samsookha	1953
Lord Mahavira and Some Other Teachers of His Time	Kamta Prasad Jain	1927
Mahavira	Vallabh Suri	1956
Mahavira	Amar chand	1953
Mahavira & Buddha	Kamta Prasad Jain	1955
Mahavira & Jainism	Jyoti Prasad Jain	1958

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	প্রকাশন বর্ষ বা রচনাকাল
Mahavira and His Philosophy of Life	A. N. Upadhye	1950
Mahavira : His Life and Teachings	B. C. Law	1937
Mahavira : His Life and Teachings	S. Raghavachari	
Mahavira : Life and Teachings	K. C. Lalwani	
Teachings of Lord Mahavira	Ganesh Lalwani	1967
Shramana Bhagavan Mahavira	Ratnaprabha Vijaya	1942-51

শ্রমণ (হিন্দী), বারাণসী, বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৪ হতে সংকলিত

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ১২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. II. No. 8 : Sraman : Nov-Dec 1974

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

তীর্থঙ্কর,
তোমার তীর্থের পথ পরিব্যাপ্ত
লোক লোকান্তর—
মানুষের পরিশুদ্ধ নিভৃত অন্তর।
হৃদয় মালিন্য তাই দিতে হবে ধুয়ে,
অনিত্য এ সংসারেরে আছে যাহা ছুঁয়ে;
অন্তরের গ্লানি
মুছিয়া ফেলিতে হবে, নির্ভয় করিতে হবে প্রাণী।
সেই সত্য হোক—
ঘুচে যাক কলুষ নির্মোক।

সেদিন দেখিব আমি অবারিত সুদূর আকাশ,
সুন্দর আশ্বাস
তরঙ্গিত বিস্ময়—
আলোক রশ্মির মতো অনির্বাণ, নেই যার ক্ষয়,
যার কোনো নেই নাম,
এই জেনে রেখে যাই পায়ে তব আমার প্রণাম।

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮১ ॥ নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

বীরভূম মল্লারপুরে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে এই সৌম্য শান্ত আত্ম সমাহিত মূর্তিটি রয়েছে। মূর্তিটি কোন তীর্থংকরের বলেই মনে হয়। লাঞ্ছন না থাকায় কার সেকথা বলা শক্ত। পাদপীঠের দু'দিকে কুকুর থাকায় ভগবান মহাবীরের বলেই অনুমিত হয়। মহাবীর যখন রাঢ়ে অবস্থান করছিলেন তখন কুকুরের অত্যাচারে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। মূর্তিটি সম্ভবতঃ সেই স্মৃতিকেই বহন করছে।

বর্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

মধ্যমা পাবা হতে বর্দ্ধমান এলেন রাজগৃহে।

রাজগৃহ তখন মগধের রাজধানীই ছিল না, ছিল পূর্বভারতের একটি প্রখ্যাত সহর। সেখানে তখন রাজত্ব করছেন শ্রেণিক বিম্বিসার। এই শ্রেণিকের প্রিয় মহিষী ছিলেন চেলনা। তিনি বর্দ্ধমানের মামাতো বোন ছিলেন ও শ্রমণোপাসিকা। তাছাড়া রাজপুত্রদেরও অনেকে ছিলেন শ্রমণোপাসক। পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের অনেক শ্রাবকও তখন বাস করতেন রাজগৃহে। বর্দ্ধমান তাই রাজগৃহে এসে ঈশান কোণস্থিত গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করলেন।

বর্দ্ধমানের আসবার খবর পেয়ে রাজগৃহের লোক গুণশীল চৈত্যে ভেঙে পড়ল। শ্রেণিকও এলেন সপরিকরে।

বর্দ্ধমান নিগ্রর্ন্থ ধর্মের উপদেশ দিলেন। প্রথমে নিরূপণ করলেন মুনিধর্ম। তারপর শ্রাবকাচার। মুনিদের জন্য সর্ববিরতি—তাই অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ মহাব্রত। হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য ও পরিগ্রহ তাদের সর্বথা পরিত্যাগ করতে হবে। শ্রাবকদের জন্যও অবশ্য সেই নিয়ম তবে তাদের ছুট দেওয়া হল। তাই আংশিক বা দেশ বিরতি—অণুব্রত। তারাও সেই একই ব্রত পালন করবে তবে স্থুলভাবে।

তবে লক্ষ্য সেই এক। তাই শ্রাবকাচারে বর্দ্ধমান আরো যুক্ত করে দিলেন শিক্ষা ও গুণব্রত। গুণব্রতে অণুব্রতকে আরো পরিশুদ্ধ করা ও শিক্ষাব্রতে মুনিধর্ম গ্রহণের জন্য নিজেকে আরো প্রস্তুত করা।

বর্দ্ধমান কুশলী সংগঠক ছিলেন। তাই একসূত্রে গেঁথে দিয়ে গেলেন তাঁর সংঘের দুইটি অঙ্গ : গৃহী ও মুনি, শ্রাবক ও শ্রমণ।

বর্দ্ধমানের উপদেশ অনেককেই আকৃষ্ট করল। আকৃষ্ট করল কারণ, বর্দ্ধমান ধর্মকে মুক্ত করলেন দেববাদের নাগপাশ হতে। মুক্তি দয়ার দান নয়, মুক্তি মানুষের জন্মগত অধিকার, তাকে অর্জন করতে হয় নিজের প্রচেষ্টায়, আত্মার নির্মাণে। সেখানে পুরোহিতের কোন ভূমিকাই নেই।

ধর্মজগতে এ এক রক্তহীন বিপ্লব। মনুষ্যত্বের এ এক নবীন উজ্জীবন। এরই আকর্ষণে মগধবাসীদের অনেকেই সেদিন তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল। কেউ শ্রমণ ধর্ম, কেউ শ্রাবক ধর্ম।

শ্রমণ ধর্মগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজপুত্র মেঘকুমার ও নন্দীসেন। দুই বিচিত্র জীবন। এই দুই জীবনকে বর্দ্ধমান যেভাবে পরিচালিত করে ছিলেন তা হতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাঁর লোক শিক্ষা দেবার পদ্ধতি, যা বাধ্য করে না উদ্বুদ্ধ করে, পরমুখাপেক্ষী করে না, নির্ভরতা আনে।

শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করার পর গুণশীল চৈত্যে রাত্রে শুয়ে আছেন রাজকুমার মেঘ। দীক্ষায় সর্বকনিষ্ঠ তাই সকলের শেষে তাঁর শয্যা।

হঠাৎ পাদস্পৃষ্ট হওয়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

সেই যে ঘুম ভাঙল, সেই ঘুম তাঁর আর এলো না। তাঁর মাথার মধ্যে নানান চিন্তা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে লাগল কারণ তিনি যে রাজকুমার সেকথা তিনি তখনো ভুলতে পারেন নি।

মেঘকুমার ভাবলেন সাধুদের এ ইচ্ছাকৃত অবহেলা। বর্দ্ধমানও কি ইচ্ছা করলে তাঁকে একটু ভালো জায়গায় শুতে দিতে পারতেন না। তা নয় দিয়েছেন সকলের শেষে দরজার কাছে। তাই রাত্রে বয়োবৃদ্ধ সাধুদের কেউ উঠে যখন বাইরে যাচ্ছেন তখন তাকে মাড়িয়ে যাচ্ছেন।

ভাবতে ভাবতে মেঘকুমারের মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করলেন এভাবে মুনি ধর্ম পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তার চাইতে সংসার আশ্রমেই আবার ফিরে যাওয়া ভাল।

মেঘকুমার সেকথা বলবার জন্যই তাই পরদিন সকালে বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মেঘকুমারের মনোভাব বর্দ্ধমানের অজ্ঞাত ছিল না। তাই তাকে তাঁর কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াতে দেখে বলে উঠলেন, মেঘকুমার, তুমি এক দিনেই

সংযম পালনে ধৈর্য হারিয়ে ফেললে ? কিন্তু তুমি ত এমন দুর্বলচিত্ত ছিলে না। তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ কর।

মেঘকুমারের চোখের সামনে হতে তখন যেন বিস্মরণের কালো পর্দাটা সরে গেল। সেখানে ফুটে উঠল এক স্নিগ্ধ নীলাভ আলো। সেই নীলাভ আলোয় সে দেখল এক প্রকাণ্ড বন। সেই বনে যেন আগুন লেগেছে। সেই আগুনে বড় বড় গাছ পুড়ছে, ছোট ছোট গাছ, ঝোঁপ ঝাড় জঙ্গল। ক্রমশঃ সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লাল হয়ে উঠল আকাশ। দেখল বনের পশুরা প্রাণ ভয়ে চারদিকে ছুটছে। প্রথমে হাতীর দল গেল তারপর বুনো মোষ, শিয়াল, হরিণ, এক ঝাঁক বনটিয়া তারপর আর এক ঝাঁক। দেখল তারা সবাই নদীর ধারে এসে ভীড় করেছে। সেখানে স্বল্পপরিসর একটুখানি জায়গা। দেখতে দেখতে তা পশুতে পাখীতে ভরে গেল। সকলের শেষে সে দেখল এলো এক যূথভ্রষ্ট হাতী। জায়গা বলতে তখন আর কিছু ছিল না। সে কোন মতে এক কোণে এসে দাঁড়াল। কিন্তু পা নাড়বার তার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল তারপর এক সময় গা চুলকোবার জন্যই সে যেন পা তুলল।

সে পা তুলল আর সেই অবসরে যেখানে তার পা ছিল সেখানে এসে আশ্রয় নিল এক অল্পপ্রাণ খরগোস।

গা চুলকিয়ে হাতীটি যখন মাটিতে পা রাখতে যাবে তখন তার চোখে পড়ে গেল সেই খরগোসটি। হাতীর মনে দয়ার উদ্রেক হল। মাটিতে পা রাখলে খরগোসটির মৃত্যু হবে ভেবে সে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ সেই আগুন জ্বলল।

তারপর যখন সেই দাবাগ্নি নিভে গেল ও বনের পশুরা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল তখন সে তার পা নাবিয়ে মাটিতে রাখতে গেল। কিন্তু সেই পা সে মাটিতে রাখতে পারল না। তার পা অসাড় হয়ে যাওয়ায় ধপ করে সেখানেই সে পড়ে গেল।

ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়ে সেই হাতীটি সেইখানে পড়ে রইল। নদীর জল এতো কাছে তবু সেখানে গিয়ে জল খাবার তার শক্তি নেই। ভরসা—

যদি বৃষ্টি হয়। করুণ চোখে সে তাই আকাশের দিয়ে চেয়ে রইল। কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না। সে তাই আগুনে পোড়া বনের ধারে নদীর তীরে এভাবে পড়ে রইল। তারপর এক সময় তার মৃত্যু হল।

মেঘকুমারের চোখে জল ভরে এসেছিল। বর্দ্ধমান তার দিকে চেয়ে বললেন, মেঘকুমার পূর্বজন্মে তুমি ওই হাতী ছিলে। অল্পপ্রাণ খরগোসের জন্য তোমার মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল তাই তুমি এজন্মে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ। মেঘের প্রত্যাশা করে তুমি মারা গিয়েছিলে তাই তোমার মায়ের মেঘের দোহদ হয়েছিল যার জন্য তোমার নাম রাখা হয় মেঘকুমার।

মেঘকুমারের চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। পশুজীবনে সে যদি একটী নগণ্য প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য এতখানি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকতে পারে তবে মনুষ্য জীবনে সে কি সামান্য পা মাড়িয়ে দেওয়ায় এতখানি অধৈর্য হয়ে উঠবে?

বর্দ্ধমান মেঘকুমারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মেঘকুমার, তুমি কি সংসারাশ্রমে ফিরে যাবে?

মেঘকুমারের সমস্ত ভাবনার তখন জট খুলে গেছে। সে বর্দ্ধমানের চরণ স্পর্শ করে বলল, না ভগবন্, না।

রাজপুত্র নন্দীসেন এসেছে বর্দ্ধমানের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করতে।

বর্দ্ধমান তার দিকে চেয়ে বললেন, নন্দীসেন, তোমার জাগতিক সুখভোগ এখনো বাকী রয়েছে, তা ক্ষয় করে এসো, তোমায় আমি দীক্ষা দেব।

কিন্তু নন্দীসেন সেকথা কানে নিল না। বলল, ভগবন্, আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে। জাগতিক সুখভোগে আমার এতটুকু আসক্তি নেই।

বর্দ্ধমান বললেন, নন্দীসেন, তোমায় আমি নিরুৎসাহ করতে চাই না, তবু আর একবার ভেবে দেখো।

নন্দীসেন বলল, আমি সমস্ত ভাবনা শেষ করে এসেছি। আমায় গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমান বললেন, বেশ তবে তাই হবে।

নন্দীসেন চলে যেতে গৌতম প্রশ্ন করলেন বর্দ্ধমানকে। ভগবন্, আপনি

যখন সকলকে চারিত্র গ্রহণ করবার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন তখন কেন নন্দীসেনকে নিরস্ত করতে চাইলেন ?

প্রত্যুত্তরে বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম, সংসারে তিনরকমের কামী হয়ঃ মন্দকামী, মধ্যকামী ও তীব্রকামী। মন্দকামীর কামবাসনা স্বল্প। তীব্র নিমিত্ত উপস্থিত না হলে তা জাগ্রত হয় না। সে তাই সহজেই সংযম পালন করতে পারে। স্ত্রীলোক হতে সে যদি দূরে থাকে তবে তার কামবাসনা জাগ্রত হবে না। সে শ্রমণ হতে পারে।

যারা মধ্যকামী তাদের যেমন স্ত্রীলোক হতে দূরে থাকতে হয় তেমনি কঠোর তপশ্চর্যাও করতে হয়। এদেরো শ্রমণ হতে বাধা নেই যদি তারা তপঃনিরত থাকে। সংসারের শতকরা পঁচানব্বুই জনই মধ্যকামী।

কিন্তু যারা তীব্রকামী তাদের ভোগবাসনা ভোগছাড়া উপশান্ত হয় না। তাদের শরীরের গঠনই এই রকম যে ইচ্ছে করলেও তারা কাম বাসনা জয় করতে পারে না, তপশ্চর্যাতেও না। নন্দীসেন তীব্রকামী। তাই তার এখুনি শ্রমণ হওয়া উচিত হয়নি। নন্দীসেনের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে তবু যখন তার কাম বাসনার উদয় হবে তখন সে নিজেকে দমন করতে পারবে না। তাই তাকে আমি নিষেধ করেছিলাম।

ভদন্ত, তবে তাকে আপনি আবার শ্রমণ সংঘে গ্রহণ করলেন কেন ?

গৌতম, এই জন্যই তাকে গ্রহণ করলাম যে সে চারিত্র হতে বিচ্যুত হলেও তীব্র শ্রদ্ধার জন্য সম্যকত্ব হতে বিচ্যুত হবে না। সেই সম্যকত্বই তাকে একদিন আবার চারিত্রে ফিরিয়ে আনবে।

হোলও ঠিক তাই। নন্দীসেন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে একদিন প্রেমে পড়ে গেল এক গণিকার। গণিকার চোখের জলে তার সংযমের বেড়া রইল না। সে তাই শ্রমণবেশ পরিত্যাগ করে তার সঙ্গে জাগতিক সুখভোগে লিপ্ত হল। লিপ্ত হল কিন্তু সম্যকত্ব হতে সে বিচ্যুত হল না। তাই যেদিন তার ভোগ বাসনা উপশান্ত হল, সেদিন সে আবার বর্দ্ধমানের কাছে ফিরে এল।

তীর্থংকর জীবনের প্রথম চাতুর্মাস্য বর্দ্ধমান রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। তারপর বর্ষাকাল অতীত হতে বিদেহের পথে এলেন ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুর।

এই ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরেই বাস করেন ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত ও ব্রাহ্মণী দেবানন্দা। এই দেবানন্দার কুক্ষীতেই তিনি প্রথম অবতরণ করেছিলেন।

বর্দ্ধমানের আসবার সংবাদ পেয়ে তাঁকে বন্দনা করতে এলেন ব্রাহ্মণ ঋষভ-দত্ত ও ব্রাহ্মণী দেবানন্দা। ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুর হতে এল তাঁর জামাতা জমালি ও কন্যা প্রিয়দর্শনা। ভগবানের উপদেশ সভায় তাঁরাও শুনলেন নিগ্রর্ন্থ ধর্মের প্রবচন। হৃদয়ে তাঁদের শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। তাঁরা সেই সভাতেই নিগ্রর্ন্থধর্ম গ্রহণ করে শ্রমণ হয়ে গেলেন।

বর্দ্ধমান একবছর বিচরণ করলেন বিদেহ ভূমিতে, বর্ষাবাস করলেন বৈশালীতে। তারপর বর্ষাকাল শেষ হতে গেলেন বৎস ভূমির দিকে নিগ্রর্ন্থ ধর্ম তাঁকে প্রচার করতে হবে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও একস্থানে অবস্থান করবার তাঁর উপায় নেই।

বৎসের রাজধানী তখন কৌশাম্বী। বর্দ্ধমান কৌশাম্বীর বহিঃস্থিত চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন।

কৌশাম্বীতে তখন রাজত্ব করেন উদয়ন। এই সেই উদয়ন যাঁর সম্বন্ধে কালিদাস বলেছিলেন: 'উদয়ন কথাকোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধান্'। উদয়ন কথা নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে চারচারটী বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছে: ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তম্', ও 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্' ও হর্ষের 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী'।

অবশ্য উদয়ন তখন ছোট ছিলেন। তাই তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মা মৃগাবতী তখন রাজ্য পরিচালনা করছিলেন।

মৃগাবতী ছিলেন বৈশালী নায়ক চেটকের মেয়ে, সাংসারিক সম্পর্কে বর্দ্ধমানের মামাতো বোন। তাই তাঁর আসবার খবর পেয়ে উদয়নকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁকে বন্দনা করতে এলেন।

সঙ্গে এলেন আরো শ্রমণোপাসিকা জয়ন্তী। জয়ন্তী মৃগাবতীর ননদ, উদয়নের পিসী, স্বর্গীয় রাজা সহস্রানীকের মেয়ে, শতানীকের বোন।

জয়ন্তীও ছিলেন শ্রমণ ধর্মের উপাসিকা ও ভক্তিমতী। তাঁর গৃহের দরজা সাধু ও শ্রমণদের জন্য ছিল সর্বদাই উন্মুক্ত।

বর্দ্ধমান তাঁদের ধর্মোপদেশ দিলেন। বললেন আত্মজয়ের কথা। বললেন,

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করো, বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে কী লাভ? যে নিজের ওপর জয়লাভ করে সেই যথার্থ সংগ্রাম-বিজয়ী, সেই যথার্থ সুখী।

আরো বললেন, ক্ষমাবান হও, লোভাদি হতে নিবৃত্ত। জিতেন্দ্রিয় হও ও অনাসক্ত। সদাচারী হও ও ধর্মনিষ্ঠ।

সংসার প্রবাহে ভাসমান জীবের জন্য ধর্মই একমাত্র দ্বীপ, আশ্রয় ও শরণ।

বর্দ্ধমানের উপদেশ সবাইকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে জয়ন্তীকে। তাই যখন সকলে চলে গেল তখনো তিনি বসে রইলেন। নানাবিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন বর্দ্ধমানকে। শেষে এক সময়ে বললেন, ভগবন্, ঘুমিয়ে থাকা ভালো না জেগে থাকা?

বর্দ্ধমান প্রত্যুত্তর দিলেন, কারু ঘুমিয়ে থাকা ভালো, কারু জেগে থাকা।

ভগবন্, সে কি রকম?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয় তাদের ঘুমিয়ে থাকা ভালো। কারণ তারা যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে তারা অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের যেমন কারণ হয় না তেমনি নিজেদেরো আরো অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয়, তাদের জেগে থাকাই ভালো। কারণ তারা যদি জেগে থাকে তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদেরো আরো উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী বললেন, ভগবন্, জীবের দুর্বল হওয়া ভালো না সবল হওয়া?

বর্দ্ধমান বললেন, জয়ন্তী, কারু দুর্বল হওয়া ভালো কারু সবল হওয়া।

ভগবন্, সে কি রকম?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয়, তাদের দুর্বল হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি দুর্বল হয় তবে তারা অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের যেমন কারণ হয় না তেমনি নিজেদেরো আরো অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয় তাদের সবল হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি সবল হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদেরো আরো উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী বললেন, ভগবন্, জীবের অলস হওয়া ভালো না উদ্যমী ?

বর্দ্ধমান বললেন, জয়ন্তী, কারু অলস হওয়া ভালো কারু উদ্যমী।

সে কি রকম ?

জয়ন্তী, যারা অধার্মিক, অধর্ম আচরণ করে, অধর্ম যাদের প্রিয় তাদের অলস হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি অলস হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ হয় না তেমনি নিজেদেরো আরো অধোগতিতে নিক্ষেপ করে না। অপরপক্ষে যারা ধার্মিক, ধর্ম আচরণ করে, ধর্ম যাদের প্রিয় তাদের উদ্যমী হওয়াই ভালো। কারণ তারা যদি উদ্যমী হয় তবে তারা যেমন অন্যের দুঃখ, শোক ও পরিতাপের কারণ না হয়ে তাদের ধর্মপথে চালিত করে তেমনি নিজেদেরো আরো উন্নতি সাধন করে।

জয়ন্তী এ ধরণের আরো বহু প্রশ্ন করলেন, বর্দ্ধমানও তার সদুত্তর দিলেন।

প্রশ্ন, দুই-ই কি করে ভালো হয় ? জেগে থাকাও ভালো, ঘুমিয়ে থাকাও ভালো, দুর্বলতাও ভালো, সবলতাও ভালো, আলস্যও ভালো, উদ্যমও ভালো।

এইখানে বর্দ্ধমানের জীবন দর্শন। সত্য একরূপী নয়, বহুরূপী। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে যাচাই করলেই তবে সত্যের সত্যিকার রূপ ধরা পড়ে।

প্রশ্ন তাই কোন অপেক্ষায় সত্য ?

একই জায়গায় যখন গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি তখন গাছ অচল কিন্তু যখন দেখি তার শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লবের বিস্তার, মাটির নীচে শেঁকড়ের তলবীথি তখন গাছ চঞ্চল।

গাছ চঞ্চল না অচল ?

দুই-ই। কোন একটি অপেক্ষায়!

এই বর্দ্ধমানের অনেকান্ত দর্শন।

অনেকান্ত দর্শনই জৈন দর্শন, জৈন দর্শনই অনেকান্ত দর্শন।

বিভিন্ন ধর্ম, মত ও মতবাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার এক অভিনব সূত্র। বর্দ্ধমানের যুগান্তকারী অবদান। বিংশ শতাব্দীর সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রথম উদ্‌ঘোষণা।

[ক্রমশঃ

জৈন-মূর্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পূরণচাঁদ নাহার

[স্বর্গত পূরণচাঁদ নাহারের (১৫ মে ১৮৭৫—৩১ মে ১৯৩৬) জৈন-মূর্তিতত্ত্ব রাধানগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনের (১৩৩১) দ্বিতীয় দিবসে (৭ই বৈশাখ) ইতিহাস শাখায় পঠিত হয়। উল্লিখিত অধিবেশনের কার্যবিবরণে 'পঠিত প্রবন্ধাদির সারাংশ' অধ্যায়ে লেখা হয় :

'৬। জৈন-মূর্তিতত্ত্ব। লেখক—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল।

এই প্রবন্ধে জৈন দেবদেবীগণের মূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। জৈনগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবী ও ধর্মাচার্যগণের মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করেন। দেবগণের মধ্যে আবার নানাবিধ বিভাগ আছে। উর্দ্ধলোক, অধোলোক ও তির্যকলোক-ভেদে এই সকল দেবগণ ১৯৮ প্রকার বিভাগে বিভক্ত। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রথমেই এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। পরে মূর্তি প্রস্তুতের উপাদান, মূর্তির স্থাপন-প্রণালী, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ভেদে মূর্তির আভরণ পার্থক্য, দেশভেদে মূর্তি ও তাহার অর্চনা প্রণালীর পার্থক্য, সম্প্রদায় ভেদে মূর্তি-স্থাপনের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়া 'প্রবচন সারোদ্ধার' নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থংকরগণের শাসন-যক্ষযক্ষিণীর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিবরণে চতুর্বিংশতি যক্ষ ও চতুর্বিংশতি যক্ষিণীর নাম, আকার, বর্ণ, বাহন, আয়ুধ প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।'—কার্যবিবরণ, পৃঃ ৬৯।

দীর্ঘকাল পরে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঁয়ত্রিশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫) জৈন-মূর্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথম মুদ্রিত হয়।

—সম্পাদক, শ্রমণ]

এদেশের মূর্তিতত্ত্ব (Iconography ও Iconology) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা যেরূপ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেছেন, তাহার তুলনায় আধুনিক কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এ বিষয়ের এযাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস বা বিবরণ এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহাশয়, যিনি এই সম্মিলনীর ইতিহাস-শাখার সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি আমাকে জৈন-মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিবার জন্য কয়েকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এবার তাঁহারই আগ্রহে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমার এই প্রথম উদ্যমের ত্রুটি সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

যে দেবতাকে ভক্তি ও পূজা করা আবশ্যক, সেই দেবতার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করাই মূর্তিতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনেরা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতার ও ধর্মাচার্যদিগের প্রতিমা ব্যতীত চরণ ও চরণ-চিহ্নেরও অর্চনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণতঃ যে কয়প্রকার জৈন দেবমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে।

জৈন-মূর্তি তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে জৈন দেবতত্ত্ব জানা আবশ্যক। তজ্জন্য আশাকরি, তাঁহাদিগের উপাস্য তীর্থংকর অর্থাৎ অর্হন্ত দেবগণ ব্যতীত জৈন মতে দেব ভেদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জৈন শাস্ত্রানুসারে সর্বপ্রকার দেবতাগণের বিভাগ এইরূপ বর্ণিত আছে: উর্ধ্বলোকে—(১) বৈমানিক বারপ্রকার, (২) কিল্‌বিষ তিন প্রকার, (৩) লোকান্তিক নয় প্রকার, (৪) গ্রৈবেয়ক নয় প্রকার, (৫) অনুত্তরবিমান পাঁচ প্রকার। অধোলোকে—(১) ভুবনপতি দশ প্রকার, (২) পরমাধামিক পনের প্রকার, (৩) ব্যন্তর ও বানব্যন্তর যোল প্রকার। তির্যক্‌লোকে—(১) জ্যোতিষ্ক দশ প্রকার ও (২) তির্যক্ জৃম্ভক দশ প্রকার; মোট ৯৯ প্রকার এবং পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্তভেদে সর্বসমষ্টি ১৯৮ প্রকার দেববিভাগ আছে। উপরি উক্ত দেববিভাগের ব্যন্তর বিভাগে যক্ষ ও যক্ষিণীরাই তীর্থংকর-দেবের বিশেষ-ভাবে সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া জৈন মন্দিরে ঐ সেবক ও সেবিকা দেব-দেবীদিগের মূর্তি স্থাপন পূর্বক পূজা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত দেব-বিভাগের মধ্যে বৈমানিক দেবগণের নাম যথাক্রমে এই: (১) সৌধর্ম, (২) ঈশান, (৩) সনৎকুমার, (৪) মাহেন্দ্র, (৫) ব্রহ্ম, (৬) লান্তক, (৭) মহাশুক্র, (৮) সহস্রার, (৯) আনত, (১০) প্রাণত (১১) আরণ, (১২) অচ্যুত।

ভুবনপতি দেবগণের বিভাগ যথাক্রমে এইরূপ: (১) অসুরকুমার, (২) নাগকুমার, (৩) সুবর্ণকুমার, (৪) বিদ্যুৎকুমার, (৫) অগ্নিকুমার, (৬) দ্বীপ-কুমার, (৭) উদধিকুমার, (৮) দিক্‌কুমার, (৯) বস্তুকুমার ও (১০) স্তনিত-কুমার।

ব্যন্তর দেবগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ: (১) পিশাচ, (২) ভূত, (৩) ঋষিবাদী, (৪) ভূতবাদী, (৫) কন্দী, (৬) মহাকন্দী (৭) কোহণ্ডি, (৮) পয়ঙ্গি।

উপরিউক্ত পিশাচ, ভূত, ও যক্ষাদিরও অনেক প্রকার বিভাগ আছে। যথা, পিশাচ পনের প্রকার, ভূত নয় প্রকার, যক্ষ তের প্রকার, রাক্ষস সাত প্রকার, কিন্নর দশ প্রকার, কিম্পুরুষ দশ প্রকার, মহোরগ দশ প্রকার, গন্ধর্ব বার প্রকার।

জ্যোতিষ্ক দেবগণের—(১) সূর্য, (২) চন্দ্র, (৩) গ্রহ, (৪) নক্ষত্র ও (৫) তারকা, এই পাঁচটি প্রধান বিভাগ পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত দেবগণের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহণী সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ জৈন মন্দিরে উপরিউক্ত সামান্য দেবগণের মূর্তি থাকে না। যে সমস্ত মূর্তি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাই নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

জৈনশাস্ত্রোক্ত বর্ণনানুসারে মূর্তি প্রস্তুতপূর্বক প্রতিষ্ঠা করাইয়া, দেবালয় অথবা অপর পবিত্র স্থানে বিধিমত স্থাপন করিয়া, শ্রাবক ও শ্রাবিকারা ভক্তি-পূর্বক পূজা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। সচরাচর জৈনমূর্তিগুলি স্ফটিক, মরকত ইত্যাদি রত্নের ও নানাপ্রকার পাষাণ, ধাতু ও কাষ্ঠ ইত্যাদি উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জৈন মন্দিরে বর্তমান যুগের ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে কোন একজন তীর্থংকরের মূর্তি 'মূলনায়ক' করিয়া বেদীর সর্বোচ্চস্থানে স্থাপন করা হয় ও অন্যান্য তীর্থংকরের মূর্তি বেদীর অন্যান্য স্থানে স্থাপন করা হয়। হিন্দুদিগের দেবমূর্তি প্রধানতঃ চল, অচল ও চলাচল, এই তিন ভাগে বিভক্ত।

কিন্তু জৈনমূর্তির এরূপ বিভাগ নাই। তাহাদের মধ্যে আবশ্যক হইলে সমস্ত-গুলিই চল এবং অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ভাবে স্থাপনা করিলে সর্বপ্রকার বিগ্রহই অচল হইতে পারে।

জৈন তীর্থংকর অর্থাৎ অর্হন্ত মূর্তিগুলি প্রধানতঃ পদ্মাসন-মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থংকরদিগের কায়োৎসর্গমুদ্রার বিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্তিও প্রচলিত আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনমূর্তিগুলির মধ্যে প্রভেদ এই যে, দিগম্বর জৈনদিগের তীর্থংকর মূর্তিগুলি বস্ত্রহীন অর্থাৎ দিগম্বর, শ্বেতাম্বর মূর্তিগুলির কটিদেশে সূত্রচিহ্ন ও কৌপীনের চিহ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতের দক্ষিণপ্রান্তের কোন কোন জৈন মন্দিরে তীর্থংকরের অর্দ্ধপদ্মাসন মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের জৈন মন্দিরে তীর্থংকরগণের আর একপ্রকার চতুর্মুখ বিগ্রহ পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এই চতুর্মুখের, অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাদ্‌ভাগে, দক্ষিণে ও বামভাগে চারিটি তীর্থংকরদেবের মূর্তিগুলির মধ্যভাগে একটি অশোকবৃক্ষ স্থাপন করা হয়। শ্বেতাম্বর মন্দিরে সহস্র-কূটমূর্তি অর্থাৎ একটি ফলকে শতাধিক তীর্থং-কর মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দুই পার্শ্বে দুইটি কায়োৎসর্গমুদ্রার উপরি-ভাগ, দুইটি পদ্মাসন ও মধ্যে আর একটি পদ্মাসন, এই পাঁচটি মূর্তি সাধারণতঃ অষ্টধাতুতে প্রস্তুত করা হয়, ইহার নাম পঞ্চতীর্থ। এই ২৪টি তীর্থংকরের মূর্তি অষ্টধাতুতে থাকিলে তাহাকে চৌবিশী পট্ট অর্থাৎ চতুর্বিংশতি পট্ট বলা হয়। প্রায় সমস্ত জৈন মন্দিরে সিদ্ধচক্র বা নবপদের পূজা হইয়া থাকে। ইহাতে (১) অর্হন্ত ও সিদ্ধের দুইটি পদ্মাসনমুদ্রার মূর্তি, (২) আচার্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই তিনটি উপদেশমুদ্রার মূর্তি ও (৩) চারিটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ইশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ুকোণে যথাক্রমে দর্শন, জ্ঞান, চারিত্র্য ও তপ—এই চারিটির স্থাপনা থাকে। প্রাচীন জৈন মূর্তি মধ্যে কল্পবৃক্ষসহ পূর্বযুগের যুগলিক মূর্তিও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটি বা ততোধিক ইন্দ্রদেবের বা ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্তি, মূল মন্দির-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলির হস্তে সচরাচর চামর থাকে। কোন কোন স্থলে দ্বার রক্ষক দেবতাদিগের হস্তে স্থূল যষ্টি ও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক শ্বেতাম্বর জৈনমন্দিরে এক বা ততোধিক ভৈরব বা দ্বারপালের

স্থাপনা থাকে। দ্বারপাল চারি প্রকার: পূর্বে কুমুদ, দক্ষিণে অঞ্জন, পশ্চিমে বামন ও উত্তর দিকে পুষ্পদন্ত। সাধারণতঃ কেবল একটি নারিকেল বসাইয়া তৈল ও সিন্দুর দ্বারা ক্রমে ক্রমে আয়তন বর্দ্ধিত করা হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়েরা তাঁহাদিগের মন্দিরে ভৈরবের স্থাপন কি পূজা করেন না; তীর্থংকরের মাতা-গণের মূর্তিও কোন কোন মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত হিন্দুমূর্তিগুলির ন্যায় জৈনমন্দিরে সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিপূজাও দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্ট মাঙ্গলিক (স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত, মৎস্যযুগল, দর্পণ, সিংহাসন, কুম্ভকলস, শ্রীবৎস ও সম্পুট) অধিকাংশ শ্বেতাম্বর মূল মন্দিরের দ্বারের শিরোভাগে খোদিত থাকে। কোথাও বা এই দ্বারের মধ্যভাগে একটি পদ্মাসনের জিনমূর্তিও থাকে—যাহাকে মঙ্গলমূর্তি বলা হয়। চতুর্দশ শুভ ও উৎকৃষ্ট স্বপ্ন (যাহা তীর্থংকরের মাতারা গর্ভরাত্রে দেখিয়া থাকেন, যথা: হস্তী, বৃষভ, ইত্যাদি) প্রায় শ্বেতাম্বর মন্দিরে উপযুক্ত স্থানে অঙ্কিত পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কেবলী, শ্রুত-কেবলী, প্রাচীন ও আধুনিক প্রাভাবিক আচার্যগণের কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা চরণ রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। জৈন উপাস্য দেবীদিগের মধ্যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। তাঁহারা ভুবনপতি দেবজাতীয়, কিন্তু তির্যকলোকে বাস করেন। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে: (১) রোহিণী, (২) প্রজ্ঞপ্তি, (৩) বজ্রশৃঙ্খলা, (৪) বজ্রাঙ্কুশা, (৫) চক্রেশ্বরী, (৬) পুরুষদত্তা, (৭) কালী, (৮) মহাকালী, (৯) গৌরী, (১০) গান্ধারী, (১১) সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা, (১২) মানবী, (১৩) বৈরোট্যা, (১৪) অচ্ছুপ্তা, (১৫) মানসী, (১৬) মহামানসী। বলাবাহুল্য, হিন্দুদিগের মত জৈনদিগের পূজাতেও নবগ্রহ ও ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্ম ও নগ এই দশ দিক্‌পাল ও সোম, যম, বরুণ, কুবের এই চারিটি লোকপালেরও স্থাপনা করিয়া পূজা হইয়া থাকে। দিক্‌পালগণও ভুবনপতি দেবশ্রেণীর অন্তর্ভূত। এতদ্ব্যতীত নয়টি নিধান-দেবতা ও ৪টি বীর-দেবতার পূজা দেওয়া হয়। নবনিধান ও বীরদেবগণ ব্যন্তর শ্রেণীভুক্ত। নবনিধান দেবগণের নাম যথাক্রমে: (১) নৈসর্প, (২) পাণ্ডুক, (৩) পিঙ্গল, (৪) সর্বরত্ন, (৫) মহাপদ্ম, (৬) কাল, (৭) মহাকাল

(৮) মানব ও (৯) শঙ্খ। বীর-দেবগণের নাম: (১) মানভদ্র, (২) পূর্ণভদ্র (৩) কপিল ও (৪) পিঙ্গল।

প্রসিদ্ধ Indian Antiquary নামক পত্রিকার Vol. XIII এর ২৭৬ পৃষ্ঠায় ডাঃ বার্জেস সাহেব লিখিয়াছেন যে, জৈনদিগের প্রত্যেক তীর্থংকরের দুইটি করিয়া সেবিকাদেবী (একটি যক্ষিণী ও একটি দেবী) থাকে, ইহা ঠিক নহে। এ বিষয়ে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। কেবলমাত্র কয়েকটি নামের ও চিহ্নের ইতরবিশেষ আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় মতে প্রত্যেক তীর্থংকরের একটি করিয়া যক্ষ ও একটী করিয়া যক্ষিণী থাকে, যক্ষিণী ও দেবী পৃথক্ নহে। ইঁহাদিগকে শাসন-যক্ষ ও শাসন-যক্ষিণী বা দেবী বলা হয়।

পরিশেষে জৈনদিগের একখানি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ প্রবচনসারোদ্ধার নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থংকরগণের শাসন-যক্ষ-যক্ষিনীর বিবরণ, মূল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদসহ পাঠকগণের গোচরার্থ উদ্ধৃত করা হইল।

উক্ত গ্রন্থের ষড়্‌বিংশতি ও সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে এই বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত জৈন-মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্বেতাম্বর দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্তরে তাহা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

[ক্রমশঃ

জৈন রামায়ণ

রামকথা ভারতবর্ষে যত জনপ্রিয়, এমন বোধ হয় আর কোনো কথাই নয়। তাই রামকথা অবলম্বনে এখানে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাল্মীকির কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি প্রথম রামায়ণ রচনা করেন বলে বলা হয়। বাল্মীকি শুধু যে প্রথম রামায়ণ রচনা করেন তাই নয়, তিনি আদি কবি, এবং রামায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম কাব্য। এরপর সেই কথাই সামান্য পরিবর্তনে মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ু-পুরাণ প্রভৃতি পুরাণে গৃহীত হয়েছে। সময়ে সময়ে বিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলিও রামকথাকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে যার ফলে যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালের সংস্কৃতি কবিরাও রামকথা অবলম্বনে রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, উদার-রাঘব, প্রতিমা-নাটক, মহাবীরচরিত, উত্তর-রামচরিতের মতো কাব্য নাটকাদি রচনা করেছেন। তামিল তেলেগু, মলয়ালম, কাশ্মীরী, অসমিয়া, বাঙ্‌লা, উড়িয়া, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী এমন কি উর্দু, ফারসী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও রামায়ণ রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের বাইরেও আবার রামকথার প্রচলন দেখা যায়। সিংহল, তিব্বত, খোটান, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশও রাম-কথাবলম্বনে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতবর্ষের কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতেই যে রামায়ণ রচিত হয়েছে তা নয়, বৌদ্ধ ও জৈন শ্রমণ সংস্কৃতিতেও রামায়ণ রচিত হয়েছে। বৌদ্ধ দশরথ জাতকের কথা হয়ত অনেকের জানা আছে, কারণ তা এককালে পণ্ডিত মহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। সেইটিই নাকি প্রচলিত রামায়ণের আদিতম রূপ। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে পরবর্তীকালে রামকথা তেমন আর রচিত হয়নি। জৈন সাহিত্যে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত দেখা যায়। সেখানে রামকথাবলম্বনে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে সাহিত্যও ব্রাহ্মণ্য রামায়ণ

সাহিত্যের মতোই বেশ বড়। অথচ সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি খুব বেশী নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাই জৈন রামায়ণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

দশরথ জাতকে ভগবান বুদ্ধকে রামচন্দ্রের পুনরাবতার বলা হয়েছে। পূর্বজন্মে শুদ্ধোধন ছিলেন রাজা দশরথ, রাণী মহামায়া রামের মা, রাহুল মাতা সীতা, প্রধান শিষ্য আনন্দ ভরত, ও সারিপুত্র লক্ষ্মণ। জৈন সাহিত্যে অবশ্য রামকে তীর্থংকর গোত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়নি তবে ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষের একজন শলাকাপুরুষ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। শলাকাপুরুষ বলতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। চব্বিশ জন তীর্থংকর, বারো জন চক্রবর্তী, নয় জন বলদেব, নয় জন বাসুদেব ও নয় জন প্রতি-বাসুদেব এই নিয়ে জৈনদের ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ। জৈন সাহিত্যে রাম, লক্ষ্মণ ও রাবণ যথাক্রমে অষ্টম বলদেব, বাসুদেব ও প্রতি-বাসুদেব। নবম বা শেষ বলদেব, বাসুদেব ও প্রতিবাসুদেব বলরাম, কৃষ্ণ ও জরাসন্ধ।

জৈনরা কালচক্রকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি ভাগে ভাগ না করে দুটি ভাগে ভাগ করেন। এক উৎসর্পিণী, দুই অবসর্পিণী। উৎসর্পিণী ক্রমিক অভ্যুদয়ের যুগ, অবসর্পিণী ক্রমিক অবনতির। উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী প্রত্যেককে আবার ছ'টি অর বা ভাগে ভাগ করা হয়। জৈন মান্যতা অনুসারে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর তৃতীয় ও চতুর্থ অরে ২৪ জন তীর্থংকর, ১২ জন চক্রবর্তী, ৯ জন বলদেব, ৯ জন বাসুদেব ও ৯ জন প্রতি-বাসুদেব জন্ম গ্রহণ করেন। বলদেব, বাসুদেব ও প্রতি-বাসুদেব প্রায় একই সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাসুদেব তাঁর বড় ভাই বলদেবের সাহায্যে প্রতি-বাসুদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে ভারতবর্ষের তিনটি খণ্ডের ওপর আধিপত্য লাভ করেন ও অর্দ্ধচক্রবর্তী রাজা হন। (চক্রবর্তী রাজা ভারতবর্ষের ছ'টি খণ্ডের ওপর আধিপত্য করেন।*) মৃত্যুর পর বাসুদেব প্রতি-বাসুদেবকে হত্যা

* জৈন ভূগোলে ভারতবর্ষ হিমবান পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ও অর্দ্ধ চন্দ্রাকার লবণ সমুদ্র দ্বারা তিন দিকে বেষ্টিত। বৈতাঢ্য পর্বত (বিন্ধ্য) প্রথমতঃ ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটী ভাগে ভাগ করে। তারপর হিমবান পর্বত নির্গত সিন্ধু ও গঙ্গা বৈতাঢ্য পর্বত অতিক্রম করে পশ্চিম ও পূর্ব লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। এভাবে উত্তর ভারতের তিনটী ও দক্ষিণ ভারতের তিনটী মোট ছ'টি ভাগ পাওয়া যায়।

করার জন্য নরকে যান (যেমন লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণ)। বলদেব নিজের ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকাকুল হয়ে সংসার পরিত্যাগ করেন ও শ্রমণ দীক্ষা নিয়ে তপশ্চর্যায় কর্মক্ষয় করে মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্ত হন (যেমন রাম ও বলরাম)। প্রতি-বাসুদেব বাসুদেবের চক্রে নিহত হন (যেমন রাবণ ও জরাসন্ধ)।

জৈন রামায়ণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে রাক্ষস ও বানরদের বিদ্যাধর-বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে। এরা পশু যোনীর অন্তর্গত বা বীভৎস জীব নন। প্রাচীন বৌদ্ধগাথা, কথাসরিৎসাগর ও মহাভারতে দেখা যায় যে বিদ্যাধরেরা আকাশচারী ও কামরূপী ছিলেন। বোধহয় এই অলৌকিক শক্তির জন্য সেখানে তাঁদের দেবযোনীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। কিন্তু জৈন সাহিত্যে তাঁরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হলেও মানুষমাত্র। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পউম চরিয়ে যে আখ্যান বিবৃত হয়েছে তা এরূপ: আদি তীর্থংকর ঋষভদেব যখন সংসার পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর রাজ্য তাঁর শত পুত্রের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে যান ও জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করেন। (এই ভরত হতেই আসমুদ্র-হিমাচল এই ভূখণ্ডের নাম হয় ভারতবর্ষ।) পরে তাঁর শ্যালকপুত্রদের দুজন নমি ও বিনমি তাঁর কাছে গিয়ে রাজলক্ষ্মী প্রার্থনা করায় তিনি তাঁদের কতকগুলি বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বৈতাঢ্য পর্বতে গিয়ে তাঁদের রাজ্য স্থাপনা করতে বলেন। এই নমি ও বিনমি হতে বিদ্যাধর-বংশের উদ্ভব হয়। বিদ্যাধর নামের কারণ এরা কতকগুলি বিদ্যাকে ধারণ করেছিলেন। যে সমস্ত বিদ্যাধরদের গৃহ বা ধ্বজাদিতে বানর চিহ্ন অঙ্কিত থাকত তাঁদের বানর বংশী বিদ্যাধর বলা হত। তাই রামায়ণে যাঁদের বানর বলা হচ্ছে তাঁরাও বিদ্যাধর বংশীয় মানুষ।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে যেমন রামায়ণের প্রধানতঃ দুটি রূপ পাওয়া যায়: (১) বাল্মীকি রামায়ণের (২) অদ্ভুত রামায়ণের, জৈন সাহিত্যেও তেমনি দুটি রূপ পাওয়া যায়। (বৌদ্ধ দশরথ জাতকের রূপটী এগুলি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।) প্রথমটি বিমল সূরীর পউম চরিয়ের, দ্বিতীয়টি গুণভদ্রাচার্যের উত্তরপুরাণের। তবে জৈনদের মধ্যে বিমল সূরীর পউম চরিয়েরই প্রচলন বেশী। কারণ এই রূপটি জৈন দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত। গুণভদ্রের উত্তর পুরাণের প্রচলন কেবলমাত্র দিগম্বরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিমলসূরি তাঁর পউম চরিয়ে লিখছেন যে যে পদ্মচরিত (জৈন সাহিত্যে রামের অপর নাম পদ্ম) আচার্য পরম্পরায় প্রচলিত ছিল এবং নামাবলী নিবদ্ধ ছিল তিনি সেই বিষয়বস্তু অবলম্বনে তাঁর পউম চরিয় রচনা করছেন। পউম চরিয়ের রচনাকাল জৈন মতে খৃষ্টীয় ৭২ অব্দ। কিন্তু ভাষার দৃষ্টিতে ডঃ জেকোবি মনে করেন যে পউম চরিয় খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের রচনা। সে যা হোক, বাল্মীকি যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আদি কবি, বিমল সূরী তেমনি প্রাকৃত সাহিত্যের আদি কবি এবং তাঁর পউম চরিয় প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম কাব্য। পউম চরিয়ের ভাষা মহারাষ্ট্রী জৈন প্রাকৃত। এরই রূপান্তর রবিষেণাচার্যকৃত সংস্কৃত পদ্মচরিত (৬০ খৃষ্টাব্দ)। রবিষেণ তাঁর রচনায় মৌলিকত্বের পরিচয় না দিলেও সংস্কৃত ভাষার জন্য রবিষেণের পদ্মচরিতই পরবর্তীকালের জৈন কবিরা আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্রাচার্য তাঁর ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতের অন্তর্গত রামায়ণে মুখ্যতঃ বিমল সূরী ও রবিষেণকেই অনুসরণ করেছেন। বিমলসূরী ও রবিষেণের অনুসরণে যে জৈন রামকথা মূলক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তা এরূপ :

(ক) প্রাকৃত :

(১) বিমলসূরীর পউম চরিয় (খৃঃ ৩-৪ শতক)।

(২) শীলাচার্যকৃত চউপন্নমহাপুরিসচরিয়-র অন্তর্গত রামলক্ষ্মণচরিয়ম্ খৃঃ ৯ম শতক)।

(৩) ভদ্রেশ্বরকৃত কহাবলীর অন্তর্গত রামায়ণম্ (খৃঃ ১১শ শতক)।

(৪) ভুবনতুঙ্গসূরী রচিত সীয়াচরিয় ও রামলক্ষ্মণচরিয়।

(খ) সংস্কৃত :

(১) রবিষেণকৃত পদ্মচরিত (খৃঃ ৬৬০ অব্দ)।

(২) হেমচন্দ্রাচার্যকৃত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতের অন্তর্গত জৈন রামায়ণ (খৃঃ ১২ শ শতক)।

(৩) হেমচন্দ্রাচার্যকৃত যোগশস্ত্রের টীকার অন্তর্গত সীত-রাবণ কথানকম্।

(৪) জিনদাসকৃত রামায়ণ বা রামদেব পুরাণ (খৃঃ ১৫শ শতক)।

(৫) পদ্মদেব বিজয়গণিকৃত রামচরিত্র (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতক)।

(৬) সোমসেনকৃত রামচরিত (খৃঃ ১৬শ শতক)

(৭) আচার্য সোমপ্রভকৃত লঘুত্রিশষ্টিশলাকাপুরুষচরিত।

(৮) মেঘবিজয়গণিকৃত লঘুত্রিশষ্টিশলাকাপুরুষচরিত (খৃঃ ১৭শ শতক)।

এছাড়া জিনরত্নকোষে চন্দ্রকীর্তি, চন্দ্রসাগর, শ্রীচন্দ্র, পদ্মনাভ প্রভৃতি রচিত বিভিন্ন পদ্মপুরাণ ও রামচরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলির অধিকাংশই আজো অপ্রকাশিত।

(গ) অপভ্রংশ :

(১) স্বয়ম্ভূরচিত পউম চরিউ বা রামায়ণ পুরাণ (খৃঃ ৮ম শতক)।

(২) রঘুকৃত পদ্মপুরাণ অথবা বলভদ্রপুরাণ (খৃঃ ১৫শ শতক)।

(ঘ) কন্নড় :

(১) নাগচন্দ্ররচিত পদ্মরামায়ণ বা রামচন্দ্রচরিতপুরাণ (খৃঃ ১১শ শতক)।

(২) কুমুদেন্দুকৃত রামায়ণ (খৃঃ ১৬ শতক)।

(৩) দেবপ্পকৃত রামবিজয় চরিত (খৃঃ ১৬ শতক)।

(৪) দেবচন্দ্রকৃত রামকথাবতার (খৃঃ ১৮শ শতক)।

(৫) চন্দ্রসাগর বর্ণীকৃত জিন রামায়ণ (খৃঃ ১৯শ শতক)

এছাড়া রাজস্থানী ভাষাতে সীতারাম রাস চৌপাই ইত্যাদি নিয়ে খৃঃ ষোড়শ শতক হতে একাল অবধি যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার সংখ্যাও পঞ্চাশের ওপর।

জৈন কথানক সাহিত্যে সংঘদাসকৃত বাসুদেব হিণ্ডিতেও (বাসুদেব ভ্রমণ) সংক্ষিপ্ত রামকথা পাওয়া যায়। তবে তার বিষয়বস্তু অনেকটা বাল্মীকি রামায়ণের মতো। তাই তার নাম উপরোক্ত তালিকায় দেওয়া হয় নি। হরিষেণকৃত কথাকোষেও রামায়ণ কথানকম্, সীতাকথানকম্ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত ললিত সাহিত্যের মতো মৈথিলী কল্যাণ, অঞ্জনা পবনঞ্জয় প্রভৃতি নাটকাদিও জৈন সাহিত্যে রচিত হয়েছে। জৈন রামায়ণ সাহিত্য তাই বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্য রামায়ণ সাহিত্যের মতো স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে।

[ক্রমশঃ

সরাক জাতি

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সন ১৩২৫ সাল বোধ হয়। ১৩২৪-ও হইতে পারে। আমি বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে বীরভূম ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ কার্যে বীরভূম ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। রামপুর হাটের পশ্চিমে 'আয়ন' গ্রামের নাম শুনিয়া লৌহ সম্বন্ধীয় কিছু আছে মনে করিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম পুর্বে সেখানে পাথর হইতে লোহা তৈরী হইত। তাহার নানারকম প্রক্রিয়ার কথা শুনিলাম। লোহা তৈরীর পর যে পোড়া পাথর জমিত তাহার প্রকাণ্ড ধ্বংস স্তূপ দেখিলাম। যাহারা 'শালে' লোহা তৈরী করিত তাহাদের নাম ছিল শালুই। বহু লোকের জীবিকা নির্বাহিত হইত। লোহা বেচিয়া অনেকেরই অবস্থা ফিরিয়াছিল। বিদেশ হইতে লোহা আসিয়া ইহাদের ভাতে ধূলা দিয়াছে। এই লোহা তৈরীর ব্যাপারে পাথরের উপরে যে মাটীর লেপন দেওয়া হইত সেই মাটী আনিতে হইত 'খড়বোনা-কান্দুরী' গ্রাম হইতে। খড়বোনা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মাটী দেখিলাম।

একটী জাতির কয়েক ঘর মাত্র লোক দেখিলাম, নাম 'সরাক'। তাঁত বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। বিধবাদের বিবাহ হয় না। তাহারা একাদশী করে। আশ্চর্যের বিষয় শিশু ছেলে মেয়ে যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা কেহ মাছ মাংস পিঁয়াজ ডিম খায় না। সম্পূর্ণ নিরামিষাশী জাতি। ইহারা লাঙ্গল ধরে না, চাষ করে না। শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণে ইহাদের যজন যাজন করেন।

আমি জানিতাম বৌদ্ধদের দুটী সম্প্রদায় শ্রমণ ও শ্রাবক। আমি বীরভূম বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিলাম ইহারা বৌদ্ধ ছিল। শ্রাবক হইতে শরাক বা সরাক হইয়াছে। লোকে বলে সরাকি তাঁত। পরে জানিয়াছি ইহারা জৈন ছিল। বৌদ্ধগণ মাছ মাংস খাইত, তান্ত্রিক আচার পালন করিত। জৈনগণ সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করে, ইহাদের উপাধি ছিল সরাওগী। সরাওগী হইতে সরাক হইয়াছে। সংখ্যাল্পতার জন্য হিন্দুদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বৈবাহিক আদান প্রদানের অসুবিধায় জাতিটা লোপ পাইবে এই আশঙ্কাও প্রকাশ করিয়াছিলাম। জানি না খড়বোনায় এখন 'সরাক' সম্প্রদায় আছে কি না। থাকিলে কয়েক ঘর কি অবস্থায় আছে তাহাও জানি না।

সমরাদিত্য কথা

হরিভদ্র সূরী

[কথাসার]

গুণসেন নিজের পিতামাতার যেমন অত্যন্ত প্রিয় পুত্র ছিল তেমনি ছিল নিজের প্রজাপুঞ্জের একান্ত প্রিয় যুবরাজ। সংযম ও বিনয় তাকে যেন জন্ম হতেই বরণ করে নিয়েছিল। হঠকারী মিত্র ও খোসামোদী পারিষদবর্গ হতে সে থাকত শত যোজন দূরে। কিন্তু তার মধ্যে একটি মাত্র দুর্বলতা ছিল এবং সে দুর্বলতা তার কৌতুকপ্রিয়তা।

জীবনে আনন্দ কৌতুকের স্থান অবশ্যই আছে, এবং থাকাও উচিত। অনেকের অভিমত এই যে আনন্দ হতেই এই সংসারের উদ্ভব হয়েছে এবং আনন্দেই তা বিলীন হবে। কিন্তু সত্য ত এই যে সে আনন্দ নির্দোষ হওয়া চাই। সে আনন্দ যেন অন্যের পীড়াদায়ক না হয় বা তার বৈরবৃত্তিকে যেন জাগ্রত না করে।

কিন্তু গুণসেন একদিন আনন্দের এই সীমারেখার কথা ভুলে গেল। অগ্নিশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ যুবককে দেখা মাত্র তার কৌতুক প্রবৃত্তি এত উদগ্র হয়ে উঠল যে অগ্নিশর্মাও মানুষ—মাটীর পুতুল নয়, তারও ইষ্ট শোক, স্বাভিমান ও প্রতিষ্ঠা বোধ আছে সেকথা তার মনে রইল না।

অগ্নিশর্মাকে দেখা মাত্র গুণসেন তার দিকে আকৃষ্ট হল। এর একটা কারণ এই যে সে অত্যন্ত কুরূপ ছিল। কিন্তু সে তো অগ্নিশর্মার দোষ নয়। অন্য ভাবে দেখলে সে এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের পুত্র ছিল। পূর্ব জন্মের কোন কর্মের জন্য তার দেহ এমন আকার লাভ করেছিল যেখানে পশু ও মানব দেহের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছিল। সেই দেহ অন্যের কৌতুক প্রবৃত্তিকে যে জাগ্রত করবে তা স্বাভাবিকই।

তেকোণা মাথার মধ্যে হলুদ রঙের দুটো চোখ তার জ্বল জ্বল করত। নাক তার এত চ্যাপ্টা ছিল যে মনে হত বিধাতা ভুল করে থাপ্পড় মেরে

নাকের দাঁড়াটাকে যেন ভেতরে বসিয়ে দিয়েছেন। কানের জায়গায় ছিল মাত্র দুটো ছিদ্র। তার দাঁত দিনের বেলাতেও ভীতি উৎপন্ন করত। হাত ছিল বাঁকা ও ছোট। পেট মোটা ও গোল। এবং গলা ছিল না বললেই চলে।

কুমার বা ছুতোর মাটি বা কাঠ দিয়ে এর চাইতে আরো যুতসই প্রতিকৃতি অবশ্যই তৈরী করতে পারত। তাই প্রথম দিন তাকে দেখা মাত্রই গুণসেন হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর তার কথায় যখন সে দুলে দুলে নাচল তখন গুণসেন তার পেছনে প্রায় পাগল হয়ে গেল।

তাকে দেখে তার সামনে কেউ হাসে বা মজা করে অগ্নিশর্মার তা একদম পছন্দ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তাই এখন সে আর রাগ করত না। সে যেখানে যেখানে যেত বা যে পথ দিয়ে যেত সেখানে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা হত। অগ্নিশর্মা এখন সে সব শান্ত ভাবে সহ্য করে। সহ্য করে তার কারণ এর প্রতিকারের তার কাছে কোন পথই ছিল না। তার পিতা যজ্ঞদত্তেরও তা ভাল লাগত না। কিন্তু সেই রাজাশ্রিত ব্রাহ্মণের না ছিল শাপ দেবার ক্ষমতা বা অন্য কোন শক্তি। এবং লোকে সে-কথা বেশ ভালো ভাবেই জানত।

প্রথম কিছুদিন অগ্নিশর্মাকে নাচিয়ে রাগিয়ে গুণসেন ও তার বন্ধুরা আনন্দ করল তারপর যখন সে আনন্দ পুরনো হয়ে গেল তখন তাকে আর কী ভাবে উত্যক্ত করা যায় সেকথা তারা ভাবতে লাগল।

একজন বলল, শর্মাকে যদি গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর ভ্রমণ করান যায় ত বেশ মজা হয়। নগরের লোক এমন দৃশ্য কোথায় ও কবে আর দেখবে?

আর একজন এতে আর একটু রঙ চড়িয়ে বলল, তবে ত শর্মাকে ভালো করে সাজাতেও হবে। মাথা ত মুড়োনোই রয়েছে তাই সেই কষ্ট আর করতে হবে না, তবে গলায় ফুলের মালা পরাবার ভার আমিই নিচ্ছি। যদিও সে ফুলের মালার কথাই বলল কিন্তু তার বলবার তাৎপর্য ছিল পুরনো ছেঁড়া জুতোর মালা এবং সেকথা ইঙ্গিতে তারা সকলেই বুঝে নিয়েছিল।

তারপর যেমন যেমন সাজের কথা উঠল তা যাতে অগ্নিশর্মার রূপ ও সৌন্দর্যের অনুকূল হয় সকলে সেই সেই রকম অভিমত ব্যক্ত করতে লাগল।

তারপর সর্ব সম্মতিতে এ প্রস্তাব গৃহীত হল। গুণসেনও এই প্রস্তাবে খুব আনন্দ ও উল্লাস ব্যক্ত করল।

তারপর যখন অগ্নিশর্মাকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুল তখন ছেলেদের দঙ্গলকে দঙ্গল তার পিছু হয়ে গেল। গাধার পিঠে বসা অগ্নিশর্মার জন্য ভাঙা কুলোর ছাতা ও ফুটো ঢোলকও এসে উপস্থিত হল। এই শোভাযাত্রা নগরের সর্বত্র পরিভ্রমণ করল। অগ্নিশর্মার এতে একটুও সম্মতি ছিল না কিন্তু যে রাজ্যে সে বাস করে, তার যুবরাজেরই যখন এতে সম্মতি রয়েছে, শুধু তাই নয়, অগ্রণী হয়ে হয়ে যখন সে অংশ গ্রহণ করছে সে ক্ষেত্রে এক গরীব ব্রাহ্মণ কিই বা করতে পারে?

ক্ষত্রিয়ের বীর্য সেদিন দীন ভিক্ষাজিবী ব্রাহ্মণত্বকে দমিত করে রেখেছিল। ক্ষত্রিয়ই ছিল সেদিন মানবতার রক্ষক। ব্রাহ্মণ বড়জোর যাগ যজ্ঞ করাত, দক্ষিণারূপ মোটা দান গ্রহণ করে কর্মকাণ্ডে নিজের জীবন ব্যতীত করত। অন্যায়ের প্রতিকার করার তার না ছিল শক্তি বা সামর্থ।

তাছাড়া যজ্ঞদত্ত এক সামান্য পুরোহিত মাত্র ছিল। তার ছেলের এরূপ বিড়ম্বনায় সে দুঃখের গভীর নিঃশ্বাস ফেলত। অগ্নিশর্মাও যুবরাজের এই কৌতুকপ্রিয়তায় অত্যন্ত ক্ষিন্ন ছিল। এক নগর পরিত্যাগ করে যাওয়া ছাড়া এর প্রতিকারের তার কাছে আর কোনো পথ ছিল না।

এই ঘটনার পর গুণসেন যেদিন আবার তার খোঁজ করল সেদিন সে জানতে পারল যে অগ্নিশর্মা তার রাজ্য পরিত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও চলে গেছে।

শিশু যেমন খেলনা হারিয়ে দুঃখিত হয়, গুণসেনও সেরূপ দুঃখিত হল কিন্তু অগ্নিশর্মাকে খুঁজে বার করা এখন আর তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যদি একবার সে তার হাতে পড়ে যায় তবে তাকে পশুর মতো সে বেঁধে রাখবে, বাইরে কোথাও যেতে দেবে না সে সঙ্কল্প সে মনে মনে করে নিয়েছিল কিন্তু অগ্নিশর্মাও প্রাণ থাকতে সেই নগরে ফিরে আসবেনা এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েই গিয়েছিল। তাই গুণসেন তাকে আর খুঁজে পেল না।

॥ ২ ॥

একমাস পর অগ্নিশর্মা এক রমনীয় তপোবনে এসে উপস্থিত হল। এখানে তাকে উৎপীড়িত বা বিরক্ত করতে কোন রাজপুত্র বা শ্রেষ্ঠীপুত্র ছিল না। এখানে ছিল অশোক, বকুল, নাগ ও পুন্নাগ গাছের সমারোহ। আর ছিল ছোট ছোট নদী ও ঝরণা। তাদের কলকল ধ্বনি তপস্বীদের নির্দোষ আনন্দ দিত। আশ্রমবাসীদের কেউ কেউ ছিলেন যাজ্ঞিক। ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করবার যজ্ঞই সনাতন ও সর্বোত্তম পথ বলে তাঁরা মনে করতেন। অন্যরা ছিলেন কঠোর তপস্বী। তপশ্চর্যাকেই তাঁরা জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলে মনে করতেন। এই তপোবনের কুলপতি ছিলেন আর্জব কৌণ্ডিন্য। তিনি তপস্বীদের তীর্থস্বরূপ ছিলেন।

এক সময় এই ধরণের তপোবন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। তপস্যা ছাড়া সিদ্ধিলাভ করা যায় না ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির এইটাই শাশ্বত ও সনাতন সূত্র। এই সংসারের বন্ধন হতে মুক্তি পেতে চাও ত তপস্যা করো, আত্মার অনন্ত শক্তির যদি বিকাশ করতে চাও ত তপস্যা করো, মানব-জাতির যদি কল্যাণ করতে চাও ত তপস্যা করো।

ইতিহাসের মুখোজ্জ্বলকারী কত কত মহাপুরুষেরা কি কি কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তার প্রভাবে আর্যাবর্ত আজো কত গৌরবের অধিকারী সে সব কথা আমরা জানি।

তপোবনে কত কত তাপস ও ঋষি কতভাবে তপশ্চর্যা করতেন কতভাবে দেহ দমন করতেন। সমস্ত তপস্যাই যে ফলপ্রদ হত সেকথা বলা যায় না। কারণ তার কতক কষ্ট সহন মাত্রেই পর্যবসিত হত। তপশ্চর্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্তশুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে সে কথা কম তপস্বীই বুঝতেন। পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করা, শীত ও বর্ষার উপদ্রবের সম্মুখীন হওয়া বা এক হাত উঁচু করে বা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রের আসন কম্পিত করাকেই তাঁরা কৃতকৃত্যতা বলে মনে করতেন।

তপোবনে অন্যভাবে দুঃখী ও উদাসীনও স্থান পেয়ে যেত। সত্যি বলতে কি অগ্নিশর্মার এই জায়গাটি খুব ভালো লেগে গেল। সে সংসারী হয়েও ত প্রায় অসংসারীই ছিল। সংসারে তার ঘর ও বাবা মা ছাড়া আর কেউ ছিল

না। যেখানেই সে যেত সেখানে সে উপহাসের বা কৌতূহলের পাত্র হত। তার শরীরের গঠনই এরকম ছিল যে সে নিরূপায় ছিল। লোকের ঠাট্টা তামসায় সে প্রায় তিক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এই তপোবনে অধিকাংশ সংযমী পুরুষই বাস করতেন। তাই কাউকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবেন সেরকম প্রবৃত্তি সেখানে কারু মধ্যে ছিল না।

আচার্য আর্জব কৌডিন্য এই নূতন অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি তার মুখে বিষাদের গাঢ় কালিমাই দেখলেন না, আরো জেনে নিলেন এই মানুষটিকে আজ পর্যন্ত কেউ মমতা দিয়ে নিজের করে নেয়নি। নিঃসঙ্গতা তার প্রতিটি অঙ্গ হতে ঝরে পড়ছিল। অনেক দিনের ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন ভয়ঙ্কর দেখায় তেমনি স্নেহ মমতা বঞ্চিত অগ্নিশর্মাকেও তাঁর কঠিন পাথরের মতো বলেই মনে হল।

আচার্য তাকে শান্ত ও মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্র, তুমি কোথা হতে আসছ! তারপর তার কাছ হতে একে একে সমস্ত কথা জেনে নিলেন। শেষে 'ক্লেশতপ্তানাম্ হি তপোবনম্' বলে সেই আশ্রমে তাকেও এক পর্ণকুটির নির্মাণের আদেশ দিলেন।

অগ্নিশর্মাও তার সমস্ত মন দিয়ে গুরুর সেবা করতে আরম্ভ করল। আচার্য কৌডিন্যের সত্যিকার সেবাকারী শিষ্যের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু অগ্নিশর্মা তাদের থেকেও নিজেকে অনন্য বলে প্রমাণ করে দিল। যত দূর সম্ভব সে তার গুরুর কাছ থেকে দূরে থাকত না এবং তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত।

আচার্য নিজেও তপস্বী ছিলেন। তাই তাঁর কাছে যারা আসত তাঁদের তিনি আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদ হতে দূরে থাকতে বলতেন। বলতেন জিহ্বার স্বাদ-লোলুপতা মানবত্বকে বিনষ্ট করে, আমোদ-প্রমোদ তাকে মদোন্মত্ত করে দেয়। এছাড়া তাঁর কাছে বলবার আর কিছুই ছিল না। যারা শুনত তাদের মনে হত শাস্ত্রের এই মাত্রই সার নিষ্কর্ষ।

অল্পদিনের পরিচয়েই, অগ্নিশর্মার জীবনে এক সংস্কার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। তার বিশ্বাস হল সংসারের প্রাণী মাত্রই নিজ কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। সেই কর্মকে বিনষ্ট করার তপস্যা ছাড়া আর অন্য কোনো সাধন নেই।

দুঃখ-গর্ভিত বৈরাগ্যের মাটিতে অগ্নিশর্মা এক কল্পবৃক্ষ অঙ্কুরিত করবার সাধনা প্রারম্ভ করে দিল। অন্য তাপসদের মতো ছোট ছোট সাধনার পুষ্প-বৃক্ষ রোপণে তার মনই ভরল না। রোগ নিবারণের উপায় যখন পাওয়া গেছে তখন পুরোপুরি ওষুধ পান করার সঙ্কল্পও সে গ্রহণ করে নিল। দিনের পর দিন অন্ন জল গ্রহণ না করা বা শীতোষ্ণতাকে এক ভাবে গ্রহণ করা অগ্নিশর্মার পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল না। আজ পর্যন্ত তার সমস্ত জীবন সে এই ধরণের কষ্ট সহ্য করেইত ব্যতীত করেছে।

কালান্তরে অগ্নিশর্মার উগ্র তপশ্চর্যাই এই আশ্রমকে দেদীপ্যমান করে দিল। তার তপশ্চর্যার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। শেষে অগ্নিশর্মা এক এক মাসের উপবাস করতে আরম্ভ করল। উপবাসের পারণের দিন ভিক্ষার জন্য সে মাত্র একজন গৃহস্থের ঘরে যেত এবং সেখানে যদি সে ভিক্ষা না পেত তাহলে অনাহারেই সেদিন ব্যতীত করত এবং তার পর দিন হতেই আবার আর এক মাসের উপবাস করতে আরম্ভ করে দিত।

অগ্নিশর্মার তপশ্চর্যার কথা শুনে লোকে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেত। উগ্র তপস্যার এ যেন এক পরাকাষ্ঠা। এক মাসের উপবাসের পর মাত্র একজন গৃহস্থের ঘর হতে ভিক্ষা নেবার আগ্রহ লোকদের চিন্তিত করে তুলল।

তার বিরূপ দেহের কথা এখন লোকে আর মনে করে না। অগ্নিশর্মাকে দেখে যারা একদিন হাসি ঠাট্টা করত তারাই এখন তাকে দেখলে হাত জোড় ও মাথা নীচু করে প্রণাম করতে আরম্ভ করল। তপশ্চর্যার দিব্যশক্তি যেন তার মধ্যে এক নূতন লাবণ্য এনে দিয়েছে, লোকে সেরকমই এখন মনে করতে লাগল।

রূপহীন অগ্নিশর্মা তাই এখন উগ্র তপস্যার প্রভাবে লোকের বন্দনীয় হয়ে উঠল। তার চোখ, মুখ, মাথা ও বাহ্য আকৃতি এখন নগণ্য হয়ে গেল। ভক্তদের চোখে সে তপস্যার তেজে দীপ্ত কোনো স্বর্গীয় দেবতা বলেই মনে হতে লাগল। তাপ যেমন স্বর্ণকে নির্মল করে তেমনি তপস্যাও যে বিকৃতিকে দূর করতে সমর্থ অগ্নিশর্মা তা প্রমাণিত করে দিল।

[ক্রমশঃ

আমাদের কথা

তথাগত বুদ্ধের মতো ভগবান মহাবীরও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। খৃষ্টজন্মের ৫৯৯ বছর আগে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি জ্ঞাতৃবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন ত্রিশলা। তিনি বৈশালী গণতন্ত্রের অধিনায়ক চেটকের বোন ছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল বর্দ্ধমান। জ্ঞাতৃবংশীয় বলে জ্ঞাতপুত্র বা নাতপুত্ত বলেও তিনি অভিহিত হয়েছেন।

বুদ্ধ হতে যেমন বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছে মহাবীর হতে যে সেরকম জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে সেকথা বলা যায় না। জৈন ধর্ম মহাবীরের পুর্বেও বর্তমান ছিল। তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থংকর পার্শ্বনাথের শিষ্য সম্প্রদায় মহাবীরের সময় বর্তমান ছিলেন জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবীরের পিতামাতা ভগবান পার্শ্বের অনুযায়ী ছিলেন।

পার্শ্বনাথের পূর্ববর্তী তীর্থংকর অরিষ্ট নেমি। তাঁর পূর্বে আরো ২১ জন তীর্থংকর হয়েছেন। প্রথম বা আদি তীর্থংকর ভগবান ঋষভ। ঋষভ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ ছিলেন যখন সভ্যতার প্রথম বিকাশ হতে আরম্ভ হয়। ঋষভের নাম বেদে ও পুরাণে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁকে বাতরশন মুনিদের প্রমুখ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর লাঞ্ছন ছিল বৃষ। সিন্ধু সভ্যতার বৃষ সম্ভবতঃ তাঁর স্মৃতিকেই বহন করে।

মহাবীর তাই এক অতি প্রাচীন ধর্মের ধারক ও বাহক ছিলেন।

মহাবীরের শৈশব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জানা যায় না গৌতম বুদ্ধের মতো তাঁর জীবনে এমন কোনো সন্ধিক্ষণ এসেছিল কিনা যেখানে রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, মৃত ও সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি দর্শনে সংসার পরিত্যাগে তিনি উদ্বুদ্ধ হন। পূর্ববর্তী তীর্থংকরদের জীবনেও এ ধরণের সন্ধিক্ষণের উল্লেখ আছে। ঋষভের নিলাঞ্জনার মৃত্যু দর্শনে বৈরাগ্য জাগ্রত হয়। অরিষ্টনেমি তাঁর বিবাহে উপস্থিত রাজন্যবর্গের জন্য পশু হত্যা করা

হবে শুনে তৎক্ষণাৎ সংসার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু মহাবীরের জীবনে সেরকম কোনো কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই তাঁর সংসার পরিত্যাগ কোনো একটী বিশেষ আবেগের মুহূর্তে হয় নি। তার পেছনে ছিল দীর্ঘ দিনের চিন্তন, মনন ও অনুশীলন। তিনি এর প্রয়োজনীয়তা মনে মনে অনুভব করেছিলেন। এবং সে প্রয়োজনীয়তা ছিল শ্রমণ আদর্শের পুনরুজ্জীবনের।

মহাবীর ৩০ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘ ১২ বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এমন কি আর্য পরিধির সীমা অতিক্রম করে অনার্য ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেও তিনি প্রব্রজন করেন। এই প্রব্রজনের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে যেমন পরিচয় করা তেমনি নিজেকে সেই মহান দায়িত্ব যাতে যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য প্রস্তুত করা। সেই সময় ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ আদি বহু মতবাদ প্রচলিত ছিল যাদের নেতা ছিলেন অজিত কেশকম্বলী, প্রকুধ কাচ্চায়ন, সংজয় বেলট্‌ঠীপুত্ত, পূরণ কাশ্যপ, মংখলীপুত্র গোশালক আদি। তিনি সেগুলোকে আত্মসাৎ করেছেন। তারপর যখন নিজেকে প্রস্তুত পেয়েছেন তখন ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি ধর্ম প্রচার করেছেন। কোনো নূতন ধর্মমত নয়, সেই প্রাচীন ধর্ম, নূতন পরিবেশে, নূতন শৈলীতে, যে ধর্ম সাম্য ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সাম্য কেবল-মাত্র মানুষে মানুষে নয়, এ সাম্য বিশ্বের প্রত্যেকটী জীবের সঙ্গে। শ্রমণ ধর্ম জাতি ও বর্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না; গুরু যে কেউ হতে পারে, যদি সে সদাচারী ও শীল সম্পন্ন হয়।

ভগবান মহাবীরের প্রচারের মূল্যাঙ্কন আজো হয় নি। হয় নি তার কারণ তাঁর অনুযায়ীরা তাঁকে দেবতায় পরিণত করে তাঁর পুজার্চনায় নিরত হয়েছেন আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। এমন কি তাঁদের সাহিত্যে মহাবীরের নাম পর্যন্ত কোথাও উল্লিখিত হয় নি। কিন্তু তাঁর প্রচার যে সুদূর প্রসারী হয়েছিল ও তার প্রভাব এত বিস্তৃত যে মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসকে তাকে পূর্ব পক্ষরূপে উপস্থিত করতে

হয়েছে। মহাভারত যে আকারে আমরা পাই তা পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের রচনা। অবশ্য খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অশ্বলায়ন সূত্রে মহাভারতের উল্লেখ পাই। তবে তখন তা কি আকারে প্রচলিত ছিল সেকথা বলা আজ কঠিন। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত মহাভারতের সর্বত্র শ্রমণ আদর্শকেই মহর্ষি বেদব্যাস খণ্ডন ও মণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। অহিংসা সর্বশ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞানুষ্ঠানের যে ফল অহিংসা পালনের সেই ফল সেকথা স্বীকার করেও বেদবিহিত যজ্ঞে পশুবলি সমর্থনযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মহর্ষির সেই প্রয়াস ফলবতী হয় নি। মানুষ শ্রমণ ধর্মের আদর্শকেই গ্রহণ করেছে। বেদের আদর্শকে নয়। তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে গীতায় আত্মযজ্ঞের কথা বলাতে হয়েছে যেখানে অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, হোমকর্তা ব্রহ্ম ও তৎ কর্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোমও ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে আত্মা দ্বারাই হোম করতে হবে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এতখানি পশ্চাদপসরণের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষে মহাবীরকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যা আমাদের গৌরবের তা এই যে মহাবীরের এই আন্দোলনের ফলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে নূতন রূপ দান করতে হয়েছে যার পরিণাম স্বরূপ উপনিষদের আত্মবাদই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে উপনিষদের প্রবক্তা ব্রাহ্মণ নয়, তীর্থংকরদের মতোই ক্ষত্রিয়।

ভগবান মহাবীরের নির্বাণের আজ ২৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ তাই সময় হয়েছে সেই সত্য উদ্‌ঘাটনের যাতে ভগবান মহাবীরের সত্যকার মূল্যাংকন হয়। এর জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের গবেষণা মূলক অধ্যয়ন। আশাকরি আমাদের দেশের বিদগ্ধ সমাজ এ বিষয়ে প্রযত্নশীল হবেন।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. II. No. 9 : Sraman : January 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

ফাল্গুন ১৩৮১
দ্বিতীয় বর্ষ : একাদশ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৮১ ॥ একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

যবন দ্বাররক্ষী, রাণী গুম্ফা
উদয়গিরি, উড়িষ্যা

বৰ্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

একদিন মুনি আর্দ্রক চলেছেন গুণশীল চৈত্যে বর্দ্ধমানকে বন্দনা করবার জন্য। পথে আজীবিক সম্প্রদায়ের নেতা গোশালকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। গোশালক তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, আর্দ্রক, তোমায় একটা কথা বলি।

আর্দ্রক বললেন, বলুন।

আর্দ্রক, তোমার ধর্মাচার্য শ্রমণ বর্দ্ধমান আগে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন, আর এখন অনেক সাধু সাধ্বী একত্রিত করে তাদের সম্মুখে বসে অনর্গল বকে যান।

হাঁ, তা জানি। কিন্তু আপনি কি বলতে চান?

আমি বলতে চাই যে তোমার আচার্য ভারী অস্থিরচিত্ত। আগে তিনি একান্তে থাকতেন, একান্তে বিচরণ করতেন এবং সমস্ত রকম লোক সংঘট্ট হতে দূরে থাকতেন। আর এখন সাধু ও শ্রাবকের মণ্ডলীতে বসে মনোরঞ্জক কথা ও কাহিনী শোনান। আর্দ্রক, এ ভাবে কি তিনি লোকদের খুসী করে নিজের আজীবিকা নির্বাহ করছেন না? এতে যে তাঁর পূর্ব ও বর্তমান জীবনে অসামঞ্জস্য এসে পড়েছে সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি নেই। যদি একান্ত বাসই শ্রমণের ধর্ম হয়, তবে বলতে হয় তিনি শ্রমণ ধর্ম হতে বিমুখ হয়েছেন। আর এই জীবনই যদি শ্রমণ জীবনের আদর্শ হয় তবে তাঁর পূর্ব জীবন যে ব্যর্থ গেছে সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই ভদ্র, যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি তাতে তোমার আচার্যের জীবনচর্যাকে কোনো রকমেই নির্দোষ বলা যায় না।

বর্দ্ধমানের জীবন তখনই যথার্থ ছিল যখন তিনি একান্তবাসী ছিলেন ও যখন আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম। এখন নির্জন বাস হতে বিরক্ত হয়ে তিনি

জীবিকার জন্ম সভায় বসে উপদেশ দেবার পথ খুঁজে নিয়েছেন। তাই বলছিলাম যে তোমার ধর্মাচার্য অব্যবস্থিতচিত্ত।

আর্য, আপনি যা বলছেন তা ঈর্ষ্যাজন্য। বাস্তবে এঁর পূর্বাপর জীবনের রহস্য আপনি বুঝতেই পারেন নি। যদি পারতেন তবে একথা বলতেন না। আপনিই বলুন তাঁর এই দুই জীবনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যখন তিনি ছদ্মস্থ ছিলেন, সাধন নিরত, তখন একান্তবাসীই নয়, মৌনব্রতাবলম্বীও ছিলেন। তা তপস্বীর জীবনের অনুরূপই। এখন ইনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হয়েছেন। এঁর রাগদ্বেষ রূপ বন্ধন সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। এঁর জীবনে আত্ম সাধনার স্থান তাই এখন গ্রহণ করেছে জগতের কল্যাণ; প্রাণীমাত্রের হিতকামী এই মহাপুরুষ তাই এখন জনমণ্ডলীর মধ্যে বসে উপদেশ দেন। কিন্তু তবুও তিনি একান্তবাসী। যিনি বিতরাগী তাঁর পক্ষে সভা ও বন· দুই-ই সমান। যিনি নির্মল আত্মা তাঁকে সভা বা সমূহ কি করে লিপ্ত করবে? তিনি জগৎ কল্যাণের জন্য যে উপদেশ দেন তাও তাঁর বন্ধের কারণ হয় না কারণ তাঁর কোনো বিষয়ে আগ্রহ ও অনাগ্রহ নেই।

তাহলে বিষয় ভোগ ও স্ত্রীসঙ্গাদি করাতেও বা দোষ কী? তাও তাঁর বন্ধ মোক্ষের কারণ হবে না।—বলে একটু হাসলেন গোশালক। বললেন, আমাদের শাস্ত্রে ত একথাই বলে যে একান্তবাসী তপস্বীর কোনো পাপই পাপ নয়।

যারা জেনে শুনে বিষয় ভোগ ও স্ত্রীসঙ্গ করে তারা কখনো সাধু হতে পারে না। তাহলে গৃহস্থদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ কি? তারা সাধু নয় বা ভিক্ষু। তারা কখনো মুক্ত হতে পারে না।

আর্দ্র্ক, তুমি অন্য তীর্থিক সাধুদের নিন্দা করছ। তাদের ভণ্ড তপস্বী ও উদরার্থী বলে অভিহিত করছ।

না। আমি কারু ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দা করতে চাই না। যা সত্য, সেই কথাই বলছি।

আর্দ্র্ক, তোমার ধর্মাচার্যের ভীরুতা বিষয়ে আর একটা গল্প বলি, শোন। আগে তিনি পান্থশালায় ও উদ্যানে অবস্থান করতেন। এখন আর তা করেন না। তিনি জানেন যে সেখানে অনেক জ্ঞানী, কুশল, মেধাবী ও পণ্ডিত

ভিক্ষু এসে থাকেন। এমন না হয়ে যায় যাতে কোনো ভিক্ষু তাঁকে কোনো প্রশ্ন করে বসেন আর তিনি তার উত্তর দিতে না পারেন। তাই তিনি আর সেই সব জায়গায় যান না।

আর্য, এ হতেই বোঝা যায় আপনি আমার ধর্মাচার্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। লোকে তাঁকে মহাবীর বলে। তিনি নামেও যেমন মহাবীর, কাজেও তেমনি মহাবীর। তাঁর মধ্যে কোথাও ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ও স্বতন্ত্র। মংখলি শ্রমণ, শুনুন, যাঁর কাছে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা পরাস্ত হয়েছেন, তিনি কিনা ভয় পাবেন পান্থশালার উদরার্থী ভিক্ষুদের? কখনো না। মহাবীর বর্দ্ধমান এখন সাধারণ ছদ্মস্থ ভিক্ষু নন্ তিনি এখন জগৎ উদ্ধারক তীর্থংকর। ইনি যখন ছদ্মস্থ ছিলেন তখন ইনিও একান্তবাস করেছেন কিন্তু এখন যখন কেবল-জ্ঞান লাভ করেছেন তখন সেই জ্ঞান লোক কল্যাণের ভাবনায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে জনে জনে বিতরণ করছেন। তাই এমন সব জায়গায় অবস্থান করেন যেখানে বহু সংখ্যক লোকের সম্পর্কে আসা সম্ভব হয়। এতে ভয়েরই বা কি আছে? আগ্রহেরই বা কি আছে? তাছাড়া কোথায় যাওয়া, কার সঙ্গে কথা বলা এ সমস্তই তাঁর ইচ্ছাধীন। তবে পান্থশালায় বা উদ্যানগৃহে যে আর যান না তারও একটা কারণ আছে। কারণ সেখানে ত সাধারণতঃ কুতর্কী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই ঘোরা ফেরা করে।

তবেই আদ্রক, শ্রমণ জ্ঞাতপুত্র নিজের স্বার্থের জন্য প্রবৃত্তিমুখী লাভার্থী বণিকের মতো হলেন না কি?

না মংখলীপুত্র, লাভার্থী বণিক পরিগ্রহ করে, জীবহিংসা করে, আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ না করে নূতন নূতন কর্ম প্রবৃত্তিতে আত্ম নিয়োগ করে। এ রকম বিষয়বদ্ধ বণিকের উপমা বর্দ্ধমানের সঙ্গে কিছুতেই দেওয়া যায় না। তাছাড়া আরম্ভ ও পরিগ্রহসেবী বণিকদের প্রবৃত্তিকে যে আপনি লাভজনক বলেছেন তাও ঠিক নয়। সে প্রবৃত্তি লাভের জন্য নয়, দুঃখের জন্য। সেই প্রবৃত্তির জন্যই না মানুষ সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে। তাই তাকে কি আর লাভ দায়ক বলা যায়?

এভাবে আর্দ্রকের কথায় গোশালক নিরুত্তর হয়ে নিজের পথ নিলেন।

তিনি চলে যেতে শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষুরা এগিয়ে এসে বললেন, আর্দ্রক, বণিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে বাহ্য প্রবৃত্তির খণ্ডন করে তুমি ভাল করেছ। আমাদেরও এই মত। বাহ্য প্রবৃত্তি বন্ধ মোক্ষের কারণ নয়। কারণ অন্তরঙ্গ প্রবৃত্তি। আমাদের মতে যদি কোনো লোক খড়ের মানুষকে মানুষ জ্ঞানে শূলে দেয় তবে সে জীবহত্যার দোষে দোষী হয় আর যদি মানুষকে খড়ের পুতুল জ্ঞানে শূলে দেয় তবে তার কোনো পাপই হবে না। এরকম মানুষের মাংস বুদ্ধও ভোজন করতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে নিত্য যে দু'হাজার বোধিসত্ব ভিক্ষুকে খাওয়ায় সে মহান পুণ্য স্কন্দের অর্জন করে মহাসত্বশালী আরোগ্যদেব হয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

আর্দ্রক বললেন, হিংসা জন্ম কার্যকে নির্দোষ বলা সংযতের পক্ষে অযোগ্য। যাঁরা এ ধরণের উপদেশ দেন বা যাঁরা এ ধরণের উপদেশ শোনেন তাঁরা অনুচিত কাজ করেন। খড়ের ও সত্যিকার মানুষের যার জ্ঞান নেই তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ও অনার্য তা নইলে কি করে তিনি খড়ের মানুষকে মানুষ ও মানুষকে খড়ের মানুষ বলে মনে করছেন। ভিক্ষুর ত এ ধরণের স্থূল মিথ্যা কখনো বলা উচিত নয়, যাতে কর্ম বন্ধ হয়। শুনুন, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা কেউ কখনো তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেনি, না জীবের শুভাশুভ কর্ম বিপাকের জ্ঞান। তাই যারা এই সিদ্ধান্তের অনুবর্তী তারা এই লোক করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ নয়, না পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত নিজের যশঃ বিস্তারিত করতে। ভিক্ষুগণ, যে শ্রমণ জীবের কর্ম বিপাকের কথা চিন্তা করে আহার দোষ পরিহার করেন ও অকপট বাক্যের প্রয়োগ করেন তিনিই সংযত।

যাদের হাত রক্তরঞ্জিত এ ধরণের অসংযত মানুষ দু' হাজার বোধিসত্ব ভিক্ষুদের নিত্যভোজন করালেও এখানে নিন্দাপাত্রই হন ও পরলোকে দুর্গতিগামী। যাঁরা বলেন প্রাণী হত্যা করে আমাকে যদি কেউ মাংস ভক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ করেন তবে সে মাংস গ্রহণে পাপ নেই তাঁরা অনার্যধর্মী ও রসলোলুপ। এরূপ মাংস যিনি গ্রহণ করেন, পাপ কি না জানলেও, পাপেরই আচরণ করেন। যিনি সত্যিকার ভিক্ষু তিনি মনেও এ ধরণের আহার ইচ্ছা করেন না, এরূপ মিথ্যা কথা বলেন না।

জ্ঞাতপুত্রীয় শ্রমণেরা এজন্য তাঁদের জন্য উদ্দীষ্ট আহার্য গ্রহণ করেন না কারণ তাঁরা সমস্ত রকম হিংসা পরিত্যাগ করেছেন। তাই যে আহারে সামান্যতম প্রাণী হিংসারও সংভাবনা থাকে তাঁরা সে আহার গ্রহণ করেন না। সংসারে সংযতদের ধর্ম এই প্রকার। এই আহারশুদ্ধিরূপ সমাধি ও শীলপ্রাপ্ত হয়ে বৈরাগ্যভাবে যিনি নিগ্রন্থ ধর্মের আচরণ করেন তিনি কীর্তি লাভ করেন।

শাক্য ভিক্ষুকের নিরুত্তর হতে দেখে স্নাতক ব্রাহ্মণেরা এগিয়ে এলেন। বললেন, আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে যে, যে রোজ দু'হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করায় সে মহাপুণ্য অর্জন করে' দেবগতি লাভ করে।

আর্দ্রক বললেন, গৃহস্থালীতে আসক্ত দু'হাজার স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সে নরক গতিই উপার্জন করে। দয়াধর্মের নিন্দাকারী ও হিংসাধর্মের প্রশংসক ও দুঃশীল মানুষকে যে ভোজন করায় সে রাজা হলেই বা কি অধোগতিই প্রাপ্ত হয়।

তাছাড়া সেতো সত্যি ব্রাহ্মণ নয়। সেই সত্যিকার ব্রাহ্মণ যার প্রাপ্তিতে আনন্দ নেই, বিয়োগে দুঃখ বা শোক।

যে দহনোত্তীর্ণ সোনার মতো নির্মল, রাগ, দ্বেষ ও ভয় রহিত, সেই ব্রাহ্মণ।

শির মুণ্ডন করালেই যেমন শ্রমণ হয় না, তেমনি 'ওম্' উচ্চারণ করলেই ব্রাহ্মণ। সমতায় শ্রমণ হয়, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ।

কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয়।

আর্দ্রকের স্পষ্টোক্তিতে স্নাতক ব্রাহ্মণেরা উদাসীন হলে সাংখ্যমতানুযায়ী সন্ন্যাসীরা এগিয়ে এলেন। বললেন, তোমার এবং আমাদের ধর্মে পার্থক্য খুব কমই। আমাদের দুই মতই আচার, শীল ও জ্ঞানকেই মোক্ষের অঙ্গ বলে মনে করে। সংসার বিষয়েও আমাদের মতের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সাংখ্য দর্শনের মতে পুরুষ অব্যক্ত, মহান ও সনাতন। তার হ্রাস হয় না, না ক্ষয়। তারাগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র তেমনি সমস্ত ভূতগণের মধ্যে সেই আত্মা একই।

আর্দ্রক বললেন, আপনাদের সিদ্ধান্তানুসারে না কারু মৃত্যু হয়, না প্রধানের সংসার ভ্রমণ। একই আত্মা স্বীকার করে নিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ

বিভেদ যেমন থাকে না তেমনি পশু পাখী কীট পতঙ্গের বিভেদও। যাঁরা লোকস্থিতি না জেনে ধর্মের উপদেশ দেন তাঁরা নিজেরাও বিনষ্ট হন ও অন্যকেও নষ্ট করেন। কেবল-জ্ঞান লাভ করে সমাধিপূর্বক যিনি ধর্ম ও সম্যকত্বের উপদেশ দেন তিনি নিজের ও অন্যের আত্মাকে সংসার সাগর হতে উত্তীর্ণ করেন।

এভাবে একদণ্ডীদের নিরুত্তর করে আর্দ্রক যেই আগে বেরিয়ে যাবেন ওমনি হস্তিতাপস ঋষিরা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, আমরা সমস্ত বছরে একটা মাত্র হাতী হত্যা করি এবং তারি মাংসে সমস্ত বছর জীবন ধারণ করি। এতে অন্য অনেক প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়।

আর্দ্রক বললেন, সমস্ত বছরে একটী প্রাণী হত্যা করলেও আমি তাঁদের অহিংসক বলতে পারি না। কারণ প্রাণী হত্যা হতে আপনারা সর্বদা বিরত হননি। আপনারা যদি অহিংসক হন, তবে সংসারী জীবেরাও অহিংসক নয় কেন? কারণ তাঁরাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীব হত্যা করেন না। যাঁরা তাপস হয়ে যদিও সমস্ত বছরে একটী মাত্র জীব হত্যা করেন তবুও তাঁরা আত্ম কল্যাণ করেন না বরং নিরয়গামী হন। যিনি ধর্ম সমাধিতে স্থির, কায়মনোবাক্যে যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই যেন সংসার সমুদ্র অতিক্রম করে ধর্মের উপদেশ দেন।

হস্তিতাপসদের নিরুত্তর করে আর্দ্রক যেমন অগ্রসর হয়েছেন ওমনি হস্তিতাপসদের বন হতে সদ্য ধরে আনা হাতী শেঁকল ছিঁড়ে তাঁর দিকে ছুটে এল। লোকের মধ্যে কোলাহল উঠল। আর কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর সেই বুনো হাতী আর্দ্রক মুনিকে হয় শুঁড়ে করে জড়িয়ে দূরে ফেলে দেবে, নয়ত পিঁপড়ের মতো পায়ের তলায় পিসে মারবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! হাতী তার কিছুই করল না। আর্দ্রকের কাছে এসে বিনীত শিষ্যের মতো মাথা নীচু করে তাঁর পায়ে প্রণাম করল। তারপর অরণ্যের দিকে ছুটে গেল।

মুহূর্তে সেকথা সবখানে ছড়িয়ে পড়ল। আর্দ্রক বুনো হাতীকে বশ করেছেন। আশ্চর্য তাঁর লব্ধি! আশ্চর্য তাঁর সিদ্ধি! মহারাজ শ্রেণিকেরো সেকথা কানে উঠল। তিনি আর্দ্রককে দেখতে এলেন। কথায় কথায়

জিজ্ঞাসা করলেন হাতী কেন শেঁকল ছিড়ে তাঁকে প্রণাম করে অরণ্যের গভীরতায় চলে গেল।

শুনে আর্দ্রক বললেন মহারাজ, লোহার শেঁকল ভাঙা এমন কি আর শক্ত —যত শক্ত কাঁচা সুতোর বাঁধন ছেঁড়া। আমাকে সেই কাঁচা সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে সে তার লোহার শেঁকল ভেঙে আমায় প্রণাম করে অরণ্যের অবাধ জীবনে ফিরে গেল।

শ্রেণিক আর্দ্রকের কথার তাৎপর্য ঠিক ধরতে পারলেন না। তাই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আর্দ্রক বললেন, মহারাজ, সে অনেক কাল আগের কথা। আমি অনার্য রাজপুত্র। আপনার পুত্র অভয়কুমার ঋষভদেবের একটী ছোট্ট সোনার প্রতিমা আমায় উপহার পাঠান। সেই প্রতিমা দেখতে দেখতে আমার পূর্ব জন্মের স্মৃতি মনে পড়ে যায় ও শ্রমণ দীক্ষা নেবার জন্য আমি ভারতবর্ষে আসি। এখানে এসে আমি শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করি ও নানা স্থান প্রব্রজন করতে থাকি। এমনি প্রব্রজন করতে করতে একবার আমি বসন্তপুরে আসি। বসন্তপুরে এসে আমি যখন নগর উদ্যানে বসে ধ্যান করছি তখন সেখানে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে শ্রেষ্ঠীর মেয়ে খেলা করতে এল। খেলা ছলেই সে সেদিন আমায় বরণ করল। তারপর ঘরে চলে গেল।

তারপর অনেককাল পরের কথা। মেয়েটী যখন বড় হল শ্রেষ্ঠী যখন তার বিবাহের উদ্যোগ করলেন, মেয়েটী তখন তার বাবাকে গিয়ে বলল, যে তার আর বিয়ে হতে পারে না কারণ সে একজন শ্রমণকে বরণ করেছে।

শ্রেষ্ঠী সমস্ত শুনে মেয়েকে অনেক বোঝালেন। বললেন, সে ত খেলা ছলে।

কিন্তু মেয়ের সেই এক কথা, সেই শ্রমণকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করবো না।

শ্রেষ্ঠী তখন বিপদে পড়লেন। প্রথমতঃ আমাকে কেউ চেনে না, কোথায় থাকি তাও জানে না। তার ওপর তাঁর মেয়েকে যে আমি গ্রহণ করব তারি বা নিশ্চয়তা কী?

মেয়ে বলল, বাবা, তুমি আমায় অতিথিশালা তৈরী করিয়ে দাও। অতিথি শালায় সাধু শ্রমণ আসবেন। হয়ত তিনিও কোনো দিন আসতে

পারেন। তাঁর মুখ আমি দেখিনি কিন্তু তাঁর পা আমি দেখেছি। তাঁর পায়ে পদ্ম চিহ্ন ছিল। সেই চিহ্ন দেখে আমি তাঁকে চিনতে পারব।

শ্রেষ্ঠীর অন্য উপায়ান্তর ছিল না। তাই মেয়ের কথা মতো অতিথিশালা নির্মাণ করিয়ে দিলেন। মেয়েটী সেখানে যে সাধু শ্রমণ আসে তাঁদের পা ধুইয়ে দেয়।

মহারাজ, একদিন সেই অতিথিশালায় আমিও এলাম।

মেয়েটী পা ধোয়াতে গিয়ে আমার পায়ে পদ্ম চিহ্ন দেখে আমায় চিনতে পারল। আমি ধরা পড়ে গেলাম।

এই মেয়েটীর কথা আমার মনে ছিল না কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেল। সে জন্মে সে আমার স্ত্রী ছিল। স্ত্রী কিন্তু তার সঙ্গে আমার মিলনের পথ ছিল না। আমি শ্রমণ ছিলাম। কিন্তু শ্রমণ জীবনেও তার প্রতি আসক্তি আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি। দেখলাম তার প্রেমের চাইতেও সেই আসক্তিই আমাকে তার দিকে দুর্নিবার বেগে টানতে লাগল।

মহারাজ, তাই শ্রমণ ধর্ম এবারে পরিত্যাগ করে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম। সংসারী হলাম। দীর্ঘ বারো বছর তার সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করলাম। তারপর যখন বাসনা উপশান্ত হল তখন আবার সংসার পরিত্যাগের কথা ভাবতে লাগলাম।

আমার স্ত্রী আমার মনের কথা জানতে পেরে আমার সামনে সুতো কাটতে বসল। তাই দেখে আমার ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, মা তুমি এ কি করছ? সে প্রত্যুত্তর দিল, বাবা, তোমার বাবা সংসার পরিত্যাগ করবেন—তাই সংসার চালাবার জন্য সুতো কাটছি।

সে কথা শুনে আমার ছেলে সেই কাটা সুতো নিয়ে আমার বারো পাকে জড়িয়ে বলল, দেখি এবার তুমি কি করে যাও?

তার দুষ্টু হাসি, তার কচি হাতের স্পর্শ আমায় আবার মোহগ্রস্ত করে দিল। আমি সংসার পরিত্যাগ করতে পারলাম না।

মহারাজ, তাই বলছিলাম লোহার শেঁকল ভাঙা এমন কি আর শক্ত, যত শক্ত কাঁচা সুতোর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা। আমাকে সেই বাঁধন

ছিঁড়ে আসতে দেখে বুনো হাতিটি তার লোহার শেঁকল ভেঙে অরণ্যের অসীম মুক্তিতে ফিরে গেল।

সেকথা শুনে শ্রেণিক আর্দ্রককে প্রণাম করে বললেন, আপনি ধন্য, আপনি কৃতকৃত্য।

আর্দ্রক তখন গেলেন বর্দ্ধমানের কাছে।

বর্দ্ধমান সেই চাতুর্মাস্য রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। তারপর সেখান হতে গেলেন কৌশাম্বী।

[ক্রমশঃ

শ্রাবকাচার

শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ত্যাগ প্রধান সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিতে সৎ আচরণ ও আধ্যাত্মিক বিচারের প্রমুখতা দেখা যায়। সেখানে যেমন সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তায় সৌম্য ও শুচি আদর্শ রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুরাগ্রহ ও দুষ্প্রবৃত্তি নিরাকরণের সহজ প্রেরণা। এই সংস্কৃতি কোন এক ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের অবদান নয়, তা বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির অবদান। যদিও সেই সভ্যতা ও কৃষ্টি নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, তবুও মূলতঃ তারা এক যার তলবীথি ত্যাগময় জীবন। ভারতবাসীরাও বাসনার বশীভূত হয়ে লক্ষ্মীর উপাসনা করেছে তবু এই এক কারণেই তারা মাথা নত করে এসেছে চিরকাল কামিনী কাঞ্চন পরিত্যাগী ত্যাগব্রতীর পায়ে। এই ত্যাগ প্রধান ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বিকাশে জৈন অবদানেরও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। জৈনাচার্যেরা নিজেদের সার্বিক ত্যাগময় ও সংযম প্রধান জীবন, সিদ্ধান্ত ও বিবেকপূর্ণ উপদেশের অনুদানে তাকে প্রভূত ভাবে সুসজ্জিত করেছেন। সেই অনুদান অপূর্ব, অনন্ত ও বিশ্বকল্যাণের ভাবনায় ওতঃপ্রোত। এ অহিংসার সেই প্রোজ্জ্বল দীপশিখা যা হিংসার প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেও নির্বাপিত না হয়ে আজ অবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে।

জৈনধর্ম বিনয় ও সাম্যের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়; প্রায়শ্চিত্ত, বিনয় ও সেবাধর্মকে (বৈয়াবৃত্য) তপস্যার আভ্যন্তরীণ অঙ্গ বলে প্ররূপিত করে। প্রায়শ্চিত্তে অহংভাব বিনষ্ট হয়, বিনয়ে বিবেক জাগ্রত। বিনয়ী ব্যক্তিই সমস্ত গুণের পাত্র হতে পারে। সর্বোপরি অহিংসা। অহিংসা জৈন সংস্কৃতির আত্মা, দর্শনের সার ও সার্বভৌম শান্তির প্রবাহ। মানুষে ও দানবে অহিংসা ও হিংসারইত পার্থক্য! বর্তমানের অনৈতিকতার বেড়াজালে, হিংসার বিরোধী আবহাওয়ায় জৈনদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা যে কম দেখা যায় তার কারণ এই অহিংসার প্রভাব। জৈনরা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে আজো স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত।

ভগবান মহাবীর যখন ধর্মতীর্থ প্রবর্তনে প্রয়াসী হন তখন তাকে চিরস্থায়ী ও ব্যাপক রূপ দেবার জন্য সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সংঘ চার ভাগে বিভক্ত। যথা: (১) সাধু, (২) সাধ্বী, (৩) শ্রাবক ও (৪) শ্রাবিকা। নিঃসন্দেহে সংঘের এই চার ভাগই মুমুক্ষু, আত্মপথের পথিক, সংযম সাধনায় নিরত তবুও তাদের পরিস্থিতিতে অনেক পার্থক্য। গৃহে বাস করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উত্তরদায়িত্ব পালন করে মুক্তির সাধনা শ্রাবক ধর্ম এবং সমস্ত রকম লৌকিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আত্ম-সাধনায় লীন হওয়াই সাধুধর্ম। অন্যভাবে অহিংসাদি ব্রত যাঁরা পূর্ণরূপে পালন করেন তাঁরা সাধু ও যাঁরা আংশিকরূপে পালন করেন তাঁরা শ্রাবক। জীবনকে সমুন্নত করবার জন্য অন্ধকার হতে প্রকাশের দিকে পরিচালিত করবার জন্য যে সমস্ত নিয়ম, মর্যাদাদির প্রণয়ন করা হয় তাদের ব্রত বলা হয়। যে ভাবে কলকলনাদিনী নদীর প্রবাহকে গতিশীল ও মর্যাদিত রাখবার জন্য দুইটী তটের বন্ধনের প্রয়োজন আছে, তেমনি বাসনার উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য, মর্যাদিত রাখবার জন্য ব্রতেরও প্রয়োজন আছে। অব্রতীজীবন বল্গাহীন অশ্বের মতো লক্ষ্যহীন ও স্ব-পরের অহিতকারক বলেই সিদ্ধ হয়। তাই তীর্থংকরেরা জীবনশক্তিকে কেন্দ্রিত করবার জন্য ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তার নিয়োগের জন্য ব্রতের প্রবর্তন করেছেন। যে ক্রিয়া আত্ম বিকাশকে লক্ষ্য করে করা হয় তাই অধ্যাত্ম। ব্রত এবং সঙ্কল্প সেই অধ্যাত্ম বিকাশেরই অভিপ্সিত অঙ্গ। তাই গৃহীর জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী ব্রতের নিরূপণ করা হয়েছে:

১। স্থূল প্রাণাতিপাত বিরমণ

২। স্থূল মৃষাবাদ বিরমণ।

৩। স্থূল অদত্তাদান বিরমণ।

৪। স্থূল মৈথুন বিরমণ।

৫। পরিগ্রহ পরিমাণ।

৬। দিগ্‌ব্রত।

৭। ভোগোপভোগ পরিমাণ

৮। অনর্থ দণ্ড বিরমণ।

৯। সামায়িক ব্রত।

১০। দেশাবকাশিক ব্রত।

১১। পৌষধ ব্রত।

১২। অতিথি সংবিভাগ ব্রত।

এর মধ্যে প্রথম পাঁচটী আংশিক হবার জন্য অণুব্রত। আংশিক বলেই তাদের আগে স্থূল শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

১। প্রাণাতিপাত বিরমণ—অহিংসাণুব্রত প্রাণাতিপাত বিরমণের অর্থ হল জীবের প্রাণ সংহার করা হতে বিরত থাকা। সংসারের সমস্ত জীব ত্রস ও স্থাবর ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত। মুনি দুই প্রকার জীবেরই হিংসা পূর্ণরূপে (সূক্ষ্মরূপে) পরিত্যাগ করেন। কিন্তু গৃহীর পক্ষে সেরকম সম্ভব নয়, তাই তাদের জন্য স্থূল হিংসা পরিত্যাগের বিধান। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, বনস্পতি রূপ স্থাবর জীব স্বভাবতঃই ভোগোপভোগ রূপ। এদের ভোগোপভোগ সর্বদাই অপেক্ষিত। তাই গৃহীর অহিংসাব্রতে এদের হত্যা না করার সমাবেশ না করে স্থূল (অর্থাৎ দ্বিন্দ্রীয়াদি হতে) জীবের হত্যা না করার নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সঙ্কল্প করে নিরপরাধ জীবের হত্যাই গৃহীর পরিত্যাজ্য।

জৈন শাস্ত্রে হিংসা চার প্রকার : (১) আরম্ভী, (২) উদ্যোগী, (৩) বিরোধী ও (৪) সংকল্পী।

(১) আরম্ভী হিংসা—জীবন নির্বাহের জন্য, খাদ্যাদি সংগ্রহের জন্য, পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে হিংসা অনিবার্যরূপে হয়ে থাকে তাই আরম্ভী হিংসা।

(২) উদ্যোগী হিংসা—জীবিকার জন্য গৃহীকে কৃষি, গোপালন, বাণিজ্যাদি শিল্প কাজে প্রবৃত্ত হতে হয়। ঐ সমস্ত কাজে অহিংসার ভাবনা ও সাবধানতা সত্বেও হিংসা হয়ে থাকে। সেই হিংসাকে উদ্যোগী হিংসা বলা হয়।

(৩) বিরোধী হিংসা—নিজের প্রাণ, কুটুম্ব পরিবারের প্রাণ ও দেশকে আক্রমণ কারীদের হাত হতে রক্ষার জন্য যে হিংসা করা হয় তা বিরোধী হিংসা। যদিও এতে বিরোধীর বধের সঙ্কল্প করা হয় তবু তা সকারণ ও ন্যায়োচিত হবার জন্য তাকে সংকল্পী হিংসার অন্তর্গত করা হয় না।

(৪) সঙ্কল্পী হিংসা—জ্ঞানতঃ কোনো নিরপরাধ প্রাণীর হত্যা করার যে ভাবনা তাই সঙ্কল্পী হিংসা।

গৃহী সংকল্পী হিংসা পরিত্যাগ করবে। সে নিজে হিংসা করবে না, অন্যকে দিয়ে করাবে না বা অন্যে করলে তার অনুমোদন করবে না। কারণ হিংসা কেবল ক্রিয়ার ওপরই নির্ভরশীল নয়, বিচার ও অধ্যবসায়ের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কখনো কখনো যে হিংসা করে তার চাইতে যে করায় তার অধ্যবসায় তীব্র হয় আবার কখনো কখনো যে অনুমোদন করে তার মনের অধ্যবসায় যে করায় তার চাইতে বেশী তীব্র হয়। কার অধ্যবসায় বেশী তীব্র তা অপূর্ণ মানুষ জানতে পারে না। কিন্তু কর্মের বন্ধন যেমন অধ্যবসায় সেই রূপই হয়ে থাকে। তাই করা, করান এবং অনুমোদন করা এই তিনেরই পরিত্যাগ অবশ্যক।

মন, বচন, কায়া, পাঁচ ইন্দ্রিয়, আয়ু ও শ্বাসোচ্ছাস এই দশটী প্রাণ। এদের যে কোন একটীকেই বিদ্বেষ বা দুর্বুদ্ধির বশীভূত হয়ে আঘাত করাই হিংসা।

বিশ্বে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে জীব নেই। এজন্য প্রবৃত্তি মাত্রেই হিংসা না হয়ে যায় না। তবুও সাবধান হয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায়, মনে হিংসা ভাবনা না রাখায়, হিংসা হওয়া সত্ত্বেও হিংসা হতে সে মুক্ত থাকে। আবার কেবল মাত্রই নিবৃত্ত হয়ে থাকলেই যে অহিংসা সিদ্ধ হয় তাও নয়। কারণ শারীরিক স্থিরতার সময় যদি মনের অধ্যবসায় হিংসাত্মক হয় তবে ভাবনাত্মক সেই হিংসার জন্য মানুষ ঘোর নরকগামীও হতে পারে।

সংক্ষেপে তাই আমরা একথা বলতে পারি যে জ্ঞানতঃ কোনো প্রাণীকে হত্যা করা হিংসা ত বটেই, কোনো প্রাণীকে বিদ্বেষবশতঃ আঘাত দেওয়াও হিংসা। শুধু তাই নয় কোনো প্রাণীর হত্যা বা আঘাত দেবার ইচ্ছাও হিংসা।

২। স্থূল মৃষাবাদ বিরমণ—সত্যাণুব্রতে স্থূল মিথ্যা বলার সর্বদা পরিত্যাগ ও সূক্ষ্ম মিথ্যা বলা বিষয়ে সাবধান থাকা অপেক্ষিত। এটি দ্বিতীয় ব্রত। যদিও স্থূল ও সূক্ষ্ম মিথ্যার নির্ণয়ের নিশ্চিত কোনো সীমারেখা নেই তবু যাকে লোকে অসত্য বলে মনে করে, যা লোক নিন্দনীয় ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় তা স্থূল মিথ্যা।

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, মিথ্যা দলীল তৈরী করা, সত্য মিথ্যা বলে কাউকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া, আত্ম প্রশংসা, পরনিন্দা, প্রলোভন জন্য মিথ্যা প্রচার, অথবা ব্রত ও ক্রিয়াকে দূষিত করা ইত্যাদি সমস্তই স্থূল মিথ্যার অন্তর্গত। যে বস্তু ঠিক যেমন সেই রকম বলাকে সামান্যতঃ সত্য বলে বলা হয় এবং বাস্তব দৃষ্টিতে তা সত্যও কিন্তু ধার্মিক দৃষ্টিতে তা সত্য হতেও পারে নাও পারে। যদি সেই বাক্য যথার্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণকারী হয়, অন্ততঃ অকল্যাণকারী না হয় তবে তা নিঃসন্দেহে সত্য কিন্তু অকল্যাণকারী বাক্য প্রিয় ও সত্য হওয়া সত্বেও অসত্য। তাই সত্য বলার জন্য বিবেককে জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজন।

৩। স্থূল অদত্তাদান বিরমণ (অচৌর্য অণুব্রত)—কায়মন বাক্যে কারু সম্পত্তি আদেশ ব্যতিরেকে না নেওয়া অচৌর্য বা স্থূল অদত্তাদান বিরমণ ব্রত। যে চুরীকে লোকে চুরী বলে, যার জন্যে ন্যায়ালয়ে দণ্ডিত হতে হয় তাই স্থূল চুরী। যেমন: সিঁধকাটা, পকেটমারী, ডাকাতি, কারু ধন লুট করা, অন্যের লেখা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া, অন্যের টাকায় ভালো কাজ করে নিজের নাম কেনা, শিশু ও স্ত্রী অপহরণ করা, ইত্যাদি। চুরীর জিনিষ নেওয়া বাস্তবে চুরীই। কাউকে চুরী করতে প্রবৃত্ত করা, চুরী হতে দেখেও গৃহস্বামীকে বা রাজদ্বারে খবর না দেওয়া, উচিত পরিমাণের চাইতে কম বা বেশী ওজন দেওয়া, রাষ্ট্র বিরুদ্ধ কার্য করা অর্থাৎ কর না দেওয়া ও অন্যায়ের দ্বারা নীতি বিরুদ্ধ বস্তু সংগ্রহও চুরী।

৪। স্থূল মৈথুন বিরমণ (ব্রহ্মচর্যাণুব্রত)—ভোগ এমন একটি ব্যাধি যার প্রতিকার ভোগের দ্বারা হয় না। মানুষ যত ভোগ করে ততই সে অতৃপ্ত হতে থাকে ও তার ভোগ তৃষ্ণা আরো বাড়তে থাকে। তাই মানসিক, শারীরিক ও আত্মশক্তির রক্ষার জন্য সম্ভোগ হতে সর্বথা বিরত থাকাই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য। বিবাহ করে স্বপত্নীতে ভোগ সীমিত রাখা স্থূল ব্রহ্মচর্য। স্বপত্নীতেও অত্যধিক আসক্তি পরিত্যজ্য। অশ্লীল সাহিত্য পড়ায়, সিনেমা থিয়েটারে দত্তচিত্ত হওয়ায়, অভিনেতা অভিনেত্রীদের রূপ চর্চায় কাম বাসনাকেই উদ্দীপ্ত করা হয়। এর বিপরীত যারা সৎকাজে, সৎবিচারে এবং সৎ ভাবনায় মনকে নিযুক্ত রাখে, তাদের মন বিষয় সেবনে আসক্ত

হয় না। কোনো বস্তুকে নিরুদ্ধ করার চাইতে তাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

৫। পরিগ্রহ পরিমাণ—ইচ্ছা মানুষের অপরিমিত। তাই তাকে সীমিত করাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য। মানুষ যেমন যেমন ধনী হতে থাকে অধিক ধন সংগ্রহের কামনাও তত সুরসার মুখের মতো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। সোনা, রূপো, মাটি, বিষয়, ধন-ধান্য, পশু-পক্ষী আদি বাহ্য বস্তুর অধিক সংগ্রহ দ্রব্য-পরিগ্রহ ও তাতে আসক্তি ভাব-পরিগ্রহ। দ্রব্য-পরিগ্রহের চাইতে ভাব-পরিগ্রহ আরো বেশী ক্ষতিকর। এই ভাব-পরিগ্রহকে সীমিত করার জন্যই দ্রব্য পরিগ্রহকে সীমিত করা প্রয়োজন। পরিগ্রহ হতে মমত্ব বুদ্ধি সরিয়ে নিলেই মানুষের লোভও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

আজ যে সমস্ত জটিল সমস্যা বিশ্বের সামনে উপস্থিত, সংঘর্ষের যে দাবাগ্নি চারদিকে প্রজ্বলিত, তার মূলে রয়েছে ধন সঞ্চয়ের এই লোভ প্রবৃত্তি। তাই পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রতকে যদি সুচারু রূপে পালন করা হয় তবে পুঁজীবাদ ও সমাজবাদের বিবাদ আপনা আপনিই শান্ত হয়ে যায়। সমাজ ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থিত করবার জন্য তাই এই ব্রতের একান্ত প্রয়োজন।

ব্রতের উপযোগিতা বুঝতে পেরে ব্রতী হয়ে মানুষ যখন স্বেচ্ছায় স্বোপার্জিত ধন সম্পত্তির পরিত্যাগ করে তাতে সে এক অলৌকিক আনন্দও অনুভব করে। সে জানে লোকহিতকর কাজে অর্থ ব্যয়ে সে যেমন ইহ জীবনে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করবে তেমনি পরলোকে অনন্ত সুখ। সে বিষয়েও সে সতর্ক থাকে যাতে তার প্রদত্ত অর্থের অসৎ ব্যবহার না হয়। কারণ সে সেই সময় যদিও সেই অর্থের মালিক থাকে না তবু তার রক্ষক (ট্রাষ্টী) অবশ্যই থাকে। তাছাড়া পরিগ্রহের ভূত মাথা হতে নামতেই মানুষ স্বতঃই সৎকার্যের জন্য উন্মুখ হয়। তাই মানুষ যদি এই ব্রতকে যথার্থতঃ জীবনে রূপায়িত করতে পারে তবে পৃথিবী, পৃথিবী আর থাকে না, স্বর্গে পরিণত হয়।

৬। দিগ্‌ব্রত—মানুষের আকাঙ্ক্ষা আকাশের মতোই নিঃসীম। সমস্ত বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সে সর্বদাই লোলুপ। অর্থগৃধ্নু তার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করে। এই বৃত্তিকে সীমিত

করবার জন্যই নানা দিকে যাতায়াতকে এই ব্রতে নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। এতে অনেক ঝঞ্ঝাট যেমন কম হয়ে যায় তেমনি এক ধরণের মানসিক শান্তি-ও সে লাভ করে।

৭। ভোগোপভোগ পরিমাণ—আহারাদির মতো একবার যা ব্যবহার করা যায় তা ভোগ্য ও বস্ত্রাদির মতো যা একাধিকবার ব্যবহার করা যায় তা উপভোগ্য। বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ না করার জন্য যেমন একদিকে ঐশ্বর্যের স্তূপ জমে ওঠে তেমনি অন্যদিকে দারিদ্র্যের সাম্রাজ্য। ভোগোপভোগে সমতা ও সংযম ভাবই এই বৈষম্য দূর করতে সমর্থ। এই ব্রতের উদ্দেশ্য অধিকাধিক ভোগোপভোগ্য বিষয় হতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা।

৮। অনর্থদণ্ড বিরমণ—অনর্থের অর্থ হল নিরর্থক ও দণ্ডের অর্থ পাপাচরণ। বিবেকহীন মনোবৃত্তির জন্য মানুষ বৃথাই পাপাচরণ করে। গৃহী জীবনে আরম্ভী, উদ্যোগী এবং বিরোধী হিংসাত ন্যূনধিক পরিমাণে রয়েছেই তার ওপর মানুষ প্রমাদ জন্য লাগানো, নিন্দা, বিকথা এবং অন্য পাপজনক কাজের উপদেশ দিয়ে অযথা অনর্থদণ্ডরূপ পাপ অর্জন করে। এই ব্রতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) হিংসোপকরণ দেওয়া—হিংসার সাধন ছোরা, ছুরি, তলবার, বম-আদি তৈরী করে কাউকে হত্যার জন্য দেওয়া।

(খ) দুর্ধ্যান—প্রিয় বস্তুর বিয়োগে ও অপ্রিয়বস্তুর সংযোগে আর্তধ্যানে নিরত হওয়া, অন্যের মন্দ চিন্তা করা, ইত্যাদি।

(গ) প্রমাদচর্যা—প্রমাদাচরণের আসক্তি পরিত্যাগ এই ব্রতের অন্তর্গত। যেমন, অযথা মাটি খোঁড়া বা খোঁড়ান, আগুন জ্বালা, কুলের গর্ব করা, বিকথা, নিন্দা, মোহ বর্দ্ধক ক্রীড়া-কৌতুক করা ও দেখা, ইত্যাদি।

(ঘ) পাপোপদেশ—পাপজনক কাজের উপদেশ দেওয়া, নিজের কুব্যসনে অন্যকে লিপ্ত করা, পাপারম্ভের প্রবৃত্তিতে অকারণ কুশলতা দেখানো, ইত্যাদি।

৯। সামায়িক ব্রত—রাগদ্বেষ হতে বিরত হয়ে সমভাবে আসার নামই সামায়িক। এই ব্রতের আরাধনার সময় কমপক্ষে ৪৮ মিনিট। এই সময় সমস্ত রকম পাপ কার্য হতে বিরত হয়ে কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি পরিত্যাগ করে আত্মধ্যানে লীন হতে হয়।

১০। দেশাবকাশিক ব্রত—ষষ্ঠ ব্রতে গৃহীত দিগ্ব্রতের নিয়মকে এক-দিনের জন্য বা অধিক দিনের জন্ম আরো সঙ্কুচিত করা, অন্য ব্রতের ছুটকে আরো সীমিত করা ও সমস্ত রকম পাপের পরিত্যাগ এই ব্রতের অন্তর্গত। সংক্ষেপে বিরতির অভিবৃদ্ধিই এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১১। পৌষধ ব্রত—ধর্মের পোষণ করে বলে এই ব্রতকে পৌষধ ব্রত বলা হয়। উপবাস বা একাহার করে চার বা আঠ প্রহর সাধুর মতো ধ্যান, স্বধ্যায়, তত্ত্ব চিন্তা ও আত্মস্বরূপে রমণ করাই পৌষধ ব্রত।

১২। অতিথি সংবিভাগ—যাঁর আসার সময় নির্দিষ্ট নেই তিনিই অতিথি। শ্রমণ বা সাধু সূচনা না দিয়েই এসে থাকেন। তাই তাঁদের ভিক্ষা দেওয়া অতিথি সংবিভাগব্রত। যাঁরা লোক সেবক ও সজ্জন, তাঁদের প্রয়োজন মেটানোও এই ব্রতের অন্তর্গত। সংগ্রহ প্রবৃত্তি কম করার ও ত্যাগের ভাবনা বৃদ্ধি করার জন্যই এই ব্রতের ব্যবস্থা।

এই বারো ব্রতের প্রথম পাঁচটী অণুব্রত কারণ সাধুদের জন্য নিরূপিত মহাব্রতের তুলনায় তা সহজ। তারপরের তিনটী ব্রত অণুব্রতের গুণরূপ হওয়ায় গুণব্রত। অবশিষ্ট চারটী শিক্ষাব্রত। শ্রমণের মতো জীবন যাপনে মানুষকে যা অভ্যস্ত করে তাই শিক্ষাব্রত।

উপরোক্ত এই আলোচনা হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধার্মিক উন্নতির জন্য আমাদের এই ব্রত গ্রহণ একান্তই আবশ্যক। কাউকে দুঃখ দিও না, কাউকে হত্যা কোরো না'র যে মহতী বাণী এই ব্রতের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে তাতে একথা সুস্পষ্ট যে যতক্ষণ না আমরা নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে অন্যকে সুখী করবার চেষ্টা করি, অন্যের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করি ততক্ষণ আমরা নিজেরাও সত্যিকার সুখী হতে পারি না। ধন সঞ্চয় করে ধনবান হওয়া এক আর সুখ ও শান্তি পূর্ণ জীবন যাপন করে অক্ষয় আনন্দের অধিকারী হওয়া সম্পূর্ণ আর। আজকের যান্ত্রিক যুগের মানুষ বহুকর্মব্যস্ত থাকায় ধর্মাচরণের তার কাছে সময় নেই বলে ধর্মকে উপেক্ষা করছে। এবং সম্ভবতঃ জপ তপ ধ্যান ধারণার মতো সময় হয়ত তার নেইও। কিন্তু ব্রতের সম্বন্ধে বোধহয় সে কথা বলা যায় না। ব্রতের সম্বন্ধ সময়ের সঙ্গে নয়, আচরণের

সঙ্গে। এই ব্রত আমাদের প্রত্যেকটী কাজ, চিন্তা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত। যদি আচরণই শুদ্ধ না হয় তবে জপ তপের মতো বড় বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই বা কি ফল? অসুস্থ শরীরে যেমন বলবর্দ্ধক ওষুধ কাজ করে না তেমনি আচরণ বিশুদ্ধি ছাড়া জপ তপেরও ফল হয় না। তাই প্রথম প্রয়োজন আচার, বিচার ও ব্যবহারকে নির্মল করা, পবিত্র করা। একথা সত্যি যে সামায়িক; পৌষধ আদি ব্রতের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন কিন্তু তার জন্য হতাশ হবার কারণ নেই। বারোটি ব্রত যদি কেউ পালন করতে সমর্থ না হন তবে তিনি প্রথম পাঁচটী অণুব্রত গ্রহণ করতে পারেন। এগুলি একটীর সঙ্গে অন্যটী অনন্য ভাবে সম্বন্ধান্বিত। তাই কেউ যদি একমাত্র অহিংসাব্রতেরই সমুচিত ভাবে পালন করেন তবে তিনি পরোক্ষভাবে অন্য ব্রতগুলিও পালন করছেন, এবং একথা খুবই ঠিক যে আমরা যদি এই ব্রতগুলি পালন না করি তবে জৈন কুলে জন্মেছি বলেই আমরা জৈন হয়ে যাই না। নিজেকে শ্রাবক বলবার তিনিই অধিকারী যিনি নিজের জীবন এই ব্রতের অনুরূপ নির্মাণ করবার অবিরাম প্রয়াস করছেন। জৈনধর্ম কেবল নিবৃত্তি মূলকই নয়, প্রবৃত্তি মূলকও। তাইত সাধ্বাচার হতে শ্রাবকাচারকে পৃথক করে তার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে প্রবৃত্তির আগে সৎ কথাটি অবশ্যই যোগ করতে হবে কারণ জৈনধর্ম নিছক প্রবৃত্তির সমর্থক নয়। বিবেকপূর্ণ সৎ-প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়েই সে শুভ এবং শুভ হতে শুদ্ধতর জীবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সমরাদিত্য কথা

হরিভদ্র সূরী

[কথাসার]

[দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা হতে]

॥ ৩ ॥

আর্জব কৌডিন্যের মতো কুলপতিও তাঁর আশ্রমে অগ্নিশর্মার মতো তপস্বীকে লাভ করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতে লাগলেন। কারণ দু'চার দিনের উপবাস ত তুচ্ছ, অগ্নিশর্মা একসঙ্গে আট আট দিন এমন কী পনেরো দিন উপবাস টেনে নিয়ে যেতে পারত, একটী চাল বা যবের ওপর সমস্ত দিন কাটিয়ে দিত। শীত ও গ্রীষ্ম সমান ভাবে সহ্য করত, ছোট ও পাতলা দর্ভের শয্যায় হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকত। এখন তাই আশ্রম-বাসীরাও তপস্বী অগ্নিশর্মাকে আসতে দেখলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে যান।

কিন্তু উপবাস করার সময় বা শীতোষ্ণতাকে সমান ভাবে সহ্য করার সময় কি অগ্নিশর্মার মনে কোনো প্রশ্ন উদিত হত? কোনো সাধনাই ত নিরর্থক নয়! অগ্নিশর্মার এই কঠোর সাধনার উদ্দেশ্য কী? —এই প্রশ্ন অনেকের মনকেই উদ্বেজিত করেছিল।

অখণ্ড অবকাশ ও অনন্ত শান্তির মধ্যে কে জানে অগ্নিশর্মা কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে যেত কি না? তবে তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে যদি সম্যক দর্শন বা নির্মল দৃষ্টি না থাকে তবে সে তপস্যা আগে গিয়ে শুধু জটিলতারই সৃষ্টি করে না, তপস্বীকে আরো পথ ভ্রষ্টও করে দেয়। কিন্তু অগ্নিশর্মাকে সেই নির্মল দৃষ্টি দেবার কেউ ছিল না। যদিও আচার্য কৌডিন্য তাঁর একান্ত প্রিয় শিষ্যকে নিজের বলে যা কিছু ছিল তা সম্পূর্ণ দিতে কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু সেই নির্মল দৃষ্টি তিনিও ত এখনো লাভ করেন নি।

অগ্নিশর্মা কী সেই নূতন পরিবেশে তার পূর্ব জীবনের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল? উদ্ধত ও অবিনয়ী মানুষের দঙ্গল কখনো যে তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াত, তাকে কারণে অকারণে তিক্ত বিরক্ত ও নির্যাতিত করতো সে সব কথা কী অগ্নিশর্মার আর মনে পড়ে না? যদি পড়ে তবে কি সেই সময় তার মনে নিষ্ক্রিয় ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয় না? আর সেই যুবরাজ গুণসেনকৃত নিষ্ঠুর কৌতুককে কি সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পেরেছিল? যদি বিস্মৃতও হয়ে থাকে তবে তার রেশটুকুও কি আর তার অন্তরে ছিল না? অগ্নিশর্মা যতবড় তপস্বীই হোক না কেন, ক্ষমাশীল ছিল না। বস্তুতঃ ক্ষমা ও শান্তি এ দুইই ছিল তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সময় অনেক কথাই মানুষকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় এবং সম্ভবতঃ গুণসেনের কথাও সে হয়ত অনেকখানি ভুলে গিয়েছিল। কারণ এখন এখানে যেসব ক্ষত্রিয় পুত্র, শ্রেষ্ঠী পুত্র ও ব্রাহ্মণপুত্র আসে তারা তপস্বীদের দর্শন লাভ করে নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করে। আচার্য কৌডিন্যের এই আশ্রম বসন্তপুর নগরের এক গৌরবস্থল।

একদিন সেই তপোবনে বসন্তপুর হতে রাজকুমারের মতো এক যুবক অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হল। তাকে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত বলে মনে হচ্ছিল। তার সঙ্গী অনুচরেরাও তার সঙ্গে ছিল না এবং সে ছিল সেই আশ্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অশ্বকে দ্রুত বেগে ধাবিত করতে করতে ভুল ক্রমেই সে এই তপোবনে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

তপোবনের শান্তি ও সৌন্দর্য তার মনকেও প্রভাবিত করল। বসন্তপুরে আসবার পূর্বে সে অনেক দেশ পর্যটন করে এসেছে তবু তপোবন ও আশ্রমবাসীদের সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য এই তার প্রথম।

শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল বলেই সে অশ্ব হতে অবতরণ করে এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে বসল। তাকে সেখানে বসতে দেখে আশ্রমবাসীদের কেউ কেউ তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং তার মধ্যে তার পেছিয়ে পড়া সঙ্গী অনুচরেরাও সেখানে এসে উপস্থিত হল।

যে বসন্তপুর রাজ্যের সীমায় তাঁরা আশ্রম বেঁধে শান্তি ও নিশ্চিন্ততায় অবস্থান করছেন সেই বসন্তপুর রাজ্যের রাজার নিকট কোনো আত্মীয় পথ

ভুলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন সে খবর মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে তা কুলপতি কৌডিন্যের কানেও উঠল। তিনি সেই খবর পেয়ে সেই রাজ অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য দ্রুত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কুমারও বিনীত ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করল।

কুলপতি কুমারকে স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগলেন, 'সঙ্গ পরিতোষ' নামক এই আশ্রমের কথা নিশ্চযই আপনি শুনেছেন। এখানে কেবল তপস্বীরাই বাস করেন। তপস্বীদের তপস্যার প্রভাবে এখানকার বন্য জন্তুরাও তাদের স্বাভাবিক বৈর ভুলে গেছে।

করুণামূর্তি কুলপতির সেই কথা শুনে কুমারের মনে হল সে যেন এক ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন জগতে এসে উপস্থিত হয়েছে! তবু প্রত্যুত্তরে সে সেখানে নবাগন্তুকই নয়, এই আশ্রমপদের নাম পর্যন্ত শোনে নি—সেই কথাই সে কুলপতির কাছে বিনম্র ভাবে নিবেদন করল।

বসন্তপুরের রাজার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না কুলপতি সে কথা জানতেন। তাঁর একটী কন্যা ছিল। রাজকুমারের মতো বেশ ও হাতে বাঁধা মঙ্গল সূত্র দেখে তিনি এই অনুমান করলেন রাজকুমার নিশ্চয়ই রাজ জামতা।

তাঁর অনুমান যে সত্য সে কথা একটু পরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু কুমার যেই হোক ক্ষত্রিয় পুত্র ও পথভ্রষ্ট হয়ে সহসা তাঁর আশ্রমপদে এসে উপস্থিত হয়েছে কুলপতির কাছে এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। তাকে দিয়ে কোনো স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

কুলপতি তখন কুমারকে নিয়ে তাঁর আশ্রম পরিদর্শন করাতে লাগলেন ও তপস্বীদের সঙ্গে পরিচয় করাতে করাতে যেখানে অগ্নিশর্মা অবস্থান করছিল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

কুলপতি অগ্নিশর্মাকে দেখিয়ে বললেন, এর নাম অগ্নিশর্মা, এ কঠোর তপস্বী।

অগ্নিশর্মাকে দেখা মাত্র গুণসেনের মনে একটা আঘাত লাগল। এতক্ষণ সে তপস্বীদের দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে এসেছে তাই অগ্নিশর্মাকেও সে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করল কিন্তু মনে পূর্ব স্মৃতি উদিত হওয়ায় গ্লানির এক তীব্র বেদনা তার মুখের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

কুলপতি তা লক্ষ্য না করেই বললেন, যদিও ও বেশী দিন এখানে আসে নি, তবু ওর সমকক্ষ তপস্বী আজ পর্যন্ত আমি দেখি নি। ওর শান্ত ও সরল প্রকৃতি ও তার চাইতেও দেহ দমনের উগ্রতা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে।

অগ্নিশর্মা সঘন আম্র বৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিল। এতক্ষণ তাই সে কিছুই বুঝতে পারে নি কিন্তু এখন আচার্য কৌডিন্যের কণ্ঠস্বর তার কানে যেতে সে চোখ মেলে চাইল। তার দৃষ্টি প্রথমেই গিয়ে গুণসেনের ওপর পতিত হল। অগ্নিশর্মার করুণা ভরা চোখ হতে যে স্বর্গীয় দিব্যতা ঝরে পড়ছিল সেই দিব্যতা গুণসেন বোধ হয় জীবনে এই প্রথম দেখল।

অগ্নিশর্মাও প্রথম দৃষ্টিতেই গুণসেনকে চিনতে পেরেছিল। কারণ স্মৃতি ত তখনো তেমন পুরুণো হয়ে যায় নি। তবু নিশ্চয় করতে একটু সময় লাগল। তবে এই ক্ষত্রিয় কুমার যে তার পূর্ব পরিচিত গুণসেন তাতে তার কোনো সন্দেহই ছিল না।

হঠাৎ গুণসেনের তার ওপর কৃত অত্যাচারের কথা মনে হওয়ায় স্মৃতি বৃশ্চিক দংশনের এক জ্বালা তার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে গেল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। অগ্নিশর্মা তার বিক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তিকে আবার অন্তর্মুখীন করে নিল। কিন্তু তবু যখন তাকে মুখ খুলে কিছু বলতে হল তখন সে বলে উঠল, মহারাজ গুণসেন, আপনি আমার কম উপকারী নন্। আপনার দয়াতেই তপশ্চর্যার এই পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।

গুণসেনও বুঝতে পারল অগ্নিশর্মা তার কৃত অত্যাচারকে উপকার বলে এখন অভিহিত করলেও সেই অত্যাচারের ক্রূরতা তার মন হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বস্তুতঃ নিজের অপমান ও অবগণনা কে কবে ভুলতে পেরেছে?

গুণসেনের মনে পশ্চাত্তাপের আগুন প্রকটিত হলেও এখানো তা ভস্মাবৃতই ছিল। গুণসেনের অতিরিক্ত সেই পশ্চাত্তাপের বেদনা সেখানে উপস্থিত আর কেউ যে বুঝবে তারো সম্ভাবনা ছিল না।

একদিকে গুণসেন যেমন তার অতীতে কৃত অত্যাচারের কথা মনে করে মনে মনে জ্বলে মরছিল অন্যদিকে অগ্নিশর্মাও তেমনি তার অতীতের

অবমাননার কথা স্মরণ করে অন্তরে অন্তরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। গুণসেনের পশ্চাত্তাপের মতো তার বিক্ষুব্ধতাও সেখানে উপস্থিত আর কেউ বুঝবে তারও সম্ভাবনা ছিল না। তাই দুই জনেই নিজের নিজের মনোভাবকে শমিত করবার যথাশক্তি প্রয়াস করছিল।

কিছুক্ষণ পরে গুণসেন কুলপতিকে সম্বোধিত করে বলল, তাপসদের পদঃরজে আমার প্রাসাদ পবিত্র হোক এই আমার ইচ্ছা। আপনি কি ভিক্ষার জন্য আমার প্রাসাদে পদার্পণ করবেন না ?

আচার্য কৌণ্ডিন্য বললেন, রাজার যে আশ্রয় আমরা লাভ করি তাই কি আমাদের পর্যাপ্ত নয় ? ভিক্ষার জন্য ত আমরা যেখানে খুসী যেতে পারি। রাজার প্রাসাদ বা দরিদ্রের কুটীর দুইই আমাদের পক্ষে সমান। তবে অগ্নিশর্মার বিষয়ে ত আমি কিছুই বলতে পারব না।

অগ্নিশর্মার তপস্যা অনন্য ধরণের। ওর ভিক্ষার নিয়মও আবার সেই-রকম অনন্য।

অগ্নিশর্মা তখন বিষয়টার স্পষ্টীকরণ করে বলল, আমি একটী ঘরেই কেবল ভিক্ষার জন্য যাই। যার ঘরে যাই তা প্রথমে নির্দ্ধারিতও করি না। সেখানে ভিক্ষা পেলাম ত ভালো, না পেলে দ্বিতীয় দিন হতে আর এক মাসের উপবাস। আমার মনে ধনী দরিদ্রের কোনো প্রভেদ নেই।

একমাস পূর্ণ হতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী ছিল। পঁচিশ দিনের উপবাস তবু নিজের পারনের ব্যাপারে অগ্নিশর্মার কোনো আগ্রহ ছিল না, কবে উপবাস শেষ হবে, কবে সে আহার প্রাপ্ত হবে সে ধরণের কোনো দুর্বলতা তার কথায় প্রকাশিত হল না।

গুণসেন বলল, এবার ত আপনি আমার প্রাসাদেই পদার্পণ করে ভিক্ষা গ্রহণ করুন—এই আমার বিনম্র প্রার্থনা।

অগ্নিশর্মারও এতে কোনো বিরোধ ছিল না। মহারাজের পুত্র তুল্য জামাতা যখন এই প্রকার বিনম্র প্রার্থনা করছে সেখানে সে তার অনাদরই বা কি ভাবে করে। তবুও অগ্নিশর্মা এভাবে প্রত্যুত্তর দিল, দু'ঘণ্টা পরে কী হবে তা কেউ জানে না। পাঁচ দিন আগে তাই কথা দেওয়া আমাদের আচারের অনুকূল নয়। তবে তোমার প্রার্থনা আমি অবশ্যই মনে রাখব।

রাজকুমারের বিনম্র প্রার্থনা ও তাপসের মর্যাদা রক্ষা করে তার স্বীকারে আচার্য কৌণ্ডিন্ত অগ্নিশর্মার মনে মনে প্রশংসা করলেন। অগ্নিশর্মা কেবলমাত্র শুকনো তপস্বীই নয়, নিজের মর্যাদা সম্পর্কেও সচেতন ও সাবধান তা দেখে তিনি গভীর সন্তোষ লাভ করলেন।

গুণসেনও আশ্রম পরিদর্শন করে প্রাসাদে ফিরে গেল। সকালে যে গুণসেন ছিল বিকেলে সে গুণসেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

॥ ৪ ॥

পঁচিশ দিন ধরে খিদের সঙ্গে যুদ্ধে নিরত অগ্নিশর্মার শেষেরও পাঁচ দিন ব্যতীত হয়ে গেল। এই পাঁচ দিনের প্রত্যেক পল কত বিষম ও কত কঠিন ছিল তা কে জানে?

যারা ঐশ্বর্য ও ভোগ সুখের মধ্যে বাস করে তারা অগ্নিশর্মার মাসোপবাসের শেষের দিনগুলোর বিষমতা ও কঠিনতা কদাচিৎই বুঝতে পারবে। দীর্ঘ উপবাসের প্রথম ও শেষের দিকের দিনগুলো তপস্বীর সংযম সাগরে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। যারা এক পলও ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না, যাদের আহার ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অতিরিক্ত অন্য কোনো ধ্যেয় নেই তাদের কাছে অগ্নিশর্মার এই তপশ্চর্যা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হবে।

সে যাই হোক, পাঁচ দিন পূর্ণ হলে তপস্বী অগ্নিশর্মা আহারের সন্ধানে বসন্তপুরের রাজমার্গে বেরিয়ে পড়ল। শরীরকে যে সাধনরূপ মনে করে, দমন রূপ আগুনে আত্মকল্যাণ রূপ সোনাকে পরিশুদ্ধ করাতেই যার দৃষ্টি সে সুস্বাদু আহারের জন্য কেন লোলুপ হবে? অগ্নিশর্মা মাত্র দেহের নির্বাহের জন্যই আহারের খোঁজে বার হয়েছিল।

উপরোপরি উপবাসে অগ্নিশর্মার দেহকে শুষ্ক ও জীর্ণ করে দিয়েছিল। সামান্য পথিকদের কাছে তাই সে মূর্তিমান ক্ষুধা বলেই প্রতিভাত হত। তবে অন্ন না পেয়ে যারা ক্ষুধায় থাকে ও যারা ক্ষুধার দুঃখের বিরুদ্ধে সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করে তাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক। এবং সে পার্থক্য যারা অগ্নিশর্মার চোখে সংযম ভরা তেজস্বীতা দেখেছে তারাই বুঝতে পারবে। অগ্নিশর্মা

ক্ষুধার দুঃখকে যে সহ্য করত শুধু তাই নয় ক্ষুধার বেদনাকেও যেন সে নিজের মধ্যে পরিপাক করে নিয়েছিল। অন্নকে প্রাণ বলা হয়। কিন্তু সেই প্রাণেরও যে পরোয়া করে না সেই অগ্নিশর্মাকে অস্থিচর্মসার মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম বিকৃতির ওপর জয়লাভকারী কোন এক বিশ্ববিজেতা যেন বসন্তপুরের সুরম্য অট্টালিকাগুলোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে।

যারা এই তপস্বীকে জানত বা বুঝত তারা তাই আশ্চর্য চকিত হয়ে ভাবতে লাগল যিনি অল্প সীমার মধ্য হতেই ভিক্ষা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন তিনি আজ তন্ময়ের মতো পথ অতিবাহিত করে না জানি কোথায় চলেছেন!

দু'একজন ত একটু সাহস করে তাকে তাদের ঘরে ভিক্ষা নেবার জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হাতে প্রার্থনাও করেছিল কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা তপস্বীর মৃদুহাস্যরূপ পুরস্কারই কেবল লাভ করল।

কিছুদূর আরো যাবার পর রাজপ্রাসাদ দেখা গেল। সেই সময় অগ্নিশর্মার মনে হল কে যেন তার কানে কানে গুপ্তমন্ত্রদানের মতো চুপে চুপে বলছে, যেন আর কেউ না শুনতে পায়: হে তাপস, তুমি এভাবে রাজৈশ্বর্যের অংশীদার হতে কোথায় চলেছ? তপস্বীর রাজপ্রাসাদের ভোগোপভোগের ভাগ নেওয়া শোভা পায় না। তুমি কি নিজের অন্তর ভালো করে যাচাই করে দেখে নিয়েছ? রাজপ্রাসাদ তো প্রলোভনের, লোভ ও লালসার মায়ামন্দির স্বরূপ। রাজসৎকার বা রাজআতিথ্য কাঁচা পারার মতো, যদি পরিপাক করতে পার ত আনন্দের সঙ্গে যাও নয়ত তরবারির ধারের ওপর চলা হতে নিবৃত্ত হও।

[ক্রমশঃ

প্রার্থনা

নির্জিত যাঁর রাগ দ্বেষ আদি,
হয়েছে যাঁর ভুবন জ্ঞান,
মোক্ষপদের উপদেশ যিনি
নিস্পৃহ হয়ে করেন দান। ১

বুদ্ধ বীর জিন হরি হর ব্রহ্মা
যে নামেই তুমি ডাকো না তাঁকে,
ভক্তিভাবে সদা চালিত হয়ে
চিত্ত যেন তাঁয় লগ্ন থাকে। ২

বিষয়ের আশ নেইক যাঁদের,
সাম্য ভাবেতে পূর্ণ মন,
আপন পরের কল্যাণে যাঁরা
দিবস রাত্রি মগ্ন র'ন। ৩

স্বার্থ ত্যাগের কঠিন চর্যা
খেদহীন আরো বহেন যাঁরা,
এমন সাধু জ্ঞানী স্বজন
জীবের দুঃখ হরেন তাঁরা। ৪

সৎসঙ্গ যেন তাঁদের থাকে,
ধ্যান যেন তাঁদেরি হয়,
তাঁদের মতন চর্যায় মন
সতত আমার মগ্ন রয়। ৫

দুঃখ যেন না দেই কারেও,
মিথ্যা না বলি জীবনে কভু,
কামিনী কাঞ্চনে লোভ না করি,
সন্তোষ রাখি হৃদয়ে প্রভু। ৬
অহঙ্কার না যেন করি,
ক্রুদ্ধ না হই কখনো আমি,
অন্যের দেখি অভ্যুদয়
ঈর্ষ্যা কাতর না হই স্বামি। ৭
এ ভাবনা যেন থাকে মোর বুকে—
সরল সত্য সুব্যবহার,
এ জীবন দিয়ে যত দূর পারি
করে যাই যেন পরোপকার। ৮
মৈত্রী আমার সকল জীবে,
সবার প্রতি নিত্য রহে,
দীন দুঃখী সবার লাগি
হৃদয়ে করুণা স্রোত বহে। ৯
দুর্জন যারা, কুমার্গগামী,
ক্রুদ্ধ না হই তাদেরো প্রতি,
সাম্য ভাবে যেন তাদেরো দেখি,
হয় যেন মোর সে পরিণতি। ১০
দেখি গুণীজনে হৃদয়ে আমার
প্রেম ভাব যেন উদিত হয়,
এ জীবন যেন তাঁদের সেবায়
আনন্দে সদা নিরত রয়। ১১
কৃতঘ্ন যেন না হই কভু,
বিদ্বেষ যেন বুকে না রাখি,
দোষ পানে যেন দৃষ্টি না যায়,
গুণগ্রাহী যেন সতত থাকি। ১২

ভালো বা মন্দ যেমন বলুক,
লক্ষ্মী যান বা লক্ষ্মী র'ন,
লক্ষ বর্ষ হোক পরমায়ু,
অথবা মৃত্যু হয় এখন। ১৩
প্রলোভন যত আসে আসুক,
রক্ত চক্ষু দেখাক ভয়,
ন্যায় পথ হতে ভ্রষ্ট না হই—
এ জীবন যেন এমন হয়। ১৪
গর্ব না করি সুখেতে যেন,
দুঃখে না হই ধৈর্যহারা,
পর্বত নদী শ্মশান অটবী—
দমিতে না পারে আমায় তারা। ১৫
থাকে যেন মন অচল দৃঢ়,
ভয় যেন সে না করে কারো,
ইষ্ট বিয়োগে অনিষ্ট যোগে
সহনশীল যেন হয় সে আরো। ১৬
সুখী যেন হয় সংসারে সবে,
দুঃখ না থাকে কাহারো প্রাণে,
দ্বেষ অভিমান পরিহরি সবে
রত রয় যেন আনন্দ গানে। ১৭
ঘরে ঘরে যেন ধ্যান আরাধনা,
না থাকে পাপ অবনী পরে,
উন্নত করি চারিত্র জ্ঞান
মানব জন্ম সফল করে। ১৮
অভাব না যেন থাকে কোথাও,
প্রয়োজনে মেঘ বর্ষে বারি,
রাজা যেন হয় প্রজাপুঞ্জের
ন্যায়ানুযায়ী শাসনকারী। ১৯

রোগ মারী ভয় নাহি থাকে যেন,
সর্বদা সবে সুখেতে রয়,
কল্যাণকারী অহিংসা যেন
সবখানে পরিব্যাপ্ত হয়। ২০

থাকে প্রেম ভাব সকলের সাথে,
মোহ যেন থাকে অনেক দূর,
কেহ নাহি কহে কাহারেও যেন
অপ্রিয় শব্দ কঠিন ক্রূর। ২১

যুগ নেতা হয়ে সকলে আমরা
সব সঙ্কট সহজে বরি
বস্তু স্বরূপ বিচারিয়া যেন
ধর্মের অভিবৃদ্ধি করি। ২২

পণ্ডিত যুগল কিশোর মুখ্‌তার-এর 'মেরী ভাবনা'র বঙ্গানুবাদ।

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন

পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি :

প্রকাশন স্থান	:	কলিকাতা
প্রকাশের কাল	:	মাসিক
মুদ্রকের নাম	:	গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা	:	পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
প্রকাশকের নাম	:	গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা	:	পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
সম্পাদকের নাম	:	গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)
ঠিকানা	:	পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
স্বত্বাধিকারীর নাম	:	জৈন ভবন
ঠিকানা	:	পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি, গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

গণেশ লালওয়ানী
প্রকাশকের স্বাক্ষর

১৫. ৩. ৭৫

WB/NC-120

Vol. II. No. 11 : Sraman : March 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১. সাতটী জৈন তীর্থ —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

২. অতিমুক্ত —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৪.০০

৩. শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

৪. শ্রাবককৃত্য —শ্রীগণেশ লালওয়ানী নিঃশুল্ক

हिन्दी

१. श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला
—श्री कान्तिसागरजी महाराज ५.००

२ श्रीमद् देवचन्द्रकृत अध्यात्मगीता
—श्री केशरीचन्द धूपिया .७५

English

1. Bhagavati Sutra
(Text with English Translation)
—Sri K. C. Lalwani
Vol. I (Satak 1-2) 40.00
Vol. II (Satak 3-6) 40.00

2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha .75
tr. by Sri Ganesh Lalwani

3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani 1.50

চৈত্র ১৩৮১

দ্বিতীয় বর্ষ : দ্বাদশ সংখ্যা

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৮১ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

জৈন কীর্তিস্তম্ভ, চিতোর

বর্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]
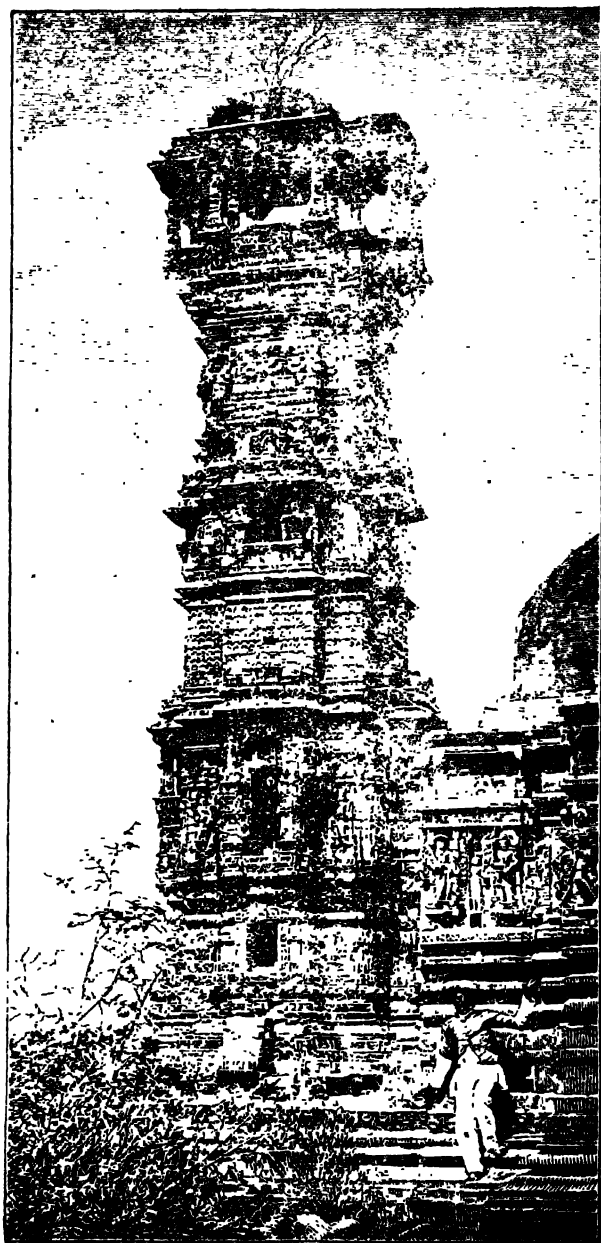
কৌশাম্বীতে সেদিন মহারাণী মৃগাবতী মহামাত্য, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা আহ্বান করেছেন। সকলে উপস্থিত হলে তিনি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনারা সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন আজ কেন এই সভা ডেকেছি। আপনারা সকলে জানেন যে দীর্ঘদিন ধরে নগরীর সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রাকার নির্মাণ করা হয়েছে, পরিখা খনন করা হয়েছে, সৈন্যদল বৃদ্ধি করা হয়েছে, যুদ্ধ সম্ভারও সংগ্রহ করা হয়েছে। নগরী পরিবেষ্টিত হলে দু'তিন বছর অবরোধের সম্মুখীন হতেও তা সমর্থ। এবং এও আপনারা জানেন যে এই সমস্ত কাজ উজ্জয়িনীর চণ্ডপ্রদ্যোতের সাহায্যে সম্পন্ন হয়েছে। চণ্ডপ্রদ্যোত আমার স্বামীর মৃত্যুর সময় কৌশাম্বী আক্রমণ করতে এসেছিলেন। তার পরিবর্তে কৌশাম্বীকে অভেদ্য করে দিয়েছেন। এ আপনাদের কাছে রহস্য-জনক বলে মনে হতে পারে এবং সেইজন্যই আমি আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। এবং এও হয়ত আপনাদের অবিদিত নেই যে চণ্ডপ্রদ্যোতের কৌশাম্বী আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলাম আমি। মহারাজ তখন বিগত হয়েছেন, আর কুমার উদয়ন তখন নাবালক। সেই অবস্থায় কূটনীতির আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। তাই চণ্ডপ্রদ্যোতকে আমি গোপনে বলে পাঠালাম যে আমি তাঁর সঙ্গে উজ্জয়িনী যেতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তার আগে কৌশাম্বীকে সুরক্ষিত করে দিয়ে যেতে চাই যাতে উদয়ন কোনো বিপদের সম্মুখীন না হয়। চণ্ডপ্রদ্যোত আমার কথায় বিশ্বাস করে নগরীকে সুরক্ষিত করে দিয়েছেন। এখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আগামী কালই তাঁর কাছে আমার যাবার শেষ দিন।

মৃগাবতী একটু থামতেই সভায় একটা গুঞ্জন উঠল। মৃগাবতী তখন আবার বলতে লাগলেন, আপনারা যুদ্ধের কথা ভাবছেন। চণ্ডপ্রদ্যোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা। তাতে উভয় পক্ষের লোক ক্ষয় হবে কিন্তু আপনারা আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। এর একমাত্র যে উপায় আছে তা আমি ভেবে রেখেছি এবং সেই কাজ করবার জন্যই আমি আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। আমি হৈহয় বংশীয় ক্ষত্রিয় কন্যা ও মহারাজ শতানীকের মতো ক্ষত্রিয়ের মহিষী। আমি চণ্ডপ্রদ্যোতের অঙ্কশায়িনী হব তা কখনো সম্ভব নয়। কাল আপনারা আমার মৃতদেহ চণ্ডপ্রদ্যোতের কাছে নিয়ে যাবেন আর আমার আত্মা আমার স্বর্গত স্বামীর কাছে গমন করবে।

মৃগাবতী এই বলে থামলেন। সমস্ত সভা তখন বিস্মিত ও স্তম্ভিত। সকলেই মৃগাবতীর বুদ্ধি ও চাতুর্যের, শীল ও সাহসের প্রশংসা করলেন কিন্তু সত্যিই কি মহারাণীর মৃত্যু ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের আর কোনো উপায় নেই। মহারাণীর আত্মহত্যার কথা তাঁরা ভাবতেই পারেন না—

অনেকক্ষণ সভা নিস্তব্ধ রইল। তারপর একজন নাগরিক সহসা উঠে দাঁড়াল ও মৃগাবতীকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, মহারাণী, আত্মহত্যা সব সময়েই পাপ। আমার তাই মনে হয় যে আপনি যদি ভগবান বর্দ্ধমানের সাধ্বী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন তবে উভয় দিক রক্ষা পায়।

কথাটা সকলেরই মনঃপূত হল। মৃগাবতীরও। কিন্তু কালই তিনি কি করে বর্দ্ধমানের সাধ্বী সংঘে প্রবেশ করবেন? তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন? তাঁর কাছে কীভাবে যাওয়া যায়?—ইত্যাদি বিষয় বিচার্য হয়ে উঠল। সভা পরদিনের জন্য স্থগিত রাখা হল।

কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই সংবাদ এল বর্দ্ধমান কৌশাম্বীর উপকণ্ঠস্থিত চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে এসে অবস্থান করছেন। তখন মৃগাবতী তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বর্দ্ধমানের দর্শন ও বন্দনা করবার জন্য চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ওদিকে চণ্ডপ্রদ্যোৎও বর্দ্ধমানের আসার খবর পেয়ে চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বর্দ্ধমান সেই সভায় আত্মার অমরত্ব, কর্মের বন্ধন, সংসারের অসারতা, জন্ম

মৃত্যুর দুঃখ, অহিংসা, সংযম ও তপস্যায় সেই দুঃখ হতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা ওজঃস্বিনী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করলেন। জনতা তা মন্ত্র-মুগ্ধের মতো শ্রবণ করল। সেই সময়ের জন্য জনতার মন হতে যেন রাগদ্বেষাদি ভাব একেবারে দূর হয়ে গিয়েছিল।

বর্দ্ধমান যখন তাঁর উপদেশ শেষ করলেন তখন মৃগাবতী উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বর্দ্ধমানকে তিনবার প্রদক্ষিণা ও প্রণাম করে বললেন, ভগবন্, আমি সংসারের অসারতা উপলব্ধি করেছি। এর প্রতি আমার আর কোনো মোহ নেই। জন্ম, জরা ও মৃত্যুর দুঃখ হতে মুক্তি পাবার জন্য আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সাধ্বী সংঘে প্রবেশ করতে চাই। ভগবন্, আপনি আমায় গ্রহণ করুন।

বর্দ্ধমান বললেন, দেবানুপ্রিয়ে, তোমার যেমন অভিরুচি।

প্রদ্যোত অপলক দৃষ্টিতে মৃগাবতীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন আর ভাবছিলেন: এই নারী কি সেই মৃগাবতী যার ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি উজ্জয়িনী হতে কৌশাম্বী ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু এ রূপত মোহ উৎপন্ন করে না। বরং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবের জন্য শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমেরই উদ্ভব করে।

বস্তুতঃ বর্দ্ধমানের সান্নিধ্যে তাঁর অন্তরেও এক বিরাট পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছিল। তাই এতদিনের উৎকট কামনা তাঁর কাছে ভ্রম ও অন্যায় বলেই মনে হতে লাগল। চণ্ডপ্রদ্যোত তাই মৃগাবতীর সাধ্বী ধর্ম গ্রহণে কোনো বাধাই দিলেন না। বরং পরদিন সকালে কৌশাম্বীতে প্রবেশ করে উদয়নকে সিংহাসনে বসিয়ে উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলেন ও বলে গেলেন কেউ যদি কৌশাম্বী আক্রমণ করে তবে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। তাহলে তিনি সসৈন্যে তখনি এসে কৌশাম্বী রক্ষা করবেন।

এভাবে মৃগাবতীর জীবনই রক্ষা পেল না, আর্যা চন্দনার সান্নিধ্যে তিনি কঠোর সংযম ও তপস্যাচরণ করে অচিরেই মুক্তি লাভ করলেন।

বর্দ্ধমান মৃগাবতীকে দীক্ষিত করবার পর কিছুকাল কৌশাম্বীতে অবস্থান করলেন তারপর বিদেহ ভূমির দিকে গমন করলেন। সেই বর্ষাবাস তিনি বৈশালীতেই ব্যতীত করবেন।

বর্দ্ধমান বর্ষাবাস শেষ হলে মিথিলার দিকে গমন করলেন। সেখান হতে আবার কাকন্দীতে ফিরে এলেন।

কাকন্দী হতে বর্দ্ধমান শ্রাবস্তী হয়ে কাম্পিল্য নগরে এলেন। কাম্পিল্য নগরে গৃহপতি কুণ্ডকোলিককে শ্রাবক ধর্মে দীক্ষিত করলেন। তারপর অহিচ্ছত্রা, গজপুর হয়ে পোলাসপুর এলেন।

পোলাসপুরে তখন সদ্দালপুত্র নামে এক ধনী কুমোর বাস করত। তার তিন কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল ও ৫০০ গরুর গোব্রজ। পাঁচশ তার মাটির বাসনের দোকান ছিল যেখানে এক হাজার লোক কাজ করত। সদ্দালপুত্র ধর্মারাধনাও করত। তবে সে আজীবিক ধর্মাবলম্বী ছিল।

সেদিন রাত্রে সে যখন শুয়ে ছিল তখন সে একটা স্বপ্ন দেখল। দেখল কে যেন তাকে ডাক দিয়ে বলছে, সদ্দালপুত্র, কাল সকালে এদিক দিয়ে সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী মহাব্রাহ্মণ যাবেন। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার ঘরে থাকবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ কোরো ও তাঁর অবস্থানের জন্য কাষ্ঠ ফলকাদির ব্যবস্থা করে দিও।

সদ্দালপুত্রের সেই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সে ভাবল তাহলে সকাল-বেলায় তার ধর্মাচার্য মংখলীপুত্র গোশালক পোলাসপুরে আসবেন। কারণ তিনি ছাড়া এ যুগে আর কে সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও মহাব্রাহ্মণ আছে?

সদ্দালপুত্র তাই সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে মংখলী-পুত্রের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর যখন সে ঘরের বাইরে এল তখন সে শুনল পোলাসপুরের বাইরে জ্ঞাতপুত্র শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান এসেছেন।

সদ্দালপুত্র সেকথা শুনে হতোৎসাহ হল। মহাব্রাহ্মণকে ঘরে অবস্থানের জন্য আহ্বান ত দূরের তাঁর দর্শন করবার ইচ্ছাও তার শান্ত হয়ে গেল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তখন তার স্বপ্নের কথা আবার মনে হল। ভাবল তবে বর্দ্ধমানের কাছে তার যাওয়াই উচিত। তখন সে বর্দ্ধমানের কাছে গেল ও তাঁকে বন্দনা করে তার ঘরে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। বর্দ্ধমান তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার ভাণ্ডশালায় এসে উপস্থিত হলেন।

সদ্দালপুত্র বর্দ্ধমানের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েই নিজের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। বর্দ্ধমানের সৎসঙ্গ সে করল না বা তা করবার তার ইচ্ছাও ছিল না।

কিন্তু বর্দ্ধমান এসেছেন তাকে ভ্রান্তপথ হতে সত্যপথে তুলে নিতে। তাই তার উপেক্ষা তিনি গায়ে নিলেন না বরং একদিন তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন সদ্দালপুত্র এই সব মাটির বাসন কি করে তৈরী হল?

সদ্দালপুত্র বলল, ভগবন্, মাটি হতে। প্রথমে মাটিকে জল দিয়ে কাদাকাদা করে নিতে হয় তারপর নাদ, ভূষি, আদি মিলিয়ে দলা পাকাতে হয়। সেই দলাকে চাকে তুলে চাক ঘুরাতে হয়। ঘোরানোতে হাঁড়ি, কলসী, বাসনপত্র তৈরী হয়।

বর্দ্ধমান বললেন, সদ্দালপুত্র, আমি সেকথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার প্রশ্নের তাৎপর্য, এগুলো কি পুরুষাকারে হয়েছে না নিয়তি বশে?

ভগবন্, নিয়তি বশে। তাছাড়া জগতের সমস্ত কিছু নিয়তিরই অধীন। যার যা নিয়তি তা না হয়ে যায় না। পুরুষ প্রযত্ন সেখানে ব্যর্থ।

সদ্দালপুত্র, তোমার ওই বাসন কেউ যদি ভেঙে দেয়, ফেলে দেয়, ছড়িয়ে দেয় তবে তুমি কি কর?

ভগবন্, যদি তাকে ধরতে পারি ত খুব মারি। এমন মারি যাতে সে জীবনেও না ভোলে।

সদ্দালপুত্র, তুমি তাকে কেন মারবে? সে যদি তোমার বাসন ভেঙে দিয়ে থাকে, ফেলে দিয়ে থাকে, ছড়িয়ে দিয়ে থাকে তবে তা নিয়তি বশেই ভেঙে দিয়েছে, ফেলে দিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে। তুমি ত নিজেই বললে পুরুষ পরাক্রম বলে কিছু নেই।

সদ্দালপুত্র নিরুত্তর।

সদ্দালপুত্র যখন বুঝতে পারল, নিয়তিবাদের সিদ্ধান্ত অব্যবহারিক তখন সে বর্দ্ধমানের পায়ে নত মস্তক হয়ে বলল, ভগবন্, আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনবার অভিলাষী।

বর্দ্ধমান তাকে নির্গ্রন্থ প্রবচন শোনালেন। বললেন, সবই যদি নিয়তি জন্য তবে মোক্ষও নিয়তিবশে অনায়াসলভ্য। তবে এত জপ তপ ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি? সুপ্ত সিংহের মুখে এসে কি হরিণ শিশু প্রবেশ করে? তাই চাই পুরুষাকার, আত্মার নির্মাণের জন্য সতত প্রচেষ্টা।

সদ্দালপুত্র বর্দ্ধমানের প্রবচনে প্রভাবান্বিত হয়ে সস্ত্রীক তাঁর কাছে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করল।

সদ্দালপুত্রের ধর্মপরিবর্তনের কথা যখন আজীবিক নেতা মংখলীপুত্রের কানে গেল তখন তাঁর মনে হল যেন বজ্রপাত হয়ে গেছে। কারণ সদ্দালপুত্র একজন সাধারণ গৃহস্থ ছিল না। আজীবিক মতাবলম্বীদের মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাই রাগে দুঃখে গোশালক তাঁর নিকটস্থ আজীবিক সাধুদের সম্বোধন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, শুনেছ, পোলাসপুরের ধর্মস্তম্ভের পতন হয়েছে। শ্রমণ মহাবীরের উপদেশে সদ্দালপুত্র আজীবিক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করে নিগ্রর্ন্থ প্রবচন গ্রহণ করেছে। কত দুঃখের কথা। কত পরিতাপের কথা। চল পোলাসপুরে চল। তাকে আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনাই এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

গোশালক তাই আজীবিক শ্রমণ সংঘ নিয়ে পোলাসপুরে এসে সভা ভবনে অবস্থান করলেন ও তারপর কয়েকজন বাছাবাছা শ্রমণ নিয়ে সদ্দালপুত্রের আবাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বর্দ্ধমান তার পূর্বেই পোলাসপুর পরিত্যাগ করে বাণিজ্যগ্রামের দিকে চলে গেছেন।

যে সদ্দালপুত্র মংখলিপুত্র গোশালকের নাম শুনলে পুলকিত হয়ে উঠত সেই সদ্দালপুত্র তাঁকে আজ সাধারণ অভ্যর্থনা জানাল, ধর্মাচার্যের সম্মান জানাল না। গোশালক এতে আরো ক্রুদ্ধ হলেও মনে মনে বুঝতে পারলেন যে বর্দ্ধমানের নিন্দা করে বা স্বমতের প্রশংসা করে সদ্দালপুত্রকে আজীবিক সম্প্রদায়ে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব কোমল করে বললেন, দেবানুপ্রিয়, মহাব্রাহ্মণ কি এখানে এসেছেন?

সদ্দালপুত্র বলল, কে মহাব্রাহ্মণ?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

আর্য, তিনি মহাব্রাহ্মণ কি করে?

তিনি জ্ঞান ও দর্শনের ধারক, জগৎ পূজিত ও সত্যিকার কর্মযোগী। তাই মহাব্রাহ্মণ। দেবানুপ্রিয়, মহাগোপ কি এখানে এসেছেন?

কে মহাগোপ?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

তিনি মহাগোপ কি করে?

এই সংসাররূপী মহারণ্যে ভ্রান্ত পথশ্রান্ত সংসারী জীবকে তিনি ধর্মদণ্ডে গোপন করে মোক্ষরূপ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। তাই তিনি মহাগোপ। দেবানুপ্রিয়, মহাধর্মকথী কি এখানে এসেছেন?

কে মহাধর্মকথী?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

তিনি মহাধর্মকথী কি করে?

অসীম সংসারে যারা ধর্ম পথ ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে গমন করছে তাদের ধর্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে ধর্ম পথে আবার ফিরিয়ে আনছেন। তাই তিনি মহাধর্মকথী। দেবানুপ্রিয়, মহানির্যামক কি এখানে এসেছেন?

কে মহা নির্যামক?

শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান।

তিনি মহানির্যামক কি করে?

সংসার রূপ অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জমান প্রাণীদের তিনি ধর্মরূপ নৌকায় বসিয়ে নিজে পারে উপস্থিত করছেন তাই তিনি মহানির্যামক।

দেবানুপ্রিয়, আপনি যদি এমন চতুর, এমন নৈয়ায়িক, এমন উপদেশক ও বিজ্ঞানী তবে কি আপনি আমার ধর্মাচার্য ধর্মোপদেশক শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমানের সঙ্গে বাদ বিবাদ করতে সমর্থ?

না সদ্দালপুত্র, তাঁর সঙ্গে বাদ বিবাদ করতে আমি সমর্থ নই।

কেন? আমার ধর্মাচার্যের সঙ্গে আপনি বাদ বিবাদ করতে কেন সমর্থ নন?

এই জন্যই সমর্থ নই যে যখন কোনো যুবক মল্ল অপর মল্লকে ধরে তখন তাকে যেমন শক্ত করে ধরে তেমনি তিনি যখন হেতু, যুক্তি, প্রশ্ন ও উত্তরে যেখানেই আমাকে ধরেন সেখানেই আমাকে নিরুত্তর করে দেন। এই জন্য আমি তোমার ধর্মাচার্যের সঙ্গে বিবাদ করতে সমর্থ নই।

দেবানুপ্রিয়, আপনি যখন আমার ধর্মাচার্য ধর্মোপদেশকের বাস্তবিক প্রশংসা করছেন তখন আপনাকে আমি আমার ভাণ্ডশালায় অবস্থানের

জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যথাসুখ আমার ভাণ্ডশালায় অবস্থান করুন।

গোশালক তখন ভাণ্ডশালায় এসে অবস্থান করলেন ও নানা সময়ে নানা ভাবে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতে সফল হলেন না। তখন তিনি হতাশ হয়ে পোলাসপুর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এই ঘটনায় বর্দ্ধমানের ওপর তিনি মনে মনে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

বর্দ্ধমান পোলাসপুর পরিত্যাগ করে বাণিজ্য গ্রামে গেলেন। সেখানে তিনি সেই বর্ষাবাস ব্যতীত করবেন।

পোলাসপুর হতে নানা স্থানে পরিব্রজন করতে করতে বর্দ্ধমান এলেন রাজগৃহে। সেখানে তাঁর উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে এবারে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন গাথাপতি মহাশতক।

বর্দ্ধমানের ধর্মসভায় একদিন পার্শ্বাপত্য স্থবিরেরা এলেন। তাঁরা বর্দ্ধমান হতে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন এই লোক অসংখ্য প্রদেশ বিশিষ্ট হলেও পরিমিত সেই পরিমিত লোকে অনন্ত রাত্রিদিন উৎসন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে, না পরিমিত রাত্রিদিন উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে?

বর্দ্ধমান বললেন, শ্রমণগণ, পরিমিত লোকে অনন্ত রাত্রিদিন উৎপন্ন হয়েছে, হচ্ছে, হবে।

ভগবন্, সে কিরূপ?

আর্যগণ, লোককে পুরুষাদানীয় পার্শ্ব নিত্য বলে শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত বলেছেন, সেইজন্য।

ভগবন্, এই লোককে লোক কেন বলা হয়? সেকি 'যো লোক্যতে স লোকঃ' সেই জন্য?

আপনারা ঠিকই বলেছেন, ভাগবতগণ। অজীব দ্রব্যের দ্বারা এই লোক দৃষ্টি গোচর হয়, নিশ্চিত হয়, নিরূপিত হয়। তাই একে লোক বলা হয়। এই লোক অনাদি, অনন্ত পরিমিত অলোকাকাশের দ্বারা পরিবৃত। নীচে বিস্তীর্ণ, মধ্যে কটিবৎ, ওপরে বিশাল।

[ক্রমশঃ

প্রণাম

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সেই সংবিৎ সিদ্ধাবস্থা লাভের জন্য
আমার চিত্ত তোমার দুয়ারে থাক নিষণ্ণ।
সত্য শ্রদ্ধা বিবেকদৃষ্টি পরম মোক্ষ
সংজ্ঞা শৌর্য চারিত্রাচার হোক সুদক্ষ !

পদার্থ প্রাণ-স্বরূপ জানার চেতনাদর্শ—
প্রেরণা সহিত সংযত চিতে আসুক হর্ষ।
ইন্দ্রিয় ভোগী পশুর জীবনে নয় তো দীক্ষা,
অহিংস্র প্রাণ ব্রতের আলোকে হবেই শিক্ষা !

দর্শন জ্ঞান স্বভাবে দিব্য ভাবের যত্ন
সাধক চিত্তে ফোটাক মন্ত্র তত্ত ত্রিরত্ন।

প্রণাম জানাই তাইতো তোমায় সিদ্ধ,
অর্হৎ যিনি শুচি ও অপাপবিদ্ধ।
আচার্য ও উপাধ্যায়ে প্রণাম জানাই ভন্তে,
প্রণাম জানাই বিশ্বের সকল সাধু সন্তে।

মধুবনের জৈন মন্দিরে

শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল যেই দেখালো মুখ, দুপুর আয়োজন
করলো যদি বিকেল এসে জানালো আবেদন
দিলাম বলে সবাইকেই
কাজও নেই, সময়ও নেই,
ছুটীও নয়, ছুটীরও চেয়ে আলাদা আলোড়ন
আজকে মন করেছে অধিকার ;
মাথার কাজ মাথার চেয়ে করুক ধ্যানী মন
ডাইনে বাঁয়ে নেইকো কেউ, নেই কো প্রয়োজন
দস্যু কাজের ভিড়ে ভাবনা থামাবার।

ছোটো এ-ঘর এখানে শুধু জানলা দিয়ে দেখা
কিনার ছুঁয়ে যেখানে পথ চলেছে একা একা
দুপুর রোদে শালের বন ছায়ার ঘেরে ঢাকা
ছড়িয়ে রেখে পাথুরে পথ ঘুমায় মধুবন।
আগল-ভাঙা এখানে খোলা মনের বাতায়ন।

আকাশ ছোট ; প্রসার তার পাহাড় দিয়ে ঘেরা-
এ নয় পথ, এ নয় নীড় ;
শালের বন, পাইন, চীড় —
জমায় নাকো কাজের ভিড় অজানা অচিনেরা,
পাহাড় কাঁদে, পাথর-ফাটা অশ্রু তার গড়াক না
যেমন দেখি তেম্নি যেন ভুলি—
কুয়াশা আড়ে সূর্য যদি লুকোয় মুখ লুকোক না
পাথরে গাছে বুলোক না সে ইন্দ্রধনু-তুলি।

উঁচিয়ে-থাকা তর্জনীর শাসন মেনে জানি
আমার আছে নিয়তি সেই কলকাতার গলি—
এ সব কিছু এড়িয়ে তাই সেখানে ফের চলি।

মনের দোরে তবু যে ঘোরে সীতানালার সাঁকো
সে স্মৃতি বন-সন্নিধির ভুলতে পারি নাকো—
সিক্ত ভোরে ছোট্টো স্রোত, তারই সে-কলতান
স্মরণে এনে ধেয়ায় আজো কান—
তৃষিত চোখ, সে-স্মৃতি তুমি একটু করে চাখো।
অজানা পাখি পতঙ্গের আসঙ্গের দান—
সে-দানে অনুভবের ঝুলি ভর্তি করে রাখো।

নিকটকে যা দূরের করে—পন্থা-সংশয়;
খবর নাও কুয়াশা-ঢাকা সে পাকদণ্ডীর।
খবর নাও, খবর যত কীটের আর তৃণের
পাহাড় আর উপত্যকা, গিরির গ্রন্থির।
যাত্রী আসে, যাত্রী যায়;
কী তারা খোঁজে, কী তারা পায়?
ছ্যাখে কি তারা একটুখানি বুঝে?
পাতায় ঘাসে আভাস যার পায় না কেন খুঁজে
অনির্মিত সংখ্যাতীত চরণ-মন্দির।

শ্রমণ উদায়ী

[একাঙ্কিকা]

প্রথম দৃশ্য

[বীতভয় নগরের রাজপথ। সময় প্রভাত। দু'জন নাগরিক গৃহের সম্মুখভাগ মালা পতাকাদি দিয়ে সজ্জিত করছে]

[একজন নাগরিকের প্রবেশ]

আগন্তুক : আজ কী উৎসব ভাই যে ঘরদোর সাজাচ্ছ ?

২য় নাগরিক : কেন জানো না উদায়ী আসছেন।

১ম নাগরিক : রাজা উদায়ী।

২য় নাগরিক : রাজর্ষি উদায়ী যিনি রাজ্য ধন সম্পদ পরিবার পরিজন সব কিছু পরিত্যাগ করে ভগবান মহাবীরের শরণ নিয়েছেন। তিনিই আজ আবার এই নগরে ফিরে আসছেন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তিনি যে অমৃত পেয়েছেন সেই অমৃত জনে জনে দেবেন বলে। শুনে বর্তমান রাজা সবাইকে আদেশ দিয়েছেন ঘরদোর সাজাতে,—তাঁকে স্বাগত করতে। তাঁর থাকবার বা ভিক্ষা পাবার যাতে এতটুকু অসুবিধা না হয়।

১ম নাগরিক : আর দেবেনই বা না কেন ? উদায়ীর দয়াতেই ত তিনি আজ এখানকার রাজা। এই রাজ্যত একদিন উদায়ীরই ছিল।

২য় নাগরিক : ঠিক। ইচ্ছা করলে এ রাজ্যত তিনি আর কাউকে দিতে পারতেন। তাঁকে দিয়েছেন সে তাঁর অনুগ্রহ। তাই তাঁর আসার খবর পেয়ে তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

আগন্তুক : তা মাতবারই কথা। শুনে আমারো খুব আনন্দ হচ্ছে। সাধুসন্তের নগরে আগমন সেত মহৎ ভাগ্যের ফল। যাই আমিও আমার ঘরদোর সাজাই। দরজায় পাঁচ রঙা ফুলের মালা টাঙাবো। প্রবেশ পথের কাছে রাখব মঙ্গল কলস। মাটীতে আঁকব আলপনা।

২য় নাগরিক : তোমারত খুব কল্পনার দৌড় আছে ভাই। আলপনার কথাত আমার মনেই হয়নি।

[দূরে ঢোলের শব্দ]

১ম নাগরিক : ও কিসের শব্দ ভাই ?

২য় নাগরিক : ঢোলের। এদিকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে।

[ঢোলবাদকের প্রবেশ। ঢোলবাদক কাঠি দিয়ে জোরে জোরে ঢোলে ঘা দিচ্ছে এবং একে একে নাগরিকেরা সেখানে এসে একত্রিত হচ্ছে]

২য় নাগরিক : ওহে ঢোলওয়ালা, আবার কী আদেশ নিয়ে এলে ভাই ?

ঢোল বাদক : [ঢোলে জোরে জোরে ঘা দিতে দিতে] ওত ব্যস্ত হলে হবে কেন ? দাঁড়াও বলি। আগে লোক জুটুক।

২য় নাগরিক : এইত অনেক লোক জুটেছে। আর কত লোক জুটবে।

ঢোলবাদক : (চারদিকে দেখে) হুঁ, আচ্ছা তবে শোন। সিন্ধু সৌবীরাধিপতি শ্রীমন্ মহারাজ…

[জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি]

ঢোলবাদক : ওত উতলা হয়ো না। মন দিয়ে শোন। শ্রীমন্ মহারাজ সোমদেব শর্মণঃ এই আদেশ প্রচারিত করছেন যে শ্রমণ উদায়ী বীতভয় নগরীতে…

২য় নাগরিক : ও আদেশ ত আমাদের জানা। সেই জন্যই ত ঘরদোর সাজাচ্ছি।

১ম নাগরিক : তোমার ওই এক দোষ। মাঝখানে কথা বলা। আগে শুনতে দাও ও কি বলছে।

২য় নাগরিক : কী আর বলবে ! বীতভয় নগরীতে এখন ঐ এক কথা।

ঢোলবাদক : না। তা নয়, তা নয়। সে খবর এখন পুরনো হয়ে গেছে।

২য় নাগরিক : তবে কি তিনি আসছেন না। অসুখ বিসুখ করেছে, না…

[জনতা হতে : ওকে চুপ করতে বলো, ওকে চুপ করতে বলো]

ঢোলবাদক : তোমরা সকলে চুপ কর। এ রাজার নূতন আদেশ। মন দিয়ে শোন। শ্রমণ উদায়ী বীতভয় নগরীতে আসছেন সেকথা পূর্বেই জানানো হয়েছে। তাঁর শুভাগমনের জন্য নগর সজ্জিত করবার আদেশ

বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখন এমন সংবাদ পাওয়া গেছে যাতে মহারাজ সে আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আরো বলেছেন বীতভয় নগরীর কোনো নাগরিক যেন তাঁকে স্বাগত না করে, থাকবার স্থান না দেয়, ক্ষুধার অন্ন এমন কী তৃষ্ণার জল পর্যন্ত না। কেউ তাঁর সঙ্গ করবে না বা কেউ তাঁর সঙ্গে বার্তালাপ করবে না। যে বা যারা রাজার এই আদেশ অমান্য করবে তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে। তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

[আবার ঢোলে ঘা দেয়]

১ম নাগরিক : আশ্চর্য ! অবিশ্বাস্য ! ওহে ঢোলওয়ালা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছ ?

ঢোলবাদক : রসিকতা ! রাজাদেশ নিয়ে রসিকতা চলে না। এই দেখ রাজার মুদ্রা।

১ম নাগরিক : তাইত ! তাইত ! কিন্তু এর কারণ ?

ঢোলবাদক : কারণের কথা আমি কী জানি। যদি সাহস হয় রাজাকে গিয়ে জিগ্যেস করো। তবে এই রাজাদেশ। যে অন্যথা করবে তাকে শূলে দেওয়া হবে।

[ঢোলবাদক ঢোলে ঘা দিতে দিতে দূরে চলে যায়। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে]

১ম নাগরিক : এখন কী করবে ভাই ?

২য় নাগরিক : কী আর করব, সব খুলে ফেলব। যাঁর রাজ্যে বাস করি তাঁর আদেশ অমান্য করে ত আর সে রাজ্যে বাস করা যাবে না। উদায়ী আজ আসবেন, কাল চলে যাবেন কিন্তু আমাদের ত এখানে চিরকাল বাস করতে হবে।

আগন্তুক : তা যা বললে। তবে রাজা রাজড়াদের মন বোঝা ভার আর আমাদের শুধু হয়রানি। আচ্ছা, তবে চলি।

[আগন্তুক চলে যায়। নাগরিক দু'জন মালা পতাকাদি খুলতে থাকে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বীতভয় নগরীর রাজপথ। সময় মধ্যাহ্ন। কয়েকজন নাগরিক পথ চলতে দেখা যাবে। এমন সময় শোনা যাবে—পালা, পালা। রাজা উদায়ী এদিকেই আসছেন। আর ওমনি দেখতে দেখতে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যাবে ও পথ জনশূন্য। খানিকবাদে রাজা উদায়ী প্রবেশ করবেন]

উদায়ী : আশ্চর্য! আমি যেদিকে যাই সেদিকের পথ দেখতে দেখতে জনহীন হয়ে যায়। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বীতভয়ে আসতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি কিন্তু কোথাও এমন দেখিনি। কাশী, কোশল, পাঞ্চাল সবখানে পুণ্য লোভাতুর মানুষ আমার কাছে এসেছে। আমি তাদের সদ্‌ধর্মের কথা বলেছি। তারা শান্ত হয়ে সেই সদ্‌ধর্মের কথা শুনেছে, গ্রহণ করেছে। কিন্তু যাদের জন্য এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসা, তারা, সিন্ধু সৌবীরের অধিবাসীরা, আমার থেকে দূরে সরে রইল। জানিনা এর কী কারণ? আমিত তাদের অনিষ্ট করতে আসিনি। আমারত তাদের প্রতি সেই এক কল্যাণ ভাবনা। তবে কেন? তবে কেন? শ্রমণ ভগবান মহাবীর ঠিকই বলেছিলেন, 'তুমি বীতভয় নগরীতে যেতে চাচ্ছ—আচ্ছা, যাও'। তখন আমি তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, যারা একদিন আমার সন্তানস্থানীয় ছিল তারা আমার কাছ হতে সাগ্রহে সদ্‌ধর্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু—কে ও···

[সুপ্রিয়ের প্রবেশ। উদায়ীকে দেখে ভূত দেখার মতো ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করবে কিন্তু না পেরে]

সুপ্রিয় : ও: আপনি!

উদায়ী : হ্যাঁ সুপ্রিয়, কিন্তু তুমি কী—আমায় এ ক'দিনের মধ্যেই ভুলে গেলে?

সুপ্রিয় : না না না, তা নয়। কিন্তু আমার ঘরে ত এতটুকু জায়গা নেই, না শয্যাফলক। তাছাড়া ভিক্ষা···

উদায়ী : সুপ্রিয়, আমি শয্যাফলক বা ভিক্ষার জন্ত উদ্বিগ্ন হইনি। কিন্তু তোমার ঘরে এত স্থানের অকুলান হল কিসে?

সুপ্রিয় : সে আপনি বুঝবেন না। [নেপথ্যের দিকে চেয়ে] কি বলছ? তাড়াতাড়ি যেতে? এই এলাম। [উদায়ীর প্রতি] কিছু মনে করবেন না। [দ্রুত প্রস্থান]

উদায়ী : আশ্চর্য! কিন্তু এর পেছনে কোনো কারণ রয়েছে যা আমি ধরতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটা গ্রন্থি পড়েছে। কিন্তু সে গ্রন্থির কে উন্মোচন করবে?

তৃতীয় দৃশ্য

[নগরপ্রান্ত। সময় অপরাহ্ন]

উদায়ী : সমস্ত দিন অনাহারে গেছে। তৃষ্ণার জল পর্যন্ত পাইনি। আজ কিছু পাব বলে মনে হয় না। কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ যে সদধর্মের কথা এখানে প্রচার করতে এসেছিলাম তা প্রচার না করেই আমায় ফিরে যেতে হবে। দুঃখ? শ্রমণের আবার দুঃখ? দুঃখ ত আকাঙ্ক্ষার পরিণাম। শ্রমণকেত সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই পরিত্যাগ করে আসতে হয়। তবে কি আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয় নি? আমি সদ্ধর্ম প্রচার করব এই আমার আকাঙ্ক্ষা! বুঝতে পেরেছি ভগবন্, বুঝতে পেরেছি কী আমার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ। তুমি আমায় নিবারণ করলে আমার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ এমনভাবে কোনো দিন ধরা পড়ত না। তাইত তুমি নিবারণ করোনি, নিষেধ করোনি। তোমার শিক্ষার পদ্ধতিই আলাদা। আমার কাছে সব কিছু স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, সহজ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমণের কোনো বিষয়েই আগ্রহ থাকা উচিত নয়। না, আমার মনে আর কোনো দুঃখ নেই, বেদনা নেই। আমার দেহে মনে একি এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা। কিন্তু এ আমি কোথায় এলাম! নগরপ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে। কে যেন ওই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখি ওর কাছে যাই।

[কাঠ খড়ের যে ঘরের দরজায় কুমোর পত্নী দাঁড়িয়ে থাকে
উদায়ী সেখানে এসে উপস্থিত হন]

কুমোরপত্নী : কোথা থেকে আসছ?

সহর থেকে।

কুমোর পত্নী : সহর থেকে। সেখানে থাকনি কেন ?

উদায়ী : থাকবার জায়গা পাইনি, খাবার অন্ন, পিপাসার জল। তাই।

কুমোর পত্নী : বলো কী ? তারা কী মানুষ ! আচ্ছা দাঁড়াও। আগে আমি ঘরে জিজ্ঞেস করি। ততক্ষণ তুমি ওই গাছের তলায় অপেক্ষা কর। [উদয়ীর তথাকরণ। কুমোর পত্নী ভেতরের দিকে লক্ষ্য করে] ওগো শুনছ ?

কুমোর : [ভেতর হতে] শুনছি। কি বল ?

কুমোর পত্নী : বলি একজন সাধু এসেছে। তাকে একটু থাকবার জায়গা দিতে হবে।

কুমোর : না না না। আমার ঘরে ওত জায়গা নেই। তাছাড়া খেতে না পেয়ে ওমন অনেক সাধু হয়ে যাচ্ছে।

কুমোর পত্নী : এ তেমন সাধু নয়।

কুমোর : [সামনে এসে] তুই থামত। ও সব আমার জানা আছে।

কুমোর পত্নী : কী জানা আছে ? কেবল গিলতে। তবে আমিও স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। ওকে যদি থাকবার জায়গা না দেবে তবে সারাদিনে কিছু গিলবার পিত্যেশ করো না। রান্নাঘরের সব খাবার উঠোনে ছড়িয়ে দেব। এই আমি যাচ্ছি।

কুমোর : হাঁ-হাঁ-হাঁ। তোর বড় রাগ। ওর নাম কী ?

কুমোর পত্নী : তার আমি কী জানি ? ওকেই না হয় জিজ্ঞেস করো।

কুমোর : [উদায়ীর কাছে গিয়ে] প্রণাম। আপনার নাম ?

উদায়ী : আমার নাম উদায়ী।

কুমোর : উদায়ী ! [স্ত্রীর কাছে গিয়ে] এ রাজা উদায়ী। এঁকে থাকতে দিলে আমাদের ঘরদোর সব বরবাদ হয়ে যাবে। রাজার লোক আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।

কুমোর পত্নী : সে কি ? এ কেমন রাজা গো ? সাধু শ্রমণদের ঠাঁই দেয়া যাবে না। দেখ, এ ঘর যেমন তোমার এ ঘর তেমনি আমার। তুমি যদি ওকে থাকবার জায়গা না দেবে ত আমি দেব।

কুমোর : কিন্তু আমাদের ঘর ? ঘর যে বরবাদ হয়ে যাবে।

কুমোর পত্নী : তা যাক্। কাঠ খড়ের ঘর, না হয় একগাদা ছাই হবে। রাজা না হয় তাই নেবে গো তাই নেবে। গায়ে মাখবে। আর কী নেবে ? ওই গাধা। গাধাতে চড়ে রাজা ঘুরে বেড়াবে। এমন রাজা গাধাতেই চড়বে। আর আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ? শূলে দেবে ? তা দিক্। একবারের বেশী ত মারতে পারবে না। না হয় একটু আগে মরলাম। তাই আমার ভয় নেই।

কুমোর : ঠিক !

কুমোর পত্নী : ঠিক।

কুমোর : তবে চল রাজাকে ঘরে নিয়ে আসি।

[উভয়ে উদাসীর দিকে এগিয়ে যাবে]

কুমোর : আসুন সাধুজী আসুন। ছোট আমাদের ঘর, শুকনো আমাদের রুটি। এ ছাড়া আর কিছু নেই, তাতে আপনার কষ্ট হবে না তো।

উদাসী : কষ্ট ! শ্রমণের আবার কষ্ট কী। কিন্তু তার আগে তুমি কী আমায় একটা কথা বুঝিয়ে বলবে আমি কেন নগরে থাকবার জায়গা পেলাম না।

কুমোর : ও: সেকথা আপনি জানেন না বুঝি। নূতন রাজা আদেশ জারী করেছেন আপনাকে যে আশ্রয় দেবে, খাবার অন্ন, তৃষ্ণার জল, তাকে শূলে দেওয়া হবে।

উদাসী : বলো কী ? রাজা কেন এমন আদেশ করলেন জানো ?

কুমোর : ঠিক জানি না। তবে মন্দ লোক কিছু হয়ত বলে থাকবে—

উদাসী : বুঝেছি। বলেছে উদাসী রাজ্য আবার ফিরে নিতে আসছেন। সত্তার লোভ তাঁকে নির্মম করেছে। কিন্তু তুমি বলো, তুমি আমায় কী সাহসে স্থান দিচ্ছ ?

কুমোর : [স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে] ওর সাহসে।

কুমোর পত্নী : প্রভু, যারা নিঃসম্ব যাদের কিছু হারাবার নেই তাদের আবার ভয় কী ?

উদায়ী : ঠিক বলেছ। যারা নিঃসত্ব তাদের কিছু হারাবার ভয় নেই। আমি তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলাম। কিন্তু এখানে আমি থাকব না। আমি আবার ফিরে যাচ্ছি ভগবান মহাবীরের কাছে আকাঙ্ক্ষাহীন ও নিঃসত্ব হয়ে। তোমাদের কল্যাণ হোক।

[উদায়ী ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাবেন]

[পটক্ষেপ]

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

কে তাকে একথা বলছে দেখবার জন্ম অগ্নিশর্মা চারদিকে চেয়ে দেখল। কিন্তু সেই নির্জন রাজপথে কেউ যে তার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তার মনে হল না।

মনের ভ্রম মনে করে অগ্নিশর্মা আরো আগে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল গুণসেন এখুনি দৌড়ে আসবে। যে গুণসেন একদিন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাকে নির্যাতন করেছে, সেই গুণসেন পশ্চাত্তাপের আগুনে তার পাপ দগ্ধ করতে করতে দৌড়তে দৌড়তে এসে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে যাই হোক, গুণসেনকে ভদ্রই বলতে হয়। সে নিজের দোষ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। সেই জন্যইত সে তাকে এত আগ্রহ করে আমন্ত্রণ করে এসেছে। তা ছাড়া এই রাজ প্রাসাদের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী?

ওদিকে রাজ প্রাসাদে সেই সময় লোকজন ছুটোছুটি করছে। বৈদ্য ও মন্ত্রবিদেরা একের পর এক আসছে ও চলে যাচ্ছে।

অগ্নিশর্মা ততক্ষণে দ্বারপালের কাছে গিয়ে গুণসেনকে তার আসার খবর দিতে বলল। অগ্নিশর্মা দ্বারপালের পরিচিত ছিল না। তাই সে তাকে আর দশজন প্রার্থীর মতোই এক প্রার্থী বলে মনে করে নিল। তবুও সে তাকে বিনীত ভাবেই বলল, মহারাজ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কুমার ভেতরে রয়েছেন। কোন দাসী যদি এসে যায় তবে তার সঙ্গে আপনার আসবার সংবাদ তাঁকে পৌছে দেব।

অগ্নিশর্মা তখন মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পথের ধারে পাষাণ প্রতিমার মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ ত কেউই তার দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করল না। এক মাসের উপবাসের পরই যে তপস্বী ভিক্ষা নিতে এসেছেন

এ রকমও কারু মনে হয়েছে তাও মনে হল না। যদি হয়েও থাকে তবে উপবাস করাই এদের ব্যবসা তাই তাতে মাথা গলানো বা তার এই প্রবৃত্তিকে প্রোৎসাহিত করার কোনো প্রয়োজন আছে সে কোন রাজকর্মচারীই মানতে রাজী নয়।

ইতিমধ্যে তার ভাগ্যগুণেই এক দাসীকে ভেতরে যেতে দেখা গেল। দ্বারপাল তাকে ডেকে বলল: কুমার বাহাদুরকে তুমি এই খবর দেবে যে এক তপস্বী দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

দাসী কিছু শুনল কিছু শুনল না এভাবে ভিতরে দৌড়ে গেল। তপস্বীর জন্ম তার কোনো চিন্তাই ছিল না। এতো রাজপ্রাসাদ। এখানেত হাজার হাজার কাঙাল প্রার্থী হয়ে আসে। যদি প্রত্যেক কাঙালীর খবর নিতে হয় তবে ত দাসদাসীদের নিজের কাজ করার অবসরই আর থাকে না।

এদিকে অগ্নিশর্মারও দেরী হয়ে যাবার এমন কোনো তাড়া ছিল না। এখনই হোক বা একটু দেরীতে গুণসেন তার আসার সংবাদ পাক এইটুকুই সে চাইছিল। খবর পাওয়া মাত্র যে সে নিজেই ছুটে আসবে ও তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে তার একটুও আশঙ্কা ছিল না।

অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুণসেন যে তার আসার খবর পেয়েছে তার কোনো লক্ষণই সে দেখতে পেল না। গুণসেনের আতিথ্য সে স্বীকার করবার দুঃসাহস করেছিল—সে তাতে আশার ভ্রমে নিরাশাকেই আমন্ত্রণ করেছিল।—এই ধরণের খিন্নতা সহসা তার অন্তরকে দগ্ধ করে দিয়ে গেল।

তার আগের গুণসেনের কথা মনে পড়ল। পরিপূর্ণ সভায় সে তাকে জ্বালাত, নাচাত ও নানাভাবে বিড়ম্বিত করত। সেই গুণসেনইত এই গুণসেন। খয়ের জল জল হয়ে যায় কিন্তু তাতে তার শক্তি নষ্ট হয় না। তেমনি গুণসেন রাজ কাজে হয়ত কুশল হয়েছে, অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে দক্ষ, কিন্তু তার কৌতুহল প্রবৃত্তি চলে গেছে তা অসম্ভব।

এ ভাবে একঘণ্টা তাকে দাঁড়িয়ে রেখে বা অপেক্ষা করিয়ে, নিজেই এসে আমন্ত্রিত করে নিয়ে যাবে এরকম সঙ্কল্প করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। খাদ্য খাবার ত রাজপ্রাসাদে কোনো সময়ই অভাব হয় না। কিন্তু আশ্রমে গিয়ে যখন সে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তখন তার মনে যে এ ধরণের

কৌতুক করবার প্রবৃত্তি আছে তা তার মনেই হয় নি। অগ্নিশর্মার মনে তখন আবার আশার সঞ্চার হল। তার মনে হল গুণসেন এই এলো বলে। তার মনে বসে কে যেন বলতে লাগল সমস্ত কাজ ফেলে তার পুরুনো সঙ্গী তার সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয়ই আসবে।

কিন্তু সে কথার সত্যতা কে নির্ণয় করবে? সে চলে যাবে না থাকবে অগ্নিশর্মা যখন এ ধরণের চিন্তা করছিল তখন তাকে চেনে এমন এক পরিচারিকা সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে দু'হাত জুড়ে তাকে নমস্কার করল। তপস্বী আহার করতে এসেছেন জেনে সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গুণসেনের প্রাসাদের দিকে চলে গেল। কিন্তু যখন সে সেখানে গিয়ে পৌছল তখন রাজবৈদ্যের কথা তার কানে এল: কুমারকে এখন কেউ যেন না জাগায়। রাত্রে ওঁর ঘুম হয় নি, তাই মাথায় যন্ত্রণা হয়েছে। খানিক বিশ্রাম নিলেই উনি আবার সুস্থ হয়ে যাবেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

পরিচারিকাও যেই একথা শুনল, গুণসেনও অমনি পাশ ফিরে শুল। আজ সকাল হতেই মাথার যন্ত্রণায় সে কাতর ছিল তাই ভালো করে কারু সঙ্গে কথা পর্যন্ত সে বলে নি। কত বৈদ্য এল, কত মন্ত্রবিদ, কত রকম ওষুধ দেওয়া হল, কত রকম উপচার কিন্তু যন্ত্রণার প্রবর্দ্ধমান বেগ কেউই রোধ করতে পারল না। শেষে রাজবৈদ্য এলেন ও তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। পরিচারিকা তপস্বীর কথা বলতেই যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। তার এমনো মনে হল যে সে যদি একটু সাহস করে তপস্বীর আসার খবর দিয়ে দেয় তবে হয়ত তাকে সকলের অপ্রসন্নতাভাজন হতে হবে কিন্তু তাতে মাসাবধিকাল উপবাসকারী তপস্বীর জীবন হয়ত রক্ষা হতে পারে। কিন্তু তবুও সে সাহস করে কিছু বলতে পারল না।

সেই পরিচারিকা তখন ধীরে ধীরে বাইরে এসে অগ্নিশর্মাকে খিন্ন স্বরে বলল: 'মহারাজ, গুণসেনের সঙ্গে এখন কারু দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তিনি এখন মাথার যন্ত্রণায় পীড়িত।

এর বেশী শোনার বা বলার অগ্নিশর্মারও কিছু ছিল না। যে উৎসাহ নিয়ে সে নগরে এসেছিল, সেই পরিমাণ নৈরাশ্য নিয়ে সে নিজের আশ্রমে ফিরে গেল।

॥ ৫ ॥

আশ্রমে যদি ভূমিকম্প হয়ে যেত, হাজার হাজার আম গাছ সমূলে উৎপাটিত হয়ে পড়ে থাকত বা লতা-পাতার কুটীরগুলো মাটির সঙ্গে ধূলিস্যাৎ হয়ে যেত তাহলেও আশ্রমবাসীদের এত বড় আঘাত লাগত না বা তাদের এত্তো আশ্চর্য হতে হত না যতটা তাদের আঘাত লাগল বা আশ্চর্য হতে হল একথা শুনে যে অগ্নিশর্মার মতো তপস্বী রাজ প্রাসাদ হতে ভিক্ষা না পেয়েই ফিরে এসেছেন ও তাঁর ভাগ্যে আর এক মাসের লম্বা উপবাস বিধাতাপুরুষ আবার লিখে দিয়ে গেছেন। সকলের মুখেই এক কালিমা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। যে অগ্নিশর্মার পায়ের ধূলো ঘরের আঙিনায় পড়লে দরিদ্র গৃহস্থের মনেও তাকে সমস্ত কিছু অর্পণ করার অভিলাষ জাগ্রত হয়, নিজে অভুক্ত থেকেও তার ভিক্ষার ঝুলিতে নিজের আহার ঢেলে দিতে সমুৎসুক হয়, সেই অগ্নিশর্মা আমন্ত্রিত অতিথি হয়েও রাজপ্রাসাদ হতে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে এল। এ দুষ্টগ্রহ বা নক্ষত্রের উদয়ের পরিণাম বলেই তাদের মনে হল। রাজ্যের খাদ্য ভাণ্ডারে খাদ্যের অভাব না হয়ে থাকতে পারে, তবুও যে রাজ্যে মহাতপস্বীর পেট ভরবার মতো আহার জোটে না, সে কেবল তপস্বীরই দুর্ভাগ্য নয়, রাজ্য বা রাজ্যাধিপতিরও নয়, সে দুর্ভাগ্য সমগ্র রাজ্যের জনসাধারণের। কোনো তপস্বীর আকস্মিক দেহাবসানে আশ্রমবাসীরা এতটা বিচলিত হতেন না যতটা কি বিচলিত হলেন এক-একমাস উপবাসকারী অগ্নিশর্মাকে পারণ করবার মতো ভিক্ষা প্রাপ্ত হতে না দেখে ও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মাসের উপবাসের আরম্ভ করতে বাধ্য হওয়ায়।

অগ্নিশর্মা যখন আশ্রমে এসে পৌঁছল তখন তার তপ্ত তাম্র রূপ দেখে এমনো মনে হচ্ছিল যে সে বোধ হয় শান্তি ও ধৈর্যের মর্যাদাকে ভেঙে চুরে ফেলে দেবে। এমন কি শাপ পর্যন্ত সে দিয়ে বসতে পারে এমনো ভয় হয়েছিল। তপস্বীর ক্রোধের ভয়ঙ্করতা কি তারা জানত। তাতে অগ্নিশর্মাত ছিল আবার ঘোর তপস্বী। সে যদি ক্রুদ্ধ হয় তবে সাত সমুদ্রের জলও সেই দাবানলকে নেভাতে সমর্থ হবে না।

আমন্ত্রণ দিয়ে ঘরে নিয়ে এসে ও উপবাসীকে অভুক্ত রেখে ফিরিয়ে দেওয়ায় গুণসেনের প্রতি অন্যের মনোভাব যাই হোক, অগ্নিশর্মার নিজের

মনেও কি কোনো জ্বালার সৃষ্টি করে নি! এই গুণসেনই ত তাকে একদিন জ্বালিয়ে আনন্দ পেত আর আজ যখন অগ্নিশর্মা তপস্বীর খ্যাতি লাভ করেছে তখন কি এইভাবে তাকে জ্বালাবার পথ সে খুঁজে নেয় নি ?

গুণসেনের প্রতি ক্রোধ ও আক্রোশের প্রবাহকে নিরোধ করবার, তিক্ত অপমানকে পান করবার অগ্নিশর্মা অনেক প্রয়াস করল কিন্তু ক্ষুধার কঠোর বেদনা যার একটুও অনুভব করা আছে সেই বুঝতে পারবে এতে যদি অগ্নিশর্মা সফল না হয়ে থাকে তবে তাকে সর্বথা দোষী করা চলে না।

বস্তুতঃ গুণসেন এখনো তার কৌতুক প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে নি, এই ধরণের বিচারে যখন সে মগ্ন ছিল, যখন তার চারিদিকে গ্লানি আর গ্লানি তখন দূরে সানুচর গুণসেনকে আসতে দেখা গেল।

গুণসেন আসা মাত্রই তপস্বীর পায়ে মাথা রাখল। মাথার যন্ত্রণার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় তপস্বীর সে যথোচিত সৎকার করতে পারে নি সেজন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করল। গুণসেনের খেদ বা পশ্চাত্তাপে অগ্নিশর্মার এক মাসের ক্ষুধা শান্ত হয়ে যাবে এমন নয় বা দ্বিতীয় মাসের উপবাসও যে সে ভঙ্গ করবে তাও নয়। তবু এই ক্ষেদ ও পশ্চাত্তাপ অগ্নিশর্মাকে অন্নাহারের তৃপ্তির চাইতেও আর এক ধরণের বিশেষ তৃপ্তি দান করল। অগ্নিশর্মার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হল যে গুণসেন জেনে শুনে নিজের কৌতুকপ্রিয়তা চরিতার্থ করবার জন্য তাকে ফিরিয়ে দেয় নি। ভবিতব্যই এর জন্য উত্তরদায়ী, এবং তপস্বীর যদি এই ধরণের উৎপাত সহ্য করবার সামর্থ্য না থাকে তবে দেহ দমনেরই বা কী প্রয়োজন ?

একেলা অগ্নিশর্মারই নয়, সমস্ত আশ্রমবাসীদের এখন বিশ্বাস হল যে অগ্নিশর্মাকে যে উপরোপরি দ্বিতীয় মাসের উপবাস করতে হচ্ছে গুণসেন তার নিমিত্ত কারণ হলেও বস্তুতঃ এর মধ্যে ভবিতব্যই বলবান। এর জন্য গুণসেনকে যথার্থ দোষী করা যায় না।

গুণসেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আত্ম-নিবেদনের ভংগীতে বলতে লাগল : আমি অসুস্থ ছিলাম। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল। বৈদ্যেরা আমাকে বিশ্রাম নিতে বলল কিন্তু চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে আজ আপনার পারণের দিন সেকথা আমার মনে হল।

আমি তখুনি দ্বার রক্ষীকে বলে পাঠালাম যদি কোনো মহাতপস্বীর মতো ব্যক্তি আসেন তবে তাঁকে সসম্মানে আমার অন্তঃপুরে নিয়ে এসো। তখনি আমি জানতে পারলাম যে মহাতপস্বী একটু আগেই সেখান এসেছিলেন ও ফিরে গেছেন।

সেকথা শোনামাত্র আমি আমার মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম। আমার মনে এক গভীর বেদনার আঘাত লাগল এবং পথের মধ্য হতেই আপনাকে ফিরিয়ে নেব বলে আপনার পেছনে ছুটলাম। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে তাতে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। আগেও আমি আপনাকে উত্যক্ত করেছি এবং এখনো···

গুণসেন কি বলতে চায় অগ্নিশর্মা তা সহজেই বুঝতে পারল। তার আবেগ চাঞ্চল্য এখন শান্ত হয়ে এসেছিল। এ আমার পরীক্ষা সেকথা সে তখন বুঝতে পারছিল।

না, মহারাজ, এতে আপনার কোনো দোষ নেই। তপস্বীত কারু অপরাধ নেন না। সত্য কথাত এই যে আপনি আমার পরমোপকারী। আপনিই আমায় সংসার কারাগার হতে বিমুক্ত করেছেন, আমার তপস্যার অভিবৃদ্ধিতে আপনি আমার পূর্ণ সহায়ক।

অনিষ্ট ও অপকারকেও এই তপস্বীরা তপস্যার অভিবৃদ্ধিতে সহায়ক রূপ মনে করেন এবং হৃদয়ের আবেগকে এই ধরণের বিচার রূপ অঙ্কুশ দ্বারা দমিত করেন। এই অঙ্কুশের আঘাতে হস্তীরূপ প্রমত্ত আবেগ নিরীহ গাভীতে কেন না রূপান্তরিত হবে? কিন্তু অধিকাংশতঃ তপস্বী সুলভ এই ধরণের বাক্য তপস্বীরা কেবল মাত্র মুখেই বলে যান। কিন্তু তবুও যে অপরাধী, তার মনে তা সুস্পষ্ট ও গভীর প্রভাব রেখে যায়। বৈর ও বিদ্বেষরূপী সাপ মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গুণসেন নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে না পেরেছিল তা নয়। তপস্বীর ক্রোধের ভয়ঙ্করতাও তার অনুভবের বাইরে ছিল না। কিন্তু যখন অগ্নিশর্মা ও তার গুরু আচার্য কৌডিন্য তার অক্ষম্য অপরাধকেও তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত কারণ বলে অভিহিত করলেন তখন তার হৃদয়ের গুরুভার অনেকটা যেন লাঘব হয়ে গেল।

ফুলের মতো হালকা হওয়া তার হৃদয়ে তখন আনন্দেরও সঞ্চার করল যাতে সে বলে উঠল, মহারাজ, এইবার ত আমি সাবধান থাকতে পারি নি, কিন্তু এই মাসের উপবাসের পর আপনি যদি আমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করতে আসেন তবে আমি নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করব।

আহার বা উপবাস সম্পর্কে আশ্রমবাসীরা সকলেই প্রায় স্বতন্ত্র ছিলেন। কে কবে কার কাছ হতে ভিক্ষা আনবেন সে সম্বন্ধে কোন বিধি নিষেধ ছিল না। দেহ রক্ষার জন্য ভিক্ষা তা নয়, পরন্তু সংযম রক্ষার জন্য আহার আবশ্যক, তার সঙ্গে জিহ্বার লোলুপতার যেন মিশ্রণ না হয় এই সূত্র আচার্য সকলকে শিখিয়ে রেখে ছিলেন। এর যাতে অতিচার না হয় তাঁদের সেই সম্পর্কেই শুধু জাগরূক থাকতে হত।

তবুও এ ক্ষেত্রে গুণসেনের গ্লানি ও ব্যাকুলতা দেখে আচার্য অগ্নিশর্মাকে দ্বিতীয় মাসের উপবাস অন্তে গুণসেনের ওখান হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন।

শুধু তাই নয়, গুণসেনের চলে যাবার সময়ও আচার্য তার মাথায় হাত রেখে এই আশ্বাস দিলেন :

আপনি তপস্বীদের অপ্রসন্ন করেছেন সে কথা যেন মনে না করেন। আমাদের ভাগ্যে যদি এই অন্তরায় লেখা থাকে তবে কে কি করতে পারে? আমরা কাউকেই নিজের শত্রু বা মিত্র মনে করি না। সর্বত্র এক মঙ্গলই আমরা দেখতে পাই। আর তপস্বীত জগতের মাতাপিতা স্বরূপ। তবে নিজের সন্তানের প্রতি তাঁরা কেন বিরূপ হবেন?

গুণসেন গভীর কৃতজ্ঞতায় আচার্যকে নমস্কার করল ও তারপর নিজের প্রাসাদে ফিরে এল।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

সূচী পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড

বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৮১

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার
কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ
কলিকাতা-১২ থেকে